ভূগোল বিজ্ঞানে মুসলমানদের অবদান

[মুসলিমস্ এন্ড দি সায়েন্স অব জিওগ্রাফী]

নাফিস আহমদ

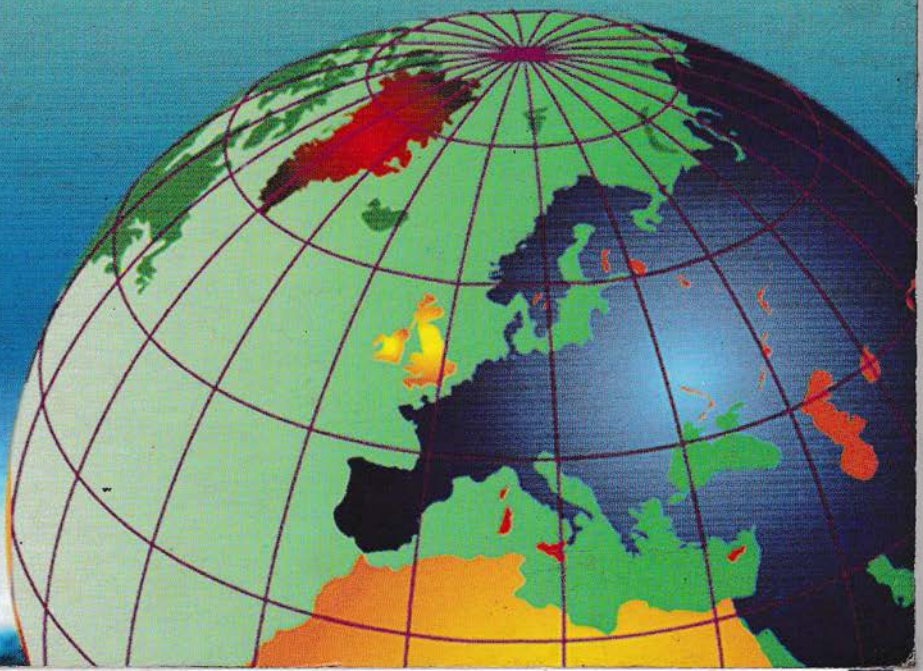

ভূগোল বিজ্ঞানে মুসলমানদের অবদান

(মুসলিমস এন্ড সায়েন্স অব জিওগ্রাফী)

নাফিস আহমদ

মুহাম্মদ নুরুল আমিন জাওহার
অনূদিত

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

www.waytojannah.com

ভূগোল বিজ্ঞানে মুসলমানদের অবদান
নাফিস আহমদ
মুহাম্মদ নুরুল আমিন জাওহার অনূদিত
পৃষ্ঠা সংখ্যা: ১২৪

ইফাবা অনুবাদ ও সংকলন প্রকাশনা: ৩০১
ইফাবা প্রকাশনা: ২৩৩১
ইফাবা গ্রন্থাগার: ৯১০,৯
ISBN: 984-06-0994-7

প্রথম প্রকাশ
এপ্রিল ২০০৫
বৈশাখ ১৪১২
রবিউল আউয়াল ১৪২৬

মহাপরিচালক: এ. জেড. এম. শামসুল আলম

প্রকাশক
শেখ মুহাম্মদ আবদুর রহীম
পরিচালক, অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
আগারগাঁও, শেরে বাংলানগর, ঢাকা,-১২০৭
ফোনঃ ৯১৩৩৩৯৪
সম্পাদনা: অধ্যাপক ড. আবদুর রব
প্রুফ সংশোধন: মোহাম্মদ মোকসেদ
প্রচ্ছদ শিল্পী
গিয়াসউদ্দীন খসরু

বর্ণ সংযোজন
আর. এম. ডট কম
২৩১ পূর্ব ধোলাইর পাড়, শ্যামপুর, ঢাকা-১২০৪

মুদ্রণ ও বাঁধাই
বোনাফাইড প্রিন্টার্স
১১২, ফকিরাপুল, ঢাকা

মূল্যঃ ৪০.০০ (চল্লিশ) টাকা

BHUGOL BIGGANE MUSALIMANDER ABODAN (Muslims and the Science of Geography): Written by Nafis Ahmad in English, translated by Nurul Amin Jaohar into Bangla and published by Shaikh Muhammad Abdur Rahim, Director, Translation and Compilation Dept., Islamic Foundation Bangladesh, Agargaon, Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka-1207, Phone: 9133394 April 2005
Website: www.islamicfoundation-bd.org
E-mail: info@ islamicfoundation-bd.org
Price: Tk 40.00; US Dollar: 1.00

www.waytojannah.com

বিষয়সূচি

ভূমিকা	৭
প্রথম অধ্যায়: মুসলিম ভূগোল বিজ্ঞানের উৎকর্ষতা	৯
দ্বিতীয় অধ্যায়: প্রাথমিক যুগের মুসলিম ভূগোল	২১
তৃতীয় অধ্যায়: নবম ও দশম শতাব্দীর ভূগোল বিজ্ঞানীদের অবদান এবং তাদের উত্তরসুরিগণ	২৬
চতুর্থ অধ্যায়: একাদশ থেকে পঞ্চদশ শতাব্দীর ভূগোল বিজ্ঞানীগণ	৩৯
পঞ্চম অধ্যায়: ভূগোলের সাথে সম্পর্কিত জ্যোতির্বিজ্ঞান ও গণিত বিষয়ক রচনাবলী	৫০
ষষ্ঠ অধ্যায় ম্যাপ ও চার্ট প্রস্তুতকরণ	৭২
সপ্তম অধ্যায়: মুসলমানদের ভূগোল বিষয়ক রচনাবলীর উৎকর্ষতা	৭৮
অষ্টম অধ্যায়: মুসলিম ভূগোল এবং পাশ্চাত্য জগত	৯৯
গ্রন্থপঞ্জি	১১৯
ম্যাপসমূহঃ	
সপ্তম শতাব্দী থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত মুসলিম দেশসমূহের বিস্তৃতি	
মধ্যযুগে মুসলমানদের জানা দুনিয়া	
কয়েকটি সুপরিচিত মুসলিম ম্যাপের অনুকৃতি	

www.waytojannah.com

প্রকাশকের কথা

আব্বাসীয় খিলাফতকাল ছিল মুসলমানদের জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার এক স্বর্ণযুগ। বিশেষত খলীফা হারুন-উর-রশীদ এবং তাঁর পুত্র মামুন-উর-রশীদ-এর শাসনামল ছিল এ চর্চার চরম উৎকর্ষের কাল। এ দুই খলীফার শাসনামলে সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন, আধ্যাত্মিকতা, পদার্থবিদ্যা, আবহাওয়াবিদ্যা, উদ্ভিদ বিজ্ঞান, জ্যোতির্বিজ্ঞান, এবং চিকিৎসা বিজ্ঞানের মতই ভূগোল বিজ্ঞানেও প্রচুর গবেষণা ও রচনাকর্ম সাধিত হয়েছে। অবশ্য পবিত্র কুরআনের বাণী "তোমরা পৃথিবীতে পরিভ্রমণ করো...." (আল-কুরআন, ৩:১৩৭; ৬: ১১; ১৬: ৩৬: ২৭: ৬৯; ২৯: ২০; ৩০: ৪২) শীর্ষক নির্দেশও এ ব্যাপারে মুসলিম পরিব্রাজকদের নিঃসন্দেহে অনুপ্রাণিত করেছে।

ইসলামের দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমর (রা)-ও তাঁর খিলাফতকালে মুসলিম বাহিনী কর্তৃক কোন এলাকা বিজিত হলে সেখানে ভূ-প্রাকৃতিক অবস্থা, আবহাওয়া ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উপর তথ্যাদি সংগ্রহ করতেন।

ভূগোল বিজ্ঞানে মুসলমানদের অবদান চতুর্মুখী। তাঁরা যেমন কোন ভৌগোলিক এলাকার বিরল তথ্যসমৃদ্ধ পুস্তক রচনা করেছেন, তেমনি ভ্রমণবৃত্তান্তের আঙ্গিকেও বর্ণনা দিয়েছেন বিভিন্ন এলাকার। যেমন বর্ণনা দিয়েছেন নৌ-পথসহ পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের যোগাযোগ ব্যবস্থার, তেমনি বিভিন্ন এলাকার ভৌগোলিক এবং নৌপথের সূক্ষ্ম মানচিত্র, গ্রাফচিত্র ইত্যাদি অংকন করেও তাঁরা ভূগোলশাস্ত্রকে সমৃদ্ধ করতে বিপুল অবদান রেখেছেন।

আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় এবং কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূগোল বিজ্ঞানের ইতিহাস বিষয়ের অধ্যাপক জনাব নাফিস আহমদ 'Muslims and Science of Geography' শীর্ষক ও গবেষণাধর্মী পুস্তকটি রচনা করে এ শাস্ত্রে মুসলমানদের বিশাল অবদানের তথ্য তুলে ধরেছেন। বাংলাভাষী পাঠকদের জন্য এ তথ্যবহুল গ্রন্থটি বাংলায় অনুবাদ করে 'ভূগোল বিজ্ঞানে মুসলমানদের অবদান' শিরোনামে প্রকাশ করা হলো। অনুবাদ করেছেন জনাব নুরুল আমিন জাওহার, যিনি ইতিমধ্যে বেশ কয়েকটি গ্রন্থ অনুবাদ করে দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। সম্পাদনা করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের

www.waytojannah.com

ভূগোল বিভাগের অধ্যাপক ড. আবদুর রব এবং প্রুফ সংশোধন করেছেন জনাব মোহাম্মদ মোকসেদ। এ মূল্যবান গ্রন্থটির অনুবাদক ও সম্পাদকসহ সংশ্লিষ্ট সবাইকে জানাই আন্তরিক মুবারকবাদ।

গ্রন্থটির সুন্দর ও নির্ভুল করে মুদ্রণের জন্য আমরা যথাযথ চেষ্টা করেছি। তারপরেও কোন ভুল-ত্রুটি থাকলে পরবর্তী সংস্করণে সংশোধনের স্বার্থে আমাদেরকে অবহিত করার জন্য পাঠক ও গবেষকদের প্রতি অনুরোধ রইল।

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদের এ প্রচেষ্টা কবূল করুন। আমীন।

শেখ মুহাম্মদ আবদুর রহীম
পরিচালক
অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

www.waytojannah.com

ভূমিকা

অনেক বছর আগে আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণ শিক্ষক থাকাকালে আমি ভূগোল বিজ্ঞানে মুসলমানদের অবদান সম্পর্কে লিখতে আগ্রহ বোধ করি। সেখানে স্নাতকোত্তর পর্বে অধ্যয়নরত ছাত্রদের নিকট আমি ভূগোল বিষয়ক চিন্তাধারার ইতিহাস সম্পর্কে পাঠদান করতাম। মধ্যযুগে বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার বিকাশের মাধ্যমে আধুনিক ভূগোলের যে ভিত্তি স্থাপিত হয়েছিল, সে বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে এক সময় লক্ষ্য করলাম যে আমি ভূগোলে মুসলমান পণ্ডিতদের অবদান সম্পর্কিত বিষয়ের সাথে জড়িত হয়ে গেছি। এ সময় ভূগোল বিষয়ক সাময়িকীসমূহে কিছু সংখ্যক সুপরিচিত মুসলিম ভূগোলবিদের অবদান সম্পর্কে আমার লেখা প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হয়।

পরে ১৯৪১ থেকে ১৯৪৮ পর্যন্ত সময়ে কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতাকালে আমি উচ্চতর ক্লাসে ভূগোল সম্পর্কিত ইসলামের ইতিহাস বিষয়ে পাঠদান করি। এ সময়ে আলোচ্য বিষয়ে আমার আগ্রহ পুনঃ জাগ্রত হয়। ভারতের হায়দরাবাদ থেকে বহুল প্রচারিত 'ইসলামিক কালচার' সাময়িকীতে আমার বেশ কিছু প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। একই বিষয়ে একটি পুস্তক এবং আরো কিছু প্রবন্ধও প্রকাশিত হয়। এ পর্যায়ে আমার আজীবনের বন্ধু, সুপরিচিত পণ্ডিত, ভাষাবিদ এবং কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন প্রভাষক জনাব আকতার ইমাম আমাকে এ বিষয়ে আরো লেখালেখি করার জন্য অনুপ্রাণিত করেন। ১৯৪৮-এর পরে আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভূগোলের অধ্যাপক হিসেবে উচ্চতর শ্রেণীতে পাঠদান অব্যাহত রাখি। ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকায় বেশ কয়েকবার ভ্রমণকালে সেখানকার সমৃদ্ধ গ্রন্থাগারসমূহে মুসলমান ভূগোলবিদদের লিখিত বেশ কিছু পাণ্ডুলিপির সংগ্রহ দেখার সুযোগ আমার হয়েছে। এ ছাড়া আমি এ বিষয়ে বিশিষ্ট পণ্ডিতগণের সাথেও আলোচনা করেছি।

১৯৫৭ সালে বিখ্যাত রুশ পণ্ডিত আই. আই. ক্রাচকোভস্কি প্রণীত 'আরব-ভূগোলের ইতিহাস' প্রকাশিত হয়। পরে ১৯৬৩ সালে কায়রো থেকে উক্ত গ্রন্থের

www.waytojannah.com

আরবী অনুবাদ প্রকাশিত হয়। তাঁর এই অসাধারণ কাজ এ বিষয়ে নিষ্ঠাবান গবেষকদের চিন্তাভাবনাকে বিশেষভাবে আলোড়িত করে এবং ভূগোল বিজ্ঞানে মুসলমানদের অবদান সম্পর্কে আরো লেখার ব্যাপারে আমাকেও তৎপর করে তোলে।

এই গ্রন্থখানি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড কর্তৃক আমাকে বারংবার তাগাদা দেয়ার ফসল। যাঁরা আন্তরিকভাবে চেয়েছিলেন আমি যেন ভূগোল বিজ্ঞানে মুসলমানদের অবদান সম্পর্কিত বিষয়ের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্যগুলো সুচারুরূপে ফুটিয়ে তুলতে পারি, এই গ্রন্থ প্রকাশের জন্য তাঁদের প্রতি আমার গভীর কৃতজ্ঞতা জানাই।

নাফিস আহমদ

ঢাকা, মে ১৯৮০

www.waytojannah.com

প্রথম অধ্যায়

মুসলিম ভূগোল বিজ্ঞানের উৎকর্ষতা

মনে হয় শুরুতেই ভূগোল বিজ্ঞানে মুসলিম অবদানের বৈজ্ঞানিক বৈশিষ্ট্যসমূহ এবং এর বর্তমান প্রাসঙ্গিকতা সম্পর্কে আলোকপাত করা যুক্তিযুক্ত হবে। এ প্রসঙ্গে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন উত্থাপিত হতে পারে। যেমনঃ

১। কেন মুসলমানরা ভূগোলের ব্যাপারে এত বেশী আগ্রহী হয়েছিলেন?
২। ভৌগোলিক ধারণা ও জ্ঞানের চর্চা কিভাবে করা হয়েছিল?
৩। কোন্ দৃষ্টিকোণ থেকে মুসলিম ভূগোলকে আলাদাভাবে চেনা যাবে?
৪। মুসলমানদের ভূগোল চর্চা কিভাবে ইউরোপীয় চিন্তাজগতকে প্রভাবিত করেছিল?
৫। আধুনিক চিন্তাজগতে মুসলিম ভূগোলবিদদের অবদানের প্রাসঙ্গিকতা কতটুকু?

ইসলামের আবির্ভাব হয়েছে রাসূল মুহাম্মদ (সা) ৬২২ খ্রিস্টাব্দে মদীনায় আসার পর, যখন থেকে মুসলিম পঞ্জিকা তথা হিজরী সাল গণনা শুরু করা হয়। ৬৬০ থেকে ৭৫০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত দামেস্কে উমাইয়া খলীফাদের শাসন চলতে থাকে। উক্ত সময়ে মুসলিম সাম্রাজ্য পশ্চিমে স্পেন ও মরক্কো পর্যন্ত এবং পূর্বে সিন্ধু ও মধ্য এশিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। উমাইয়াদের পরে ৭৫০ খ্রিস্টাব্দে আব্বাসীয়গণ ক্ষমতায় আসীন হয়। ৭৬২ খ্রিস্টাব্দে খলীফা আল মনসুর বাগদাদ প্রতিষ্ঠা করেন। নব প্রতিষ্ঠিত এই সাম্রাজ্য এশিয়া মাইনরের বহু এলাকাসহ আরো পূর্ব দিকে বিস্তৃত হয় এবং সাম্রাজ্যের সীমানা চীন সীমান্ত অবধি পৌঁছে যায়। অপরদিকে আরেকটি পৃথক উমাইয়া সাম্রাজ্যের সীমানা মরক্কো এবং স্পেন পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। ফলে দেখা গেল যে রোম সাম্রাজ্যের চাইতেও বিশাল এবং বিস্তৃত এক নতুন সাম্রাজ্য গড়ে উঠেছে যার সাথে যোগাযোগ

প্রকৃত পক্ষে নবুওত প্রাপ্তির পর ৬১০ থেকে ৬১১ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে ইসলামের প্রচার কাজ শুরু হওয়ার কাল-কে ইসলামের আবির্ভাব কাল বিবেচনা করা অধিকতর যুক্তিযুক্ত, – অনুবাদক

www.waytojannah.com

ঘটছে বহু বিচিত্র সংস্কৃতির বিশেষ করে গ্রীক, রোমান, পারস্য, চীন ও ভারতীয়দের সাথে। একই সময়ে দেখা গেল যে আরব ব্যবসায়ীরা সুদূর দক্ষিণ চীনে ক্যান্টনের কাছে নিজেদের বসতি স্থাপন করছে, আবার তাদের কেউ কেউ পূর্ব আফ্রিকার সমুদ্র উপকূলে নিয়মিত নৌচালনা করছে। আরব ব্যবসায়ী এবং তাদের প্রতিনিধিরা এমনকি রাশিয়া হয়ে স্ক্যান্ডিনেভিয়া পর্যন্ত পৌঁছে যায়।

বাগদাদ এবং সেখানকার অনুবাদ কেন্দ্র

আব্বাসীয় খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর মুসলিম শাসনাধীনে জনসাধারণ ক্ষমতা এবং সাংস্কৃতিক বিকাশের ক্ষেত্রে গৌরব ও সমৃদ্ধির যুগে প্রবেশ করে। অচিরেই সংস্কৃতির ক্ষেত্রে সমন্বিতকরণের প্রক্রিয়া শুরু হয়। এ সময়ে বাগদাদে বায়তুল হিকমাহ (অনুবাদ কেন্দ্র) প্রতিষ্ঠিত হওয়া ছিল অগ্রগতির পথে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। বহু দূর-দূরান্ত থেকে অনুবাদক ও জ্ঞানীগুণীদেরকে নিয়ে আসা হতো। এর প্রধান লক্ষ্য ছিল গ্রীক, পারস্য, ভারতীয় ও অন্যান্য ভাষার জ্ঞান-বিজ্ঞানকে আরবী ভাষায় সহজলভ্য করে দেয়া। জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার মধ্যে ভূগোল, পদার্থবিদ্যা, আবহাওয়াবিদ্যা, খনিজবিজ্ঞান, উদ্ভিদবিজ্ঞান, জ্যোতির্বিজ্ঞান, চিকিৎসাবিজ্ঞান ও দর্শনশাস্ত্র বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করে। যে সকল গ্রীক লেখক আরবদের উপর প্রভাব বিস্তার করেছিলেন, তাঁরা কবি, ঐতিহাসিক বা বাগ্মী ছিলেন না বরং তাঁরা ছিলেন বিজ্ঞানের সেবক। যেমন এ সময় প্লেটো, সক্রেটিস, হোমার অথবা হেরোডোটাস-এর লেখা অপেক্ষা এ্যারিস্টটলের বিজ্ঞান বিষয়ক লেখা অধিকতর মনোযোগ আকৃষ্ট করতে সক্ষম হয়। এ সময়ে পাশ্চাত্যের কাছে গ্রীক চিন্তাধারা ছিল অপরিচিত। খলীফা হারুন-অর-রশীদ এবং মামুন-অর-রশীদ যখন গ্রীক দর্শন ও বিজ্ঞান নিয়ে গবেষণায় রত তখন সম্রাট চার্লিম্যাগনে এবং তাঁর ব্যারনরা সবেমাত্র তাঁদের নাম লেখা শিখছেন।

মুসলিম সভ্যতার অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ভৌগোলিক জ্ঞানের উপর গুরুত্বারোপ করা[১] এবং সমৃদ্ধ ভূগোল সাহিত্য সৃষ্টি করা। অধ্যাপক গিব মন্তব্য করেছেন যে, 'সম্ভবত ভূগোল হচ্ছে সংস্কৃতির সবচাইতে সংবেদনশীল পরিমাপক, যা রাজনীতি, জীববিজ্ঞান, গণিতশাস্ত্র, জ্যোতির্বিজ্ঞান, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, ভ্রমণ ইত্যাদি সকল শাখা-প্রশাখা নিয়ে পল্লবিত হয়েছে এবং দূরের মানুষের ভূমি ও সভ্যতাকে আলিঙ্গন করার জন্য সেখানে উপস্থিত হয়েছে।'

এটা উপলব্ধি করা আবশ্যক যে, তৎকালীন গ্রীক জ্ঞান-বিজ্ঞান এখনকার মতো বিভিন্ন শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত ছিল না। যে সকল ধ্যান-ধারণাকে কেন্দ্র করে ভূ-বিজ্ঞান

www.waytojannah.com

Contents

(আধুনিক পরিভাষা অনুসারে) এর ধারণা আবর্তিত হতো, তন্মধ্যে ভূগোল ছিল কেন্দ্রীয় অবস্থানে, তাকে বিবেচনা করা হতো সকল বিজ্ঞানের জন্মদাত্রী (mother of sciences) হিসেবে, কেননা এই বিজ্ঞান ভূ তথা পৃথিবীর সকল বিষয়কে তার আলোচনার আওতাভুক্ত করতো। এই চিন্তাধারা আরবদের চিন্তাজগতেও সুগভীর প্রভাব ফেলতে সক্ষম হয়। এ ছাড়া ধর্মীয়, প্রশাসনিক ও বাণিজ্যিক কারণেও মুসলমানরা স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে ভূগোল চর্চা করেছে।

বিজ্ঞানের প্রতি মুসলমানদের মনোভাব

পবিত্র কুরআনে প্রকৃতি সম্পর্কে বহুবার উল্লেখ করা হয়েছে।[২] রাসূল (সা) বলেছেন, "জ্ঞান অর্জনের জন্য প্রয়োজনে চীনে যাও", ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বেও আরবরা গ্রহ-নক্ষত্র, মরুভূমির ভূ-প্রকৃতি সংক্রান্ত বিদ্যা ও নৌ-বিদ্যা সম্পর্কে গভীরভাবে আগ্রহী ছিল। সুতরাং ভূগোল ও প্রকৃতির ইতিহাস সম্পর্কে তাদের কৌতূহল ছিল সহজাত। তারা পার্থিব জগত এবং আধ্যাত্মিকার মধ্যে পার্থক্য করতো না। মুসলমানরা সব সময় প্রকৃতিকে অধ্যয়ন করতে চেয়েছে আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টির নমুনা হিসেবে এবং ভৌগোলিক পরিমণ্ডলের বিস্তৃতি তাদের কাছে ছিল আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছাশক্তির প্রমাণ এবং অপরদিকে মানুষের শক্তিহীনতার প্রমাণ হিসেবে। জ্ঞানের যত বিস্তৃতি ঘটে ততই মানুষ নিজের গুরুত্বহীনতার কথা উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়। এভাবে তার আস্থা ও বিশ্বাস দুর্বল না হয়ে আরো শক্তিশালী হয়। এটা স্পষ্টতই তাঁর ওয়াহদাত্ (মহান স্রষ্টা হিসেবে) এবং 'কুদরাত' (মহা-কৌশলের অধিকারী)। সুতরাং ইসলামের প্রাথমিক যুগে যে সকল চিন্তাবিদ ও গবেষক প্রকৃতির ইতিহাস, বিজ্ঞান ও ভূমির গঠন বিষয়ে গভীর অধ্যয়ন করেছেন, তাঁরা সকলেই ভূগোল সম্পর্কে আগ্রহী ছিলেন। তাঁরা ছিলেন বহুমুখী জ্ঞানের অধিকারী (হাকিম আলিম)। হজ্জ পালন করা সামর্থ্যবান মুসলমানদের জন্য একটি অবশ্য পালনীয় দায়িত্ব। এটা যেমন একটি ধর্মীয় দায়িত্ব তেমনি এর মাধ্যমে মুসলমানদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ জাগ্রত হয়। হজ্জের মাধ্যমে জ্ঞান অর্জন করা এবং সফর করাকেও উৎসাহিত করা হয়েছে।

বস্তুগত ও জাগতিক দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যায় – মুসলিম সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করা, পশ্চিম আফ্রিকা ও স্পেন থেকে মধ্য-এশিয়া এবং ভারত মহাসাগরের উপকূল পর্যন্ত শাসন করার মাধ্যমে তাদের কাছে জীবন ও জগত সম্পর্কিত অপর বিষয়গুলো যেমনঃ ব্যবসায়-বাণিজ্যের সম্প্রসারণ, আভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক উন্নতি, যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা, শহর ও নগর স্থাপন করা এবং রাজস্ব আদায়ের ব্যবস্থাকে সংগঠিত করা ইত্যাদি বিষয় গুরুত্ব পেতে থাকে।

www.waytojannah.com

উপরিউল্লিখিত বিষয়গুলো থেকে আলোচনার শুরুতে আমাদের প্রথম প্রশ্ন অর্থাৎ ভূগোলের প্রতি এরূপ দুর্নিবার আকর্ষণের কারণ সম্পর্কিত প্রশ্নের জবাব খুঁজে পাওয়া যায়।

অন্ধকার যুগ

ইসলামী রেনেসাঁর পূর্বে জ্ঞানচর্চা এবং ভূগোল সম্পর্কিত ধারণা কেমন ছিল? বহুল আলোচিত অন্ধকার যুগ (বিজ্ঞান সম্পর্কে অজ্ঞতার যুগ, আনুমানিক খ্রিস্ট পরবর্তী তৃতীয় থেকে সপ্তম শতাব্দী পর্যন্ত) শুরু হয় রোমান সাম্রাজ্যের পতনের আগে থেকে। সর্বোপরি ধর্মগ্রন্থের সংকীর্ণ ব্যাখ্যার কারণে বহু খ্রিস্টান যাজক পৃথিবী গোলাকার – এ কথা বিশ্বাস করতেন না। আর তাদের এরূপ ধারণার ভিত্তিতেই ভৌগোলিক ধারণাসমূহ গড়ে উঠেছিল। বস্তুত তৎকালীন গ্রীক বিজ্ঞানের অবদানে অজ্ঞানতা ও গোঁড়ামী যেন আরো বেড়ে গিয়েছিল। যেমন সেইন্ট অগাস্টাইন ভূ-পৃষ্ঠের প্রতিপাদ্য স্থানের (antipode) অস্তিত্বে বিশ্বাস করতেন না। তিনি ঘোষণা করেন যে, মুক্তিলাভের জন্য বিজ্ঞানের কোন আবশ্যকতা নাই। কসমাস নামে একজন নাবিক, যিনি পরে সন্ন্যাসী হয়েছিলেন, তিনি তাঁর প্রণীত গ্রন্থ Christian topography-তে দাবী করেছিলেন যে, পৃথিবী প্রথমে ছিল একটি বর্গক্ষেত্র। এই উদ্ভট গ্রন্থের দাবী অনুসারে একদিন হঠাৎ উত্তরে একটি উঁচু পাহাড় দাঁড়িয়ে গেল, যার পিছনে লুকোচুরি খেলে একটি ক্ষুদ্রাকার সূর্য, ফলে দিন ও রাতের সৃষ্টি হয়। অধিকাংশ লোক মনে করতো, বিজ্ঞান ও ভূগোল সহ অন্যান্য জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং এ সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যকলাপ হচ্ছে যাদুবিদ্যা। তখন সরাসরি ভবিষ্যদ্বাণী করা হতো যে ১০০০ খ্রিস্টাব্দে পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে।

অপরদিকে আল মাসউদীর বর্ণনা অনুসারে খলীফা উমর (রা) দুঃসাহসী মুজাহিদদের দ্বারা কোন নতুন অঞ্চল বিজয়ের সংবাদ শোনার পর কোন একজন জ্ঞানী ব্যক্তিকে সেখানকার ভূ-প্রকৃতি, জলবায়ু, ভোগৌলিক অবস্থান সম্পর্কে এবং ভূমি ও জলবায়ু সেখানকার মানুষের উপর কীরূপ প্রভাব ফেলে তা বর্ণনা করতে বলতেন। মাকদিসি (জ. ৯৪৭-৮) তাঁর 'আহসানুত তাকসীম' (জলবায়ু সম্পর্কিত জ্ঞানের সর্বোত্তম বিভাজন) গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, ভূগোল হচ্ছে এমন এক বিষয় যা রাজা এবং ভিখারী সকলকেই সন্তুষ্ট করতে পারে। ইয়াকুত হামাভী (মৃত্যু ১২২৯) মন্তব্য করেছেন যে, ভূগোল দ্বারা আল্লাহকেও খুশী করা যায়। এমনকি শুদ্ধপন্থী ইমাম গাযালী (র) বিশ্বাস করতেন যে, বিজ্ঞানের সেবকের জন্য বেহেশতের পথ সহজ হয়ে যায়।

অবদানের প্রকৃতি

ব্যাখ্যার সুবিধার্থে ভূগোল বিজ্ঞানে মুসলমানদের অবদানকে চার ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন, সাধারণ ও আঞ্চলিক ভূগোল, বৈজ্ঞানিক ভূগোল এবং এ সম্পর্কিত লেখা,

www.waytojannah.com

Contents

মানবিক ও সামাজিক ভূগোল, মানচিত্র (Cartography) বা মানচিত্রাঙ্কন বিদ্যা। আঞ্চলিক ভূগোল বিভাগে অন্তর্ভুক্ত আছে চলাচলের পথ সম্পর্কিত গ্রন্থ (Route Books-কিতাবুল মাসালিক ওয়াল মামালিক), বিভিন্ন দেশ সম্পর্কিত গ্রন্থ (কিতাবুল বুলদান), অভিধান, দিনপঞ্জি এবং ভ্রমণ বিবরণীসমূহ। বৈজ্ঞানিক ভূগোল সম্পর্কিত গ্রন্থের বিষয়বস্তু হচ্ছে পৃথিবীর আকার ও গঠন সম্পর্কিত ধারণা, অক্ষাংশ, দ্রাঘিমাংশ, ভূমির পরিমাপ এবং যন্ত্রপাতির ব্যবহার ইত্যাদি। মানবিক ও সামাজিক ভূগোলের বিষয়বস্তুর মধ্যে রয়েছে পরিবেশ, সমাজ, মানুষ, মানব গোষ্ঠী ও তাদের বসতি সংক্রান্ত বিবরণ। কার্টোগ্রাফির বিষয়বস্তু হলো মানচিত্র অংকন করার কৌশল ও প্রণালী।

আঞ্চলিক ভূগোল

অষ্টম শতাব্দীতে বেশ কিছু সংখ্যক ভূগোল গ্রন্থ প্রণীত হয়েছে। তবে বিভিন্ন লেখক কর্তৃক আকর্ষণীয় এবং জনপ্রিয় ভূগোল সাহিত্যাবলী প্রণীত হয়েছে Route Books বা চলাচলের পথের বিবরণের উপর ভিত্তি করে। ইবন খুরদায়বিহ (খ্রিস্টাব্দ ৯১২) উপরোক্ত বিষয়ে তাঁর বিখ্যাত কিতাব রচনা করে এই ধারার গ্রন্থ রচনার পথকে আলোকিত করেন। তিনি আরব বিশ্বের প্রধান প্রধান বাণিজ্য পথের এক অসাধারণ বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন। এ ছাড়া তিনি চীন, কোরিয়া এবং জাপান সম্পর্কেও বিবরণ দান করেছেন। তাঁর এই গ্রন্থ এ বিষয়ে একটি 'আদর্শ নমুনা' হিসেবে এবং পরবর্তীকালে রচিত গ্রন্থসমূহের জন্য উৎস গ্রন্থ হিসেবে পরিগণিত হয়। এ বিষয়ে আরো উল্লেখযোগ্য গ্রন্থাবলী রচনা করেছেন আল মারওয়ারুযী (মৃত্যু ৮৮৭), সারাখসী (মৃত্যু ৮৮৯) এবং আবূ যাইদ আল বলখী (মৃত্যু ৯৩৩) – যিনি কিতাবুল আশকাল (মানচিত্র সম্পর্কিত বই) গ্রন্থের রচয়িতা হিসেবেও পরিচিতি লাভ করেছিলেন। সামানিদ রাজসভার দুজন মন্ত্রী আবুল ফারাজ আল বাগদাদী (মৃত্যু ৯২২) এবং আল জায়হানী (খ্রিস্টাব্দ ৮৯৩-৯০৭) রাজস্ব বিষয়ে (কিতাবুল খারাজ) দুটি বিখ্যাত গ্রন্থ রচনা করেন। বলখী, আল ইস্তাখরী এবং ইবন হায়কল (৯৭৭) তাঁদের গ্রন্থে ভৌগোলিক বর্ণনার সাথে ব্যাখ্যামূলক মানচিত্র সংযোজন করেন। আন্দালুসিয়ার (স্পেনে) কর্ডোভাতে আল বাকরী (মৃত্যু ১০৯৪) তাঁর প্রণীত ভৌগোলিক অভিধান ও চলাচলের পথ (Route book) বিষয়ক গ্রন্থে একই কৌশল অবলম্বন করেন।

চলাচলের পথ সম্পর্কিত গ্রন্থের বিষয়বস্তুকে আরো সম্প্রসারিত করে রচিত হয় দেশ বিষয়ক গ্রন্থ (কিতাবুল বুলদান), ভৌগোলিক অভিধান ও গেজেটিয়ারসমূহ। এ ধরনের লেখকগণের মধ্যে সবচাইতে খ্যাতি লাভ করেছেন ইয়াকুবী (৮৯১), যাঁর কিতাবুল বুলদান-এ রয়েছে স্থানিক ও অর্থনৈতিক বিষয়ের বিশদ বিবরণ। তিনি আরব

www.waytojannah.com

থেকে উত্তর আফ্রিকা পর্যন্ত বিশাল এলাকার নগর ও অঞ্চলসমূহের বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন। একজন মহান ভূগোলবিদ হিসেবে তাঁর খ্যাতির প্রমাণ তৎপ্রণীত সুলিখিত কিতাবসমূহেই পাওয়া যায়। এই শ্রেণীর লেখকদের মধ্যে রয়েছেন আল বালাযুরী (৮৬৯), আল হামাদানী (৯০২), ইবন রুসতাহ (৯০৩ আল আলাক আল নাফিসাহ), ইবনুল হাইক (মৃত্যু ৯৪৫) এবং মুহাল্লাবী (৯৮৫)। 'হুদুদ আল আলম' (খ্রিস্টাব্দ ৯৮২) নামে একজন ছদ্মনামা লেখক পারস্য ভাষায় আঞ্চলিক বিবরণের ভিত্তিতে বৈশ্বিক ভূগোল বিষয়ে একখানা উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ রচনা করেন। পাশ্চাত্যে প্রণীত ইসলামী সাহিত্যের মধ্যে গ্রানাডার আল তারিকী (৯৭৩), আল যুহরী (১১৩৭) এবং আল মুনাযযিম (মৃত্যু ১০৬৮) প্রণীত বিভিন্ন দেশের বর্ণনা বিষয়ক গ্রন্থ উল্লেখযোগ্য। তবে মুসলমান লেখক কর্তৃক প্রণীত শ্রেষ্ঠ ভূগোল গ্রন্থের নাম ইয়াকুত আল হামাভী (১২২৪) রচিত মুজাম-আল বুলদান (অভিধান ও গেজেটিয়ার)। এই গ্রন্থে তাতারদের দ্বারা এশিয়ার মুসলমান অঞ্চলসমূহের উপর ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞের ঠিক আগে মুসলিম বিশ্বের ভূগোল সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

ভ্রমণ সাহিত্য

মধ্যযুগের ভ্রমণ সাহিত্য ভৌগোলিক তথ্যাবলীর গুরুত্বপূর্ণ উৎস। মুসলিম বিশ্বের সীমানা এশিয়া থেকে আফ্রিকা এবং ইউরোপমুখী বিপুল বিস্তারের ফলে এবং নৌবিদ্যা সম্পর্কে তাদের ক্রমবর্ধমান তৎপরতার ফলে ভৌগোলিক জ্ঞানের ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব অগ্রগতি সাধিত হয়। দূরবর্তী অঞ্চল এবং অপরিচিত পরিস্থিতির ভৌগোলিক বিবরণ বিভিন্ন স্থান ও মানুষের মধ্যে আগ্রহের উজ্জীবন ঘটায়। সিন্দবাদ 'এক হাজার এক রাত্রি' (আলিফ লায়লা ওয়াল লায়লা) নামের বিখ্যাত কাহিনীর একটি কাল্পনিক চরিত্র হতে পারে। কিন্তু তার নৌচালনা কৌশলের বিবরণ থেকে ভারত মহাসাগরে আরব নাবিকদের বহুল ব্যবহৃত ও চিরাচরিত কৌশলের পরিচয় পাওয়া যায়। মসলা, সিল্ক, মুক্তা, সুগন্ধি, চিনি ও সোনা সহ বিভিন্ন বিদেশী পণ্যের ব্যবসায়-বাণিজ্য এবং প্রাচ্যের বিভিন্ন বন্দরের ক্লান্তিহীন ব্যস্ততা সিন্দবাদকে আকর্ষণ করতো। এ ছাড়া বুজুর্গ শাহরিয়ার ও সুলায়মান সওদাগর-এর মতো নাবিক এমনকি আল-মাসউদী ও ইবনে বতুতার পথে দূরদেশের পানে হাতছানি দিয়েছে। উল্লেখ্য, ঐশ্বর্য্যমণ্ডিত বাগদাদে সিন্দবাদের প্রাসাদোপম অট্টালিকা, সেখানকার গোলাপ বাগানে হাওয়া খেয়ে বেড়ানো, আর বুলবুলির মন জুড়ানো গানের বর্ণনার সাথে অভিজ্ঞ নাবিক ও তাঁর সঙ্গীরা তাদের নিজেদের অভিযানের তুলনা করে আনন্দ পেয়েছে এবং উদীপ্ত হয়েছে।

নৌ-চালনা বিদ্যা ও ভৌগোলিক বিবরণ

সিরাফ-এর আবূ যাইদ আল হাসান (৯২০) বাস্তবতা এবং প্রকৃত ভৌগোলিক বিবরণের ভিত্তিতে 'আখবারুস সিন ওয়াল হিন্দ' শিরোনামে বিখ্যাত গ্রন্থ প্রণয়ন

www.waytojannah.com

করেছিলেন। মার্কো পোলো এবং ইবনে বতুতার পূর্বে এটিই সম্ভবত এ ধরনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ। ইবনে শাহরিয়ার তাঁর বিখ্যাত 'আযাইব আল হিন্দ' (ভারতীয় আজব আজব ঘটনার বিবরণ) গ্রন্থ রচনা করেছিলেন ৯৫৩-৫৪ খ্রিস্টাব্দের দিকে। পরবর্তীকালে আহমদ ইবন মজিদ (১৪৮৯) এবং সুলায়মান আল মাহরী (ষোড়শ শতাব্দীর গোড়ার দিকে)-এর পর্যায়ের শ্রেষ্ঠ নাবিকগণ তাঁদের পূর্ববর্তী যুগের নাবিক বিশেষ করে মুহাম্মদ ইবনে শাযান এবং সাহল ইবনে আবান-এর মতো বিখ্যাত নাবিকদের সম্পর্কে বিবরণ প্রদান করেছেন। রইস, সিদি আলি এবং আল সিফাক্সী (১৫৫১)-এর মতো ভারত মহাসাগর বিষয়ে বিশেষজ্ঞ লেখকদের বর্ণনায় মজিদ এবং মাহরী সম্পর্কে উল্লেখ পাওয়া যায়।

আল-মাসউদীর বিখ্যাত ভ্রমণ বিবরণীমূলক (মুরুয আল যাহাব) গ্রন্থ, যা মাকরান উপকূল, সিন্দু, পাকিস্তানের উত্তরাঞ্চলসহ উপমহাদেশের বাদবাকী এলাকা, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও তৎসংলগ্ন এলাকার বাস্তব তথ্যাবলী ও মোহনীয় ভাষায় প্রদত্ত অসাধারণ বর্ণনাশৈলীর জন্য স্মরণীয় হয়ে থাকবে। তাঁর লেখা 'সোনার তৃণভূমি এবং মূল্যবান পাথরের খনি' (৯৪৭) শীর্ষক গ্রন্থ ঐতিহাসিক ভূগোলের একটি মূল্যবান বিশ্বকোষ হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে। আল ইস্তাখরী, ইবনে হায়কল, আল-মাকদিসি (৯৮৬), নাসির খসরু (১০০৩), আলী আল-হারাভী (১২১৪) – এঁরা সকলে অসাধারণ ভ্রমণ বিবরণী লেখক হিসেবে সুপরিচিত। চতুর্দশ থেকে ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত প্রাচ্যের ভ্রমণ ও ভৌগোলিক বিবরণী লিখে খ্যাতি অর্জন করেছেন হাফিয আবরু, আবদুর রাজ্জাক সমরকন্দী, আবুল ফযল আল্লামী এবং আমিন আহমদ রাযী। পশ্চিমে স্পেন এবং উত্তর আফ্রিকায় আল-মাযিনি, আল আন্দালুসি (১১৬৯), ভ্যালেন্সিয়ার বাসিন্দা ইবন যুবায়ের (১২১৭), ইবনে সাইদ আল মাগরিবি (মৃত্যু ১২৭৫) – তাঁরা পৃথিবীকে যেভাবে দেখেছেন সেভাবে ভ্রমণ ও ভৌগোলিক বিবরণী লিপিবদ্ধ করে বিশেষ অবদান রাখেন। শামসুদ্দীন ইবনে বতুতার (মৃত্যু ১৩৭৭) ভ্রমণ বিবরণী-বর্ণনার বিস্তৃতি ও বিশ্লেষণধর্মিতার জন্য তুলনাহীন। তিনি মার্কো পোলোর চাইতেও ব্যাপক এলাকা ভ্রমণ করেছিলেন এবং তাঁর ভ্রমণ বিবরণী ভৌগোলিক তথ্যাবলীর খনি বিশেষ।

বৈজ্ঞানিক ভূগোল

ভূগোল বিষয়ক তত্ত্ব প্রণয়ন, মূল্যবান প্রবন্ধাবলীর সংকলন ও প্রাপ্ত তথ্যাবলীর বিশ্লেষণের মাধ্যমে মুসলমানগণ ভূগোল শাস্ত্রে অত্যন্ত উঁচুমানের অবদান রেখেছেন। এ দৃষ্টিকোণ থেকে স্মরণীয় অবদান সৃষ্টি হয়েছিল দশম শতাব্দীতে। আল-খাওয়ারিযমী প্রণীত 'বিজ্ঞানের চাবিকাঠি' (মাফাতিহুল উলুম) এবং 'ইখওয়ানুস সাফা' (পবিত্রতার জন্য ভ্রাতৃসংঘ) রচনাবলী এ শ্রেণীর গ্রন্থাবলীর অন্তর্ভুক্ত। এ সকল গ্রন্থে মানুষের

www.waytojannah.com

কর্মচাঞ্চল্য ও পশুকুলের আচরণ, তাদের স্বাস্থ্য ও সমৃদ্ধির ক্ষেত্রে ভৌত পরিবেশের প্রভাবের উপর জোর দেয়া হয়েছে। এ সকল বিষয় ছিল সূক্ষ্ম বিশ্লেষণধর্মী আলোচনা। মাসউদী ভূমিকম্প সম্পর্কে তথা একটি ভিন্নতর ভূতাত্ত্বিক বিষয়ের বর্ণনা প্রদান করেছেন। এ ছাড়া তিনি নৌ-চালনা সম্পর্কিত সমস্যাবলী যেমন জোয়ার-ভাটা, স্রোতধারা, সাগরসমূহের উৎস এবং নদী ভাঙ্গনের চক্রাকার বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি বিষয়ের উপরও আলোচনা করেছেন। বিখ্যাত দার্শনিক, চিকিৎসাবিজ্ঞানী ও পণ্ডিত ইবনে সীনা (৯৮০-১০৩৭) প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের ব্যাপারে বিশেষভাবে আগ্রহী ছিলেন। তিনি জীব-ভূগোল বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করেছেন। তিনি এতে মানুষ এবং পরিবেশগত উপাদানের মধ্যে পারস্পরিক বোঝাপড়ার উদাহরণ তুলে ধরেছেন। পাহাড়-পর্বত ও উপত্যকার উৎপত্তি, খনিজ সম্পদ ও বিভিন্ন ভূতাত্ত্বিক বিষয়ে রচিত এ সকল গ্রন্থ রেনেসাঁর পূর্ব পর্যন্ত পশ্চিম ইউরোপের চিন্তাজগতে তাঁর প্রভাব অক্ষুণ্ন রাখতে সক্ষম হয়।

আবূ রায়হান আল-বিরুনী (৯৭৩-১০৪৮) ছিলেন তাঁর সমসাময়িক বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে একজন শীর্ষস্থানীয় এবং মধ্যযুগের শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী। তিনি ছিলেন বহুমুখী প্রতিভা এবং পাণ্ডিত্যের অধিকারী। মানবতাবাদ এবং সহনশীলতা ছিল তাঁর বিশেষ গুণ। ভূগোল, জ্যোতির্বিজ্ঞান, গণিত, সমাজ ও ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া সম্পর্কে ছিল তাঁর অসাধারণ জ্ঞান। তিনি বহু কিতাব রচনা করলেও তাঁর কিছু কিছু কিতাব বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। তাঁর প্রণীত বিখ্যাত গ্রন্থ কিতাবুল হিন্দ, কানুন আল-মাসউদী, প্রাচীন জাতিসমূহের ধারাবিবরণী, গণিত ও মূল্যবান পাথর সম্পর্কিত গ্রন্থাবলী বিজ্ঞানের জগতে অমূল্য অবদান রেখেছে। তাঁর রচনায় অন্তর্নিহিত ভূগোল-চেতনা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। কয়েক প্রজন্ম পরেই মহান ভূগোলবিদ আল ইদরিসির আবির্ভাব ঘটে। কর্ডোভায় শিক্ষাগ্রহণ এবং ব্যাপকভাবে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চল ভ্রমণের পর তাঁর খ্রিস্টান পৃষ্ঠপোষক সিসিলির রাজা দ্বিতীয় রজার (১১৬১)-এর রাজদরবারে তিনি জ্ঞানচর্চায় অতিবাহিত করেন। বৈজ্ঞানিক ভূগোল বিষয়ে তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'নুযহাতুল মুশতাক' (কিতাবুল রুজারী)। তাঁর দ্বারা অংকিত মানচিত্র এবং ভ্রমণ বিবরণী একজন ভূগোলবিদ হিসেবে তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ বহন করে। তাঁর পরে ভূগোলবিদ হিসেবে শীর্ষস্থানীয় ছিলেন আল-কাযবিনি (মৃত্যু ১২৮৩), আবুল ফিদা (জন্ম ১২৭৩), হামদুল্লাহ মুসতাওফী (১৩৪০) এবং আল-দিমাশকী (মৃত্যু ১৩২৭)।

আল-কাযবিনি রচিত 'বিশ্বতত্ত্ব' (Cosmography- আযাইব আল মাখলুকাত) শুধুমাত্র মধ্যযুগেই জনপ্রিয় ছিল না, বরং আধুনিক কালেও এর জনপ্রিয়তা অব্যাহত রয়েছে। তিনি তাঁর 'ভূগোল' গ্রন্থে পঞ্চাশেরও অধিক লেখকের বরাত দিয়েছেন।

www.waytojannah.com

আবুল ফিদা রচিত 'তাকরিম আল বুলদান' বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদকর্মের মাধ্যমে ইউরোপে বিশেষ পরিচিতি লাভ করেছে। মুসতাওফী ভূগোল বিষয়ক গ্রন্থ 'নুযহাতুল কুলুব' রচনা করেছিলেন ফারসী ভাষায়। এটি রচিত হয়েছিল মুসলিম দুনিয়ার উপর তাতারদের আগ্রাসনের পরে অর্থাৎ হালাকু খানের পৌত্রের সময়ে। হাফিয আবরু বিশ্বতত্ত্ব (Cosmography) বিষয়ে 'যুবদাতুত তাওয়ারিখ' রচনা করেন ১৪১৪ খ্রিস্টাব্দে তৈমুর লং-এর সময়ের পরে।

গাণিতিক ভূগোল এবং মানচিত্রাংকনবিদ্যা (Cartography)

ভূগোল বিজ্ঞানের উপাদান হিসেবে গণিত ও জ্যোতির্বিদ্যা বিষয়ক চর্চা চলেছে দীর্ঘকাল ধরে। শুরুতে এটা ছিল গ্রীক, ইরান ও ভারতীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান দ্বারা প্রভাবিত। তবে পরবর্তীকালে মুসলমানগণ অগ্রসর চিন্তাভাবনায় সমৃদ্ধ হয়ে নিজস্ব ধারা তৈরী করে নিতে সক্ষম হন। পৃথিবীর আকার, গঠন, গতি, অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমাংশের পরিমাপসহ নক্ষত্রসমূহের গতিপথ ও মহাকাশের অন্যান্য বস্তু সম্পর্কিত আলোচনা গাণিতিক ভূগোলের অবয়ব তৈরীতে ভূমিকা রাখে।

টলেমীর শ্রেষ্ঠ ভূগোল বিষয়ক গ্রন্থ Al-Magest আল নাইরিজি কর্তৃক অনূদিত হয়। নবম শতাব্দীর প্রথমার্ধে যে সকল পণ্ডিত এ বিষয়ে মনোনিবেশ করেছিলেন তাঁরা হলেন আল ফাযারী, আল বাত্তানী, আল হাসিব, আল নাহাওয়ান্দী, ইয়াহইয়া বিন মনসুর আল মারওয়ারুযী, মাশা আল্লাহ, আল খাওয়ারিযমী, আল কিন্দি, আবু মাশার, আল মাহানী এবং আবূ মূসা ইবনে শাকির-এর পুত্রগণ। কিন্তু এ বিষয়ে অনন্যসাধারণ ঘটনা ঘটে খলীফা আর মামুনের সময়ে–পৃথিবীর আকার ৩৬ উত্তর অক্ষাংশে নির্ণয় করার মধ্য দিয়ে। এ সময়ে তাদমুর (পালমিরা)-এর সমভূমি এলাকায় ভূগোলকের আকার ও পরিমাপ বিষয়ক বিদ্যা এবং জ্যোতির্বিদ্যা বিষয়ক গবেষণার জন্য একটি মানমন্দির নির্মাণ করা হয়। ২০৪,০০০ মাইল এবং ব্যাসার্ধ নির্ণয় করা হয় ৬,৫০০ মাইল। পৃথিবীর একটি বিশাল মানচিত্রও অংকন করা হয় (এই মানচিত্র হারিয়ে গেছে)। অল্প কিছুকাল পরে ইবনুল আলম, আল রাযী, আল কুহী এবং আবুল ওয়াফা এ বিষয়ে আরো অবদান রাখেন।

খলীফা আল আযিয এবং আল নাকিম-এর সময়ে কায়রোতে কিছু সংখ্যক মানমন্দির নির্মাণ করা হয় এবং ইবনে ইউনুস (মৃত্যু ১০০৯) এবং ইবনে হায়সাম-এর মতো বিখ্যাত পণ্ডিতগণ এ সকল মানমন্দিরে কাজ করেন। প্রাচ্যে ইবনে সীনা এবং ভারতে (বর্তমান পাকিস্তানের উত্তরাঞ্চলে) আল বিরুনী পৃথিবীর পরিমাপ কাজে নিজেদেরকে নিয়োজিত রাখেন। উত্তর আফিকা এবং স্পেনেও বেশ কিছু সংখ্যক ভূগোলবিদ এ কাজে নিজেদেরকে নিয়োজিত করেন। আর মাররাকুশী, আল মাজরিতি,

www.waytojannah.com

আল যারকালী (১০২৯-১০৮৮), জাবির ইবনে বাজ্জাহ (Avenpace) এবং ইবনে রুশদ (Averroes মৃত্যু ১১৯৮) প্রমুখ চিন্তাবিদ গাণিতিক ভূগোলের ব্যাপারে গভীরভাবে আগ্রহী ছিলেন। সালজুক শাসনামলে ওমর খৈয়াম (যিনি অবসরকালে কাব্য রচনা করতেন) ছিলেন শ্রেষ্ঠ গণিতবিদ ও জ্যোতির্বিজ্ঞানী। মঙ্গোলরা তাদের সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করা এবং ইসলাম গ্রহণের পর বিজ্ঞান ও ভূগোলের পৃষ্ঠপোষকে পরিণত হয়। সমরকন্দে উলুগ বেগ প্রতিষ্ঠিত মানমন্দির এবং তারও আগে নাসিরুদ্দীন তূসী কর্তৃক মারাঘাতে প্রতিষ্ঠিত মানমন্দির ছিল বৈজ্ঞানিক কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দু। খলিফা আল মামুনের পরে পরবর্তী ৬০০ বছরে প্রায় ২০টি মানমন্দির নির্মিত হয়।

অসংখ্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম এ কাজে ব্যবহৃত হয়েছে। এস্ট্রোলেব (Astrolabe), ল্যাটারকাস (Latercus), স্যাক্সট্যান্ট (Sextant), কোয়াড্রেন্ট (Quadrant), লিবনাহ (Libnah), মেরিডিয়ান সার্কেল (Meridian Circle) এবং নাবিকদের ব্যবহৃত কম্পাস ইত্যাদি যন্ত্রপাতির ব্যাপক উন্নতি ঘটে এবং এগুলো নিয়মিতভাবে ব্যবহৃত হতে থাকে। এ সময়ে সচরাচর মানচিত্র অংকন চর্চা করা হতো এবং ভূগোল বিষয়ক গ্রন্থ ও প্রবন্ধাদিতে বিশ্লেষণের কাজে প্রচুর মানচিত্র ব্যবহৃত হতো। দুর্ভাগ্যবশত এসবের বেশীর ভাগ হারিয়ে গেছে। আল বলখী, আল ইস্তাখরী, ইবনে হায়কল, আল বিরুনী এবং আল ইদরিসি প্রণীত ম্যাপ ছিল সুধিমহলে সুবিদিত। মুসলমান ভূগোলবিদগণ মহাকাশ ভিত্তিক (terrestrial) ভূ-গোলোক এবং পৃথিবী কেন্দ্রিক (celestial) ভূগোলোক তৈরী করেন এবং এগুলো অভিক্ষেপণ সংক্রান্ত সমস্যাবলীর উপর প্রচুর গবেষণা করেন। সামুদ্রিক চার্ট তৈরী করা এবং নৌপথের ম্যানুয়াল রচনা করা ছিল নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। ভাসকো দাগামাকে পূর্ব আফ্রিকার কেনিয়ায় অবস্থিত মালিন্দি (মাম্বাসার নিকটে) থেকে ভারতের কালিকট বন্দর পর্যন্ত অভিজ্ঞ নাবিক আহমদ ইবন মজিদ কর্তৃক জাহাজে পথ দেখিয়ে আনার বিষয় তো একটি ঐতিহাসিক ঘটনা।

মানবিক ও সামাজিক ভূগোল

আরব-মুসলিম প্রতিভাধর লেখকদের উপরে বর্ণিত গ্রন্থসমূহে সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও মানবিক ভূগোলের উপজীব্য স্পষ্টভাবে খুঁজে পাওয়া যায়। বস্তুগত এবং সাংস্কৃতিক উভয় দৃষ্টিকোণ থেকেই পরিবেশের ভূমিকার প্রতি বারংবার গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। এই দৃষ্টিভঙ্গি ইবনে খালদূন (আবূ যাইদ আবদুর রহমান) রচিত কিতাবুল ইবার (বিশ্ব ইতিহাস) এবং একই গ্রন্থের সাথে সংযোজিত পাণ্ডিত্যপূর্ণ ভূমিকার (আল মুকাদ্দিমাহ) উপরও এর পরোক্ষ প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। সমাজের উপর ভৌগোলিক ও মানবিক উপাদানের প্রভাব সম্পর্কে ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে তিনি আধুনিক ভূগোল ও সমাজবিজ্ঞানের পথিকৃতে পরিণত হন। তিনি তাঁর

www.waytojannah.com

রচিত গ্রন্থে মানব বসতি স্থাপন, নগরায়ন, কৃষি ও অর্থনৈতিক ভূগোল বিষয়ে আলোকপাত করেছেন।

ইউরোপীয় ভৌগোলিক ধ্যান-ধারণার উপর প্রভাব

এটা এখন সর্বজনস্বীকৃত যে মুসলিম ভূগোলবিদগণের নতুন নতুন ধ্যান-ধারণা এবং জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় তাদের অবদান বিভিন্ন পথে ও ধারায় ইউরোপে উপনীত হয় এবং পাশ্চাত্যের চিন্তাজগতে উদ্দীপকের ভূমিকা পালন করে। এগুলোর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হলো পৃথিবীর আকার-আকৃতি, গতি, ভূ-তাত্ত্বিক প্রক্রিয়া, সাগর, জলবায়ু, ভূ-পৃষ্ঠে উদ্ভিদ ও প্রাণীকুলের বিতরণ ও বিচরণ এলাকা এবং আফ্রিকার নতুন অঞ্চল সম্পর্কিত জ্ঞান।

এ সকল জ্ঞান বিভিন্ন মাত্রায় সন্নিবেশিত হয়ে স্পেন, সিসিলি, ছাড়াও অভিবাসন এবং ক্রুসেডের পথ ধরে দীর্ঘ সময়ে পর্যায়ক্রমে স্থানান্তরিত হয়েছে। কলম্বাসের নৌযাত্রার আগে বিখ্যাত ভূগোল গ্রন্থাবলী এবং ইউরোপের (Mappae Mundi), বিভিন্ন ম্যাপে স্পষ্ট ও পুঙ্খানুপুঙ্খকে প্রমাণ পাওয়া যায়। এগুলোর মধ্যে রয়েছে স্যালটার ম্যাপ (Psalter map, খ্রিস্টাব্দ ১২০০) হেয়ারফোর্ড (Hereford) ম্যাপ (খ্রিস্টাব্দ ১২৮০), ম্যারিনো স্যানুটো (১৩২৯) প্রণীত বিশ্ব মানচিত্র, বার্জিয়ান (Bargian) প্রণীত বিশ্ব মানচিত্র (খ্রিস্টাব্দ ১৪৫০), ইসটে (Este) প্রণীত বিশ্ব মানচিত্র, (খ্রিস্টাব্দ ১৪৫০), ফ্রা মুরো (Fra Mauro) প্রণীত আফ্রিকার মানচিত্র (১৪৫৯) এবং L'image du Monde (১৪৮০)-তে উপস্থাপিত ডায়াগ্রাম। ভিনসেন্ট অব বিউভাইস, এলবার্ট দি গ্রেট, রজার বেকন এবং আরো অনেকে আরবদের ভূগোলবিদ্যা ও তৎসংশ্লিষ্ট জ্ঞানের অন্যান্য শাখার ক্ষেত্রে বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন।

এমনকি পঞ্চদশ শতাব্দীতে ইউরোপে রেনেসাঁর প্রভাব শুরু হওয়ার প্রাথমিক যুগে বিজ্ঞানকে বিশেষ করে খ্রিস্ট ধর্মমত অনুসারে ধর্মবিরোধী বলে বিবেচনা করা হতো। ব্রুনোকে পুড়িয়ে মারা হয়, কেপলার ফাঁসিতে মৃত্যুবরণ করেন, গ্যালিলিও এবং লিওনার্দো দ্যা ভিন্সিকে তাঁদের মতবাদ পরিত্যাগে বাধ্য করা হয়। অপরদিকে অধিকাংশ মুসলিম চিন্তাবিদ ছিলেন প্রতিনিয়ত যুক্তি ও বিশ্বাসের সাথে সমন্বয় ঘটানোর কাজে সচেষ্ট।

ষোড়শ শতাব্দীর শুরুর দিকে একদা ইউরোপীয় নাবিকগণ ভারত মহাসাগর ও প্রশান্ত মহাসাগরের দিকে ধাবিত হতে থাকে। ভাগ্যের পাল্লা সম্পূর্ণরূপে পশ্চিমের অনুকূলে চলে যায়। বিশ্বজ্ঞানের আঙ্গিনায় ইউরোপ এগিয়ে যায়, মুসলমান এবং প্রাচ্য পিছনে হটে যায়। পাশ্চাত্যের বস্তুগত ও অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং তাদের

www.waytojannah.com

রাজনৈতিক কর্তৃত্ব এই নব উত্থানের ক্ষেত্রে প্রধান উপাদান হিসেবে ভূমিকা পালন করে।

ভূগোল বিজ্ঞানে মুসলিম চেতনা এবং এর বর্তমান প্রাসঙ্গিকতা

মুসলিম ভূগোল বিজ্ঞানের প্রকৃত চেতনা ছিল মানবতাবাদ ও বিশ্বজনীনতা। তাঁদের লক্ষ্য ছিল সংকীর্ণ অর্থে বিশেষায়িত জ্ঞানের পরিবর্তে জ্ঞানের বিস্তৃত পরিমণ্ডলে অবিরাম সাধনা করে যাওয়া। আমাদের কালে জ্ঞানবিজ্ঞানের অগ্রনায়কেরা জ্ঞানের পরিধিকে আরো বিস্তৃততর করেছেন। বস্তুত বৈজ্ঞানিক ভূগোল হচ্ছে সামাজিক ও ভৌত বিজ্ঞানসমূহের অগ্রগতির ফলশ্রুতি। বর্তমান উপস্থাপনার গুণগত উন্নতি ও উন্নত যন্ত্রপাতির পরিমাণ যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু এগুলো কখনো বিশ্লেষণাত্মক বর্ণনা কৌশলের বিকল্প হতে পারে না। বলা যেতে পারে মুসলিম ভূগোলের মানবতাবাদী ও যুক্তিবাদী ঐতিহ্য এখনো বৈশ্বিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং বিশ্ব সমস্যা সমাধানে বাস্তবভিত্তিক মনোভাব সৃষ্টিতে অবদান রাখতে পারে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে মুসলিম ভূগোলের উৎকর্ষ নির্দেশক প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল কৌতূহল, জ্ঞান অর্জনের অদম্য স্পৃহা ও তথ্যাবলীর যুক্তিভিত্তিক বিশ্লেষণ। আর এ সকল অগ্রগতি হচ্ছে তারই প্রকৃত নমুনা।

তথ্যসূত্র

১। Sarton-খণ্ড-১, পৃ. ৬২১।

২। দেখুন এস. এম. নদভী, A Geographical History of the Quran (কোলকাতাঃ ১৯৩৬)

www.waytojannah.com

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রাথমিক যুগের মুসলিম ভূগোল

সাধারণত অনুমান করা হয়ে থাকে যে ভূগোল বিজ্ঞান এবং এ সম্পর্কিত জ্ঞান-বিজ্ঞানে মুসলমানদের আগ্রহের সূচনা কিভাবে হলো - এ প্রশ্নের জবাব খুঁজে পাওয়া যাবে ভূগোলে গ্রীক অবদানের মাঝেই। অবশ্য বিশ্বের ইতিহাস পর্যালোচনায় এটা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, কোন নতুন সংস্কৃতির ভিত্তি অনিবার্যরূপেই নিহিত থাকে তাদের পূর্ববর্তী বিদায়ী সংস্কৃতির মধ্যে। যদিও গ্রীক সংস্কৃতি বহু ক্ষেত্রেই তার নিজস্ব প্রভা ও অনুপম বৈশিষ্ট্যে সমৃদ্ধ ছিল, তথাপি তাকে পশ্চিম এশিয়া, মিশর এবং ক্রীট সংস্কৃতির ধারাবাহিক ও মিশ্র উপাদানসমূহকে বরণ করে নিয়ে অগ্রসর হতে হয়েছে। এমনকি এ সকল সংস্কৃতিও কোন একক জনগোষ্ঠির নিজস্ব প্রতিভার প্রতিফলন ছিল না। যে কোন অগ্রসরমান সমাজের মানুষেরা তাদের ক্রমবর্ধমান পারস্পরিক সম্পর্কের মাধ্যমে ভবিষ্যত সমাজের জন্য অগ্রগতির বীজ বহন করে এগিয়ে চলে। তাই মানুষের অধিকাংশ ধ্যান-ধারণা গড়ে উঠে অতীত থেকে এবং অন্য মানুষের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে।

গ্রীকদের ভৌগোলিক জ্ঞান ও অগ্রগতির ভিত্তিমূলে রয়েছে তাদের দর্শন, কাব্য এবং গণিত। অনুসন্ধানমূলক অভিযান, যুদ্ধ এবং ঔপনিবেশিকতা তাদের এই জ্ঞানকে আরো সমৃদ্ধ করেছে। দেখা যায় এই অবস্থা গ্রীকো-রোমান যুগকে সমগ্রভাবে পরিব্যাপ্ত করেছে। যুদ্ধ, বিজয় এবং প্রশাসনিক কার্যাবলীতে অংশগ্রহণের অভিজ্ঞতা ক্লডিয়াস টলেমীকে ভূগোল বিষয়ের জ্ঞানে আগ্রহী করে তুলে এবং তাঁকে সার্বিক অগ্রগতির শীর্ষে পৌছে দেয়। যদিও এ সকল চিন্তাধারাকে গ্রীক চিন্তাধারা ও বিভিন্ন প্রাচ্যদেশীয় ধর্মের বিশেষত ইহুদীবাদ এবং খ্রিস্টবাদ-এর সাথে বুদ্ধিবৃত্তিক দ্বন্দ্বের মোকাবিলা করতে হয়েছে। কিন্তু এটা ছিল অসাধারণ এক ভাগ্যের ব্যাপার যে প্রাথমিক যুগের খ্রিস্টবাদ গোঁড়ামী ও সংকীর্ণ জাগতিক দৃষ্টিভঙ্গির জালে আবদ্ধ হওয়ার আগেই টলেমী (১৫০ খ্রিস্টাব্দ) তাঁর মহান রচনাকর্ম সম্পন্ন করেছিলেন। যাকে আমরা বলি বিজ্ঞানের

www.waytojannah.com

অন্ধকার যুগ, তা সম্ভবত প্রথম দিকের খ্রিস্টীয় শতাব্দীগুলোকে আচ্ছাদিত করে রেখেছিল। সে সময়ের আবেগময় ধর্মীয় চেতনা সকল প্রকার বিজ্ঞান চিন্তার প্রতি বিদ্বেষের জন্ম দিয়েছিল।

বিশেষত পৌত্তলিকতার অনুসারীদের বিজ্ঞান চিন্তা প্রবল বিরোধিতার সম্মুখীন হয়। ভূগোল বিষয়ক চিন্তাভাবনা এবং সকল প্রকার তথ্যভিত্তিক জ্ঞান ছিল গ্রহণের অযোগ্য।

সুতরাং প্রাকৃতিক জগত এবং পৃথিবীর অবস্থা সম্পর্কে ব্যাখ্যা করার ক্ষেত্রে বানোয়াট চিন্তাভাবনা আর খামখেয়ালী বিশ্বাসের যথেষ্ট সমাদর ছিল। কসমাস ছিলেন এরূপ মনোভাবের আদর্শ নমুনা। নাবিক হিসেবে ব্যবসায়-বাণিজ্যে তাঁর কিছু অভিজ্ঞতা ছিল। কিন্তু সন্ন্যাসী জীবন গ্রহণ করার পর পরই অর্থাৎ ৫৪৭ খ্রিস্টাব্দে তিনি তাঁর রচিত উদরর্ধ্বধটভ কমযমথরটযদহ গ্রন্থে কিছু উদ্ভট ভৌগোলিক ধারণার প্রকাশ ঘটান। তাঁর পৃথিবী ছিল সমতল, আয়তাকার এবং লম্বাটে, উত্তর-দক্ষিণ অপেক্ষা পূর্ব-পশ্চিমে প্রায় দ্বিগুণ লম্বা। যার চারদিক জলদ্বারা বেষ্টিত। একটি উঁচু ও শক্তিমান পাহাড় উত্তর প্রান্তে দাঁড়িয়ে আছে। যার চারপাশে একটি ক্ষুদ্রাকৃতির সূর্য নিয়মিত লুকোচুরি খেলা করছে। ফলে সৃষ্টি হয় দিন এবং রাত। এরূপ সাজানো-গুছানো কাণ্ডজ্ঞানহীনতার নমুনা আরো প্রচুর ছিল। প্রতীয়মান হয় যে বিভ্রান্তির এরূপ বিশৃংখল আধিক্যের মাঝে শুধু নেস্টোরিয়ান খ্রিস্টান ও কিছু সংখ্যক প্রকৃতি বিজ্ঞানী গ্রীক বিজ্ঞানের মূল চেতনাকে ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন। এই হতাশাব্যঞ্জক পটভূমিতে ইসলামের আবির্ভাবেরও প্রায় শতবর্ষ পরে মুসলিম বিজ্ঞানের জন্মকাল চিহ্নিত করতে গিয়ে আমরা প্রকৃতপক্ষে তাঁদের উজ্জ্বলতম কীর্তিগুলোকেই অবলোকন করি।

কয়েক শতাব্দীর মধ্যে ইসলাম একটি মহান আত্মিক ও বিজয়ী শক্তিরূপে আবির্ভূত হয় এবং কয়েকটি প্রজন্মের মধ্যেই মুসলমানরা সংস্কৃতিবান সম্প্রদায়ের নেতৃত্ব অর্জন করে, সাম্রাজ্যের বেশ কয়েকটি স্থানে শিক্ষা ও গবেষণার কেন্দ্রসমূহ গড়ে উঠে। বাগদাদে একটি বিশাল সমন্বিত সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল গড়ে উঠে। আর এই সাংস্কৃতিক প্রবাহ বয়ে চলে নিকট ও দূরবর্তী অঞ্চলসমূহে। বায়তুল হিকমাহ (জ্ঞানকেন্দ্র বা বিখ্যাত অনুবাদ কেন্দ্র) প্রতিষ্ঠা ছিল একটি ঐতিহাসিক ঘটনা, যার ফলে এই সমন্বিতকরণ সম্ভব হয় এবং মুসলমান সমাজ অগ্রগতির নতুন দ্বারপ্রান্তে উপনীত হয়। গ্রীস, এশিয়া মাইনর, মিশর, সিরিয়া, পারস্য এবং ভারত থেকে অনন্যসাধারণ পাণ্ডুলিপিসমূহ সংগৃহীত হওয়ার পর সেগুলো নিয়ে গবেষণা, আরবী ভাষায় অনুবাদ, সম্পাদনা ও ব্যাখ্যা করার জন্য গবেষকদেরকে নিয়োজিত করা হয়। বিখ্যাত

www.waytojannah.com

Contents

অনুবাদকদের মধ্যে ছিলেন ইবনুল বাতরিক, আবদুল মাসিহ, হুনাইন ইবনে ইসহাক (৮০৯-৭৩), আল জুহরী, ছাবিত ইবনে কুররাহ প্রমুখ।

এঁদের অনেকেই ছিলেন খ্রিস্ট পরবর্তী নবম শতাব্দীর মানুষ এবং তাঁরা খলীফা আল মামুনের কালে জীবিত ছিলেন। হুনাইন ইবনে ইসহাকের মতো গবেষকেরা প্রচুর পরিমাণে মাসিক হারে সম্মানী পেতেন। খলীফা আল মামুন তাঁকে অনূদিত গ্রন্থের ওজনের সমান স্বর্ন প্রদান করেছিলেন। এই অনুবাদের যুগ (৭৫০-৮৫০) শেষ হয়ে যাওয়ার আগেই তৎকালে বিদ্যমান এ্যারিস্টটলের সকল গ্রন্থের অনুবাদ আরবী ভাষার পাঠকদের হাতের নাগালে পৌছে যায়। এটা ছিল এমন এক সময় যখন গ্রীক চিন্তাধারা ও বিজ্ঞান সম্পর্কে ইউরোপ ছিল সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞ। পরবর্তীকালে ইবনে সীনা (Avecenna) এবং ইবনে রুশদ (Averros)-এর মাধ্যমে প্লেটো ও এ্যারিস্টটলের মতবাদ ল্যাটিন ভাষায় নিজস্ব পথ খুঁজে পায় এবং মধ্যযুগীয় ইউরোপের চিন্তাজগতে গভীর প্রভাব রাখতে সক্ষম হয়।

হিট্টি বলেছেন, দশম শতকের শেষদিকে আরবী ভাষা বিজ্ঞান চিন্তার সহজ প্রকাশ এবং দর্শন চিন্তাকে ফুটিয়ে তোলার ক্ষেত্রে অসাধারণ ও অভূতপূর্ব মাধ্যমে পরিণত হয়। এ সময়ে ভূগোল ছিল বিজ্ঞানের গুরুত্বপূর্ণ ও বিভিন্নমুখী শাখার একটি অন্যতম শাখা, যেখানে একই সময়ে মৌলিক লেখাসমূহের আবির্ভাব হতে থাকে। টলেমীর ভূগোল সরাসরি আরবী অথবা প্রাচীন সিরীয় ভাষায় বহুবার অনূদিত হয়।

খ্রিস্টীয় নবম ও দশম শতাব্দীকে বলা হয় চিরায়ত (classical) মুসলিম ভূগোলের উৎকর্ষের যুগ। তবে এভাবে বলা হলে এক্ষেত্রে মুসলিম অবদানকে কিছুটা খাটো করে দেখা হয়। এই সময়সীমার আগে এবং পরে মুসলমান ভূগোলবিদগণ লক্ষ্যযোগ্য ধারায় বহু অবদান রেখেছেন। বস্তুত ভূগোলের প্রতি মুসলমানদের বিশেষ আগ্রহ ও আকর্ষণের পিছনে প্রধান কারণ ছিল ইসলাম-পূর্ব যুগের আরবী কবিতা, আরবদেশের প্রাকৃতিক দৃশ্যপট, স্থলপথে তাদের প্রচুর ভ্রমণ, সমুদ্র পাড়ি দেয়ার অভিজ্ঞতা এবং স্বচ্ছ আকাশে গ্রহ ও নক্ষত্রপুঞ্জ পর্যবেক্ষণের অবারিত সুযোগ। ইসলামের আবির্ভাবের পর পবিত্র কুরআনে এ প্রসঙ্গে বহুবার আলোকপাত করা, হজ্জকে ধর্মীয় ও প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়া, মুসলিম রাজ্যসমূহের বিস্তার লাভ, প্রশাসনিক প্রয়োজন এবং ব্যবসায়-বাণিজ্যের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে এ বিষয়টি আরো অধিক গুরুত্ব লাভ করে। গ্রীক ও অন্যান্য উৎস থেকে মূল্যবান জ্ঞানভাণ্ডারের সন্ধান লাভ করা, সেগুলোকে বায়তুল হিকমাহ-এর মাধ্যমে অনুবাদ ও ব্যাখ্যার ব্যবস্থা করা, সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে সমন্বয়

www.waytojannah.com

Contents

প্রক্রিয়ার পূর্ণতা লাভ, জ্ঞান ও বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ সাধনের মাধ্যমে এই প্রচেষ্টা আরো জোরদার হয়।

ভূগোল বিষয়ে প্রাথমিক যুগে সর্বপ্রথম গ্রন্থ রচনা করেন হিশাম বিন মুহাম্মদ আল কালবী। তিনি ৮২০ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন। যদিও তিনি মূলত একজন ইতিহাসবিদ হিসেবে ইসলাম-পূর্ব যুগের ইতিহাস চর্চায় আগ্রহী ছিলেন, তথাপি তিনি তাঁর গ্রন্থে যে সকল ভূগোল বিষয়ক তথ্য পরিবেশন করেছেন সেগুলোই হচ্ছে এ ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম পদচারণা। অন্যান্য যাঁরা বিদ্যমান সুযোগ-সুবিধাগুলো নিয়ে অগ্রসর হন, বিশেষত গ্রীক ও অন্যান্য উৎস থেকে প্রাপ্ত জ্ঞানভাণ্ডারকে আত্মীকরণের উদ্যোগ নেন, তাঁরা হলেন মূসা আল খাওয়ারিযমী, আবূ ইউসুফ ইয়াকুব আল কিন্দি, ইবন খুরদাযবিহ এবং আররাম বিন আল আসবাজ।

সাধারণ ভৌগোলিক তথ্যাবলীর সমাবেশ ঘটিয়ে নাদার বিন শুমাইল (জ. ৭৪০ খ্রিস্টাব্দ) 'কিতাবুস সিফাত' নামে একখানা আকর্ষণীয় কিতাব রচনা করেন। এই গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত বিষয়াবলী ছিল প্রধানত ভূগোল বিষয়ক, যেমন এতে রয়েছে জলবায়ু, বাতাস, বৃষ্টি, রোদ, বিভিন্ন প্রকার পানীয় এবং শব বস্ত্র ইত্যাদি শিরোনামের অধ্যায়সমূহ।

মূসা আল খাওয়ারিযমী (মৃত্যু ৮৩৫ খ্রিস্টাব্দ) একখানা অসাধারণ ভূগোল গ্রন্থ রচনা করেন। খ্রিস্টীয় নবম শতাব্দীর প্রথমার্ধে রচিত এই গ্রন্থের নাম ছিল 'কিতাব সুরাত আল আরদ'। এতে পৃথিবী সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয় আলোচনা করা হয়েছে। তিনি খলীফা আল মামুন এবং আল মুতাসিম কর্তৃক ভূগোলকের আকার ও পরিমাপ বিশেষজ্ঞ এবং ভূগোলবিদদের নিয়ে গঠিত কমিশনের নেতৃস্থানীয় সদস্য ছিলেন। তাদমুরের সমতল অঞ্চলে গঠিত এই কমিশনের উদ্দেশ্য ছিল পৃথিবীর পরিমাপ করা। এ ছাড়া তিনি পৃথিবীর মানচিত্র অংকনের সাথেও সম্পৃক্ত ছিলেন। দুর্ভাগ্যবশত সেই মানচিত্র এখন আর পাওয়া যায় না।

এর কিছুকাল পরে ভৌগোলিক বিষয়াবলীর প্রতি আগ্রহী স্বল্প কিছু সংখ্যক গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। আবূ ইউসুফ ইয়াকুব আল কিন্দি (মৃত্যু ৮৭৩) তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'রসমুল মামুর মিনাল আরদ' (পৃথিবীর বসতি এলাকা) রচনা করেন। পরবর্তীকালে তাঁর ছাত্র আহমদ বিন মুহাম্মদ আল সারাখসী (মৃত্যু ৮৯৯) 'কিতাবুল মাসালিক ওয়াল মামালিক' (চলাচলের পথ ও রাজ্যসমূহ) নামে একখানা কিতাব রচনা করেন। উক্ত কিতাব তুলনামূলকভাবে অধিক ভৌগোলিক আলোচনায় সমৃদ্ধ। খোরাসানের বাসিন্দা হলেও বাগদাদে অবস্থানকালে তিনি এই কিতাব রচনা করেন। এই শতাব্দীর শেষ দিকে টলেমীর গ্রন্থ অনুবাদ করার কৃতিত্ব অর্জন করেন

www.waytojannah.com

সাবিত বিন কুররাহ। প্রধান প্রধান মুসলিম ভূগোলবিদগণের মধ্যে আবুল কাসিম বিন খুরদাযবিহ্ বর্ণনামূলক ভূগোল রচয়িতা হিসেবে শীর্ষস্থানে রয়েছেন। তিনি ৮৪৪ থেকে ৮৪৮ খ্রিস্টাব্দ সময়ের মধ্যে অঞ্চলভিত্তিক বিবরণ সমৃদ্ধ তাঁর নন্দিত গ্রন্থ 'কিতাবুল মাসালিক ওয়াল মামালিক' রচনা করেন। জিবাল প্রদেশের প্রধান পোস্ট মাস্টার হিসেবে চীন, জাপান ও কোরিয়াসহ বিভিন্ন দূরবর্তী অঞ্চলের বিপুল পরিমাণ তথ্যের সাথে পরিচিত হওয়ার সুযোগ লাভ করেন। এই গ্রন্থে আরব বিশ্বের প্রধান প্রধান বাণিজ্যপথগুলোর সারসংক্ষেপ অন্তর্ভুক্ত আছে। পরবর্তীকালে এই গ্রন্থ আরব ভূগোলবিদগণের জন্য সুপরিচিত উৎস গ্রন্থ হিসেবে বিবেচিত হয়।

www.waytojannah.com

তৃতীয় অধ্যায়

নবম ও দশম শতাব্দীর ভূগোল বিজ্ঞানীদের অবদান এবং তাদের উত্তরসুরিগণ

খ্রিস্ট পরবর্তী নবম শতাব্দীর প্রথম ভাগ থেকে একাদশ শতাব্দীর প্রথম চতুর্থাংশ পর্যন্ত দুইশত বছরকে বলা হয় মুসলিম ভূগোল বিজ্ঞানীদের চরম উৎকর্ষের সময়। এই পর্যায় শুরু হয়েছিল বাগদাদে অবস্থিত বায়তুল হিকমা-এর অনুবাদ কর্মকাণ্ড পূর্ণরূপে বিকাশের ফলে। ইসলামী জগতের পূর্ব ও পশ্চিম এই উভয় অংশে বুদ্ধিবৃত্তিক অগ্রগতির মাধ্যমে এই উৎকর্ষ সাধিত হয়। অগ্রগতির এই বিবর্ধন সাধিত হয়েছিল গাণিতিক ভূগোল থেকে শুরু করে সাধারণ ভৌগোলিক বিবরণ, আবিষ্কার, অভিযান, ভ্রমণ বিবরণী, ভূগোল আলোচনায় প্রাকৃতিক ও বস্তুগত উপাদানের অন্তর্ভুক্তি ও জৈব ভূগোলসহ সর্বক্ষেত্রে।

গাণিতিক ভূগোল

এই সময়ে গাণিতিক ভূগোলে মুসলমানদের অবদান সম্পর্কিত আলোচনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, নতুন নতুন জ্ঞানের প্রসার এবং অধিকতর নির্ভুল পর্যবেক্ষণ-লব্ধ জ্ঞানের সাহায্যে টলেমী ও তাঁর আলমাজেস্ট-এর ভূগোল তত্ত্বের প্রধান প্রধান উপাদান পুনঃ পরীক্ষা করা হয় এবং এগুলোর প্রচুর উন্নতি সাধন করা হয়। তাঁরা 'অয়ন-চলন' (Precesion of equinoxes) হিসাবের সংশোধন করেন, যদিও আরবরা মূলত অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমাংশের হিসাব করেছিলেন গ্রীক নিয়মে। ধরে নেয়া হয়েছিল যে বাস্তবে মধ্যাহ্ন রেখা ক্যানারী দীপপুঞ্জের (ভাগ্য দ্বীপ) উপর দিয়ে অতিক্রম করেছে এবং এক ডিগ্রি দ্রাঘিমাংশ সমান হিসাব করা হয়েছে চার মিনিট। সাধারণত চন্দ্রগ্রহণের সময়কে দ্রাঘিমাংশ নির্ণয় করা ও সংশোধন করার কাজে ব্যবহার করা হতো। মুসলিম রাজ্যসমূহের অন্তর্গত বিভিন্ন এলাকায় চন্দ্রগ্রহণ দেখা যাওয়ার সময়ের ভিত্তিতে অবস্থানসমূহ নির্ধারণ করা হতো। আরো কিছু অতিরিক্ত স্থানের অক্ষাংশ ও

www.waytojannah.com

দ্রাঘিমাংশ নির্ণয় করা হয়েছে এবং এ ক্ষেত্রে গ্রীকদের কিছু কিছু ভুল সংশোধন করা হয়েছে। এর ফলে প্রকৃত হিসাবের একেবারে কাছাকাছি অবস্থায় পৌঁছা সম্ভব হয়।

খলীফা আল মামুনের সময়ে ভূগোলকের আকার ও পরিমাপ বিশেষজ্ঞ এবং ভূগোল বিজ্ঞানীদের সমন্বয়ে সিনজার এবং আল রাক্কায় অবস্থিত সমভূমিতে একটি গবেষণা কেন্দ্র স্থাপিত হয়। এই গবেষক দলের অসাধারণ কীর্তি ছিল এক ডিগ্রির প্রকৃত পরিমাপ নির্ণয় করা। তাঁরা সরেজমিনে এই পরিমাপ গ্রহণ করেন। এক ডিগ্রি সমান ৫৬২/৩ মাইল স্থির করা হয় এবং এর ভিত্তিতে পৃথিবীর পরিধি নির্ণীত হয় ২৫০০৯ মাইল। এই হিসাব প্রকৃত পরিমাপের চাইতে সামান্য পরিমাণ বেশী। পৃথিবীর ব্যাসার্ধ এবং ব্যাস পরিমাপের একক উপরোক্ত নীতি অনুসারেই হিসাব করা হয়েছিল। গাণিতিক ভূগোলে আরবদের কীর্তিসমূহের মধ্যে একটি বিরাট অংশ ছিল জ্যোতির্বিদ্যার সাধারণ ক্ষেত্রে। এ ছাড়া ছিল ভূগোলকের আকার ও পরিমাপ সম্পর্কিত বিষয় তথা পৃথিবীর আকার, আকৃতি ও গঠন সম্পর্কিত বিষয়াবলী। নিম্নে তাঁদের রচিত এরূপ কিছু গ্রন্থের উদাহরণ উপস্থাপিত হলোঃ

মুহাম্মদ বিন মূসা আল খাওয়ারিযমী (মৃত্যু ৮৩৫ খ্রিস্টাব্দ) ছিলেন একজন অত্যন্ত যোগ্য জ্যোতির্বিজ্ঞানী। তাঁর রচিত বিখ্যাত গ্রন্থ 'কিতাব সুরাতুল আরদ' হচ্ছে বিভিন্ন স্থানের অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমাংশের অবস্থান সম্পর্কিত তথ্যাবলীর একটি খনি বিশ্বকোষ। অবস্থান নির্ণয় করা ছাড়াও তিনি গ্রীকদের ধারণা অনুসারে পৃথিবীর সাতটি আবহাওয়া অঞ্চলের ব্যাপ্তি এবং পৃথিবীতে বসতিযোগ্য অঞ্চলসমূহের সীমানা সম্পর্কিত বিষয়ে গবেষণা করেছেন। তিনি ভারতীয় গণিতবিদগণ সম্পর্কে এবং তাদের প্রণীত 'আর্যভট্ট' ও 'সিদ্ধান্ত' নামক গ্রন্থাদি সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। ধারণা করা হয় যে খাওয়ারিযমী এ্যাস্ট্রোল্যাব (Astrolabe) সম্পর্কেও জানতেন এবং এ বিষয়ে একখানা গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। তাঁর এ সকল গবেষণা কর্ম ও গ্রন্থাবলী ছিল ভূগোল-চিন্তার জগতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান। আল ফারঘানী (৮৩১-৮৬১ খ্রিস্টাব্দ) জ্যোতির্বিদ্যা বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করেছেন। তিনি আবহাওয়া অঞ্চলের ভিত্তিতে পৃথিবী সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন। এ ছাড়া তিনি এ্যাস্ট্রোল্যাব (Astrolabe) ও সূর্যঘড়ি (রুখামাত) সম্পর্কেও গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। মজার ব্যাপার হলো আল ফারঘানীর লেখার সাথে ইউরোপীয় রেনেসাঁর প্রথম দিককার লেখাসমূহ এবং রজার বেকনের লেখা 'Opus Majus' এর মিল খুঁজে পাওয়া যায়।

একই সময়ের দু'জন জ্যোতির্বিজ্ঞানী ও ভূগোলবিদের কথা আমরা জানি। তাঁরা হলেন সুপরিচিত দার্শনিক ইউসুফ আল কিন্দি (৮৩১-৮৭০ খ্রিস্টাব্দ) এবং উচ্চতর গাণিতিক ভূগোলে বিশেষ অবদান সৃষ্টিকারী আবূ মাশার (মৃত্যু ৮৮৬)। আল কিন্দি

www.waytojannah.com

বিভিন্ন বিষয়ে প্রচুর গ্রন্থ রচনা করেছেন। কিন্তু ভূগোল বিজ্ঞানে তাঁর প্রধান প্রধান কীর্তি সম্পর্কে ইবনুল নাদিম ও আল মাসউদী তাঁদের রচিত বিশ্বনন্দিত গ্রন্থাবলীতে উল্লেখ করেছেন। আবূ মাশার আরব সাগর ও ভারত মহাসাগরের কিছু মৌসুমী বায়ু সম্পর্কিত জ্ঞান উপস্থাপন করেছেন। তিনি মহাসাগরীয় স্রোতধারা ও জোয়ার সম্পর্কে গ্রন্থ রচনা করেছেন। অনুমিত হয় যে তাঁর এ সকল ধারণা ও জ্ঞান সম্পর্কে অক্সফোর্ডে রজার বেকন ও তার সঙ্গীরা অবহিত ছিলেন। আবি মনসুর এবং আল মারভাযীও জ্ঞানের এই শাখায় উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছিলেন। এই কালকে তাত্ত্বিক এবং গাণিতিক ভূগোলের প্রয়োগ-এই উভয় দিক থেকে বিশেষভাবে চিহ্নিত করা যায়। ভূগোলকের পরিমাপ বিষয়ক বিদ্যা ও খলীফা আল মামুনের 'সুরাতুল মামুনীয়া (বর্তমানে পাওয়া যায় না) নামে সুপরিচিত পৃথিবীর মানচিত্র অংকন কর্মসূচীর বিবেচনায় এটা ছিল অত্যন্ত ফলপ্রসূ সময়।

সাধারণ ভূগোল গ্রন্থাবলী

তৎকালীন বিখ্যাত লেখকগণের মধ্যে ভূগোল-এর প্রতি আগ্রহ এতই ব্যাপক রূপ ধারণ করেছিল যে, নবম ও দশম শতাব্দীর বহু লেখক তাঁদের পরবর্তী প্রজন্মের জন্য অসংখ্য গ্রন্থ রচনা করে গিয়েছেন। এ সকল চিন্তাবিদ ও গবেষকগণ জ্ঞানের রাজ্যে বহুমুখী অবদান রেখেছেন। আর তাঁদের অনেকেরই বিশেষ আগ্রহ ছিল ভূগোলে। তন্মধ্যে বেশ কিছু গ্রন্থ অবশ্য হারিয়ে গেছে। কিন্তু এ সকল গ্রন্থ সম্পর্কে পরবর্তীকালে রচিত গবেষণা সমৃদ্ধ গ্রন্থাবলী যেমন ইবনুল নাদিম-এর 'ফিহরিস্ত', আল জায়হানী, আবুল ফিদা এবং ইয়াকুত হামাভী রচিত গ্রন্থাবলীতে উল্লেখ পাওয়া যায়।

কিছু উল্লেখযোগ্য ভূগোল গ্রন্থ

ইবনে রুসতাহ কয়েকটি খণ্ডে সমাপ্ত একখানা বিশ্বকোষ রচনা করেন। তিনি এর নাম দিয়েছিলেন 'আল আলাক আল নাফিসা'। এই বিশাল বিশ্বকোষের সপ্তম খণ্ডে ভৌগোলিক উপাদান সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা দেয়া হয়েছে। অনুমান করা হয় যে ৯০৩ খ্রিস্টাব্দে ইসফাহানে এই গ্রন্থ রচনা করা হয়েছে। এর বেশীর ভাগ লেখা গাণিতিক জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ক। তবে এতে ইরানের নিকটবর্তী অঞ্চলসমূহের বর্ণনাও রয়েছে। এ ছাড়া পৃথিবীর সীমানা, আকার এবং মক্কা মদীনার অবস্থান এবং এ সম্পর্কিত বর্ণনা এতে স্থান পেয়েছে। বাগদাদ থেকে ইরাকের নিম্নাঞ্চল এবং শিরাজ থেকে খোরাসান পর্যন্ত সড়কপথের বিস্তারিত বিবরণ উপস্থাপন করা ছাড়াও এগুলোর পারস্পরিক দূরত্ব ও অবস্থান সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন এবং বর্ণনা করেছেন সড়কগুলো অতিক্রম করে যাওয়া অঞ্চলের গঠনগত অবস্থা (Relief features)।

www.waytojannah.com

ইবনে রুসতাহ-এর সমসাময়িক আরেকজন পণ্ডিত ছিলেন আল ফকিহ আল হামাদানী। ইরানের এই নামের একই শহরের তিনি বাসিন্দা ছিলেন। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থের নাম কিতাবুল বুলদান (দেশসমূহের কিতাব)। প্রতীয়মান হয় যে ৯০২ খ্রিস্টাব্দে এই গ্রন্থখানি সংকলন করা হয়েছে। এটিকে ইরান ও তৎসংলগ্ন অঞ্চলের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূগোল গ্রন্থ বলা যায়। এর নির্ভরযোগ্যতা পরবর্তীকালে মাসউদী ও ইয়াকুত হামাভী কর্তৃক স্বীকৃত হয়েছে।

হামাদানীর সমসাময়িক একজন পণ্ডিত ছিলেন আল জায়হানী। তিনি ৮৯২-৯০৭ খ্রিস্টাব্দে সামানীয় রাজসভার একজন সম্মানিত সভাসদ ছিলেন। তাঁর রচিত প্রধান গ্রন্থের নাম 'কিতাবুল মাসালিক ফী মারফাতুল মামালিক' (বিভিন্ন দেশ সম্পর্কীয় কিতাব)। জানা যায় এই গ্রন্থ সাত খণ্ডে রচিত হয়েছিল। কিন্তু গ্রন্থখানি হারিয়ে গেছে। তবে ঐ সময়ের প্রধান প্রধান লেখকগণের লেখায় এই গ্রন্থের উল্লেখ পাওয়া যায়। আল মাকদিসি তেমনি একজন লেখক, যিনি বিভিন্ন দেশের সম্পদ, যোগাযোগ ব্যবস্থা, প্রাকৃতিক অবস্থা ও জনগণ সম্পর্কে আলোচ্য গ্রন্থে বিশদ বিবরণ থাকায় এর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন। জায়হানী তাঁর উক্ত গ্রন্থে সিন্ধু উপত্যকা এবং ভারতীয় উপদ্বীপ সম্পর্কেও লিপিবদ্ধ করেছেন।

ইবনে সেরাপিয়ন হচ্ছেন প্রাথমিক যুগের এমনি একজন ভূগোলবিদ, যাঁর সম্পর্কে অদ্যাবধি বিস্তারিত কিছু জানা যায়নি। তিনি ছিলেন মিশরের কপটিক সম্প্রদায়ের লোক। বুওয়াহিদগণ কর্তৃক বাগদাদের নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ (৯৪৫ খ্রিস্টাব্দ) কালে অথবা তার কাছাকাছি সময়ে তাঁর ভূগোল বিষয়ক শ্রেষ্ঠ রচনাবলী লিপিবদ্ধ করেন। তিনি ইরাক এবং মেসোপটেমিয়ার সড়ক এবং খালসমূহ সম্পর্কে আকর্ষণীয় বর্ণনা প্রদান করেছেন। তিনি বাগদাদের অবস্থানগত মর্যাদা সম্পর্কে গুরুত্বারোপ করেছেন এবং সকল এলাকার একটি চার্ট তৈরী করেছেন। কিছু কিছু আধুনিক লেখক ইবনে সেরাপিয়নের লেখা থেকে বহু তথ্য ও উদ্ধৃতি গ্রহণ করেছেন।[২]

আরেকজন আরব অমুসলিম ভূগোলবিদ হলেন আবুল ফারাজ (কুদামাহ বিন জাফর আল খতিব আল বাগদাদী) (মৃত্যু ৯৪৮-৯৪৯ খ্রিস্টাব্দ) তিনি লিখেছিলেন রাজস্ব ব্যবস্থা (কিতাবুল খারাজ) সম্পর্কিত কিতাব। কিন্তু উক্ত কিতাবের শুরুতে কয়েক পৃষ্ঠাব্যাপী ভূমিকায় তিনি স্থানিক বিবরণের (Topographical) বৈশিষ্ট্য সমৃদ্ধ বেশ কিছু ভূগোল বিষয়ক মৌলিক তথ্য উপস্থাপন করেছেন।

জায়হানীর পরপরই প্রসিদ্ধি লাভ করেন শ্রেষ্ঠ ইতিহাস ও ভূগোলবিদ আবুল হাসান আলী বিন হুসাইন আল মাসউদী। তিনি ছিলেন একজন অসাধারণ পণ্ডিত, সাহিত্যিক ও পরিব্রাজক। তিনি জলপথে আরব সাগর, ভারত মহাসাগর ও চীন সাগর পাড়ি দিয়েছিলেন। স্থলভাগেও তিনি ভ্রমণ করেছেন। ভারতীয় উপমহাদেশের পাঞ্জাব,

www.waytojannah.com

সিন্ধু, মাকরান উপকূল, উত্তরভারত ও তৎসংলগ্ন দ্বীপসমূহ ভ্রমণের পর শ্রীলংকা, জাঞ্জিবার ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন এলাকা সফর করেন। এরপর তিনি কাস্পিয়ান সাগরের উপকূল ধরে পূর্বমূখী অগ্রসর হন এবং এ পথে প্যালেস্টাইন, সিরিয়া এবং এশিয়া মাইনর সফর করেন। তিনি সর্বশেষ সফর করেছিলেন মিশর অভিমুখে এবং হিজরী ৩৪৫/৯৫৬ খ্রিস্টাব্দে ফুসতাত-এ মৃত্যুবরণ করেন। মধ্যযুগীয় ভূগোলশাস্ত্রে মাসউদী একটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। তা হলো তিনি তাঁর পূর্ববর্তী প্রধান প্রধান ভূগোলবিদের রচিত গ্রন্থাবলী গভীরভাবে পর্যালোচনা করেছেন এবং তাঁর লেখায় বর্তমানে হারিয়ে যাওয়া বেশ কিছু সংখ্যক পাণ্ডুলিপি ও লেখকের উদ্ধৃতি প্রদান করেছেন। মূলত পরিবেশগত উপাদানের উপর তাঁর হৃদয়স্পর্শী পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণসমূহ উপস্থাপিত হয়েছে ব্যাপক ভ্রমণের ফলে অর্জিত তাঁর গভীর জ্ঞানের ভিত্তিতে। তাঁর রচিত প্রধান কিতাব 'স্বর্ণের তৃণভূমি ও মূল্যবান পাথরের খনি' (মুরুজ আয যাহাব ওয়া মা'আদিন আল জাওয়াহির) একখানা চিরন্তনী বিশ্বকোষ। এর ভাষাশৈলী শাশ্বত আরবী সাহিত্যের নমুনা। সৌভাগ্যবশত এই মূল্যবান গ্রন্থখানি ধ্বংস থেকে রক্ষা পেয়েছে। মাসউদী তাঁর রচিত আরেকখানা গ্রন্থে (কিতাবুত তানবিহ ওয়াল ইশরাক) বিবর্তন প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে ভূতাত্ত্বিক গঠন, ভূমিকম্প, লোহিত সাগরের প্রকৃতি ইত্যাদি বিষয়ের অবতারণা করেছেন। এ ছাড়া তিনি সিজিস্তান ও মাকরান উপকূলে ব্যবহৃত উইন্ডমিলের কার্যকারিতা সম্পর্কেও বর্ণনা করেছেন। ১৯৫৮ সালে ভারতের আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় মাসউদীর অবদানের উপর জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।

আল হাইক (মৃত্যু ৯৪৫ খ্রিস্টাব্দ) ছিলেন ইয়েমেনে জন্ম গ্রহণকারী একজন ভূগোলবিদ, যিনি আরবদেশের ভূগোলের উপর (কিতাব জাযিরাতুল আরব) একখানা উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ রচনা করেন। উক্ত গ্রন্থে ভূগোল বিজ্ঞানের ভৌত উপাদান ও জৈব ভূগোল এই উভয় বিষয়ে আলোচনা ছাড়াও মানব জাতি এবং যোগাযোগ ব্যবস্থা সম্পর্কিত বিষয়াদি অন্তর্ভুক্ত করেন। তিনি একই গ্রন্থে আরব অঞ্চল বিশেষ করে ইয়েমেনের প্রাচীন ইতিহাসের উপর তাঁর নিজস্ব প্রত্নতাত্ত্বিক পর্যবেক্ষণের উপর ভিত্তি করে বেশ কৌতূহল উদ্দীপক আলোচনা সংযোজন করেছেন।

এর কিছুকাল আগে ইয়াকুবি (ওয়াদেহ আল আব্বাসী) ৮৯১ খ্রিস্টাব্দে ভূগোল বিজ্ঞানের শ্রেষ্ঠ নির্যাস 'দেশসমূহের কিতাব' (কিতাবুল বুলদান) রচনা করেন। এই বিখ্যাত গ্রন্থখানি রচিত হয়েছে গেজেটিয়ার এবং বিশ্বকোষ-এর মিশ্র পদ্ধতিতে। তিনি বিস্তর ভ্রমণ করেছেন। তাঁর ভ্রমণকৃত এলাকার মধ্যে রয়েছে ভারত, উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকা এবং খোরাসান ও তৎপার্শ্ববর্তী এলাকা। তাঁর এই বিখ্যাত গ্রন্থে রয়েছে

www.waytojannah.com

ভূগোল বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয় যেমন অঞ্চলভিত্তিক বর্ণনা, ভূগোলের ভৌত ও পরিবেশগত উপাদানের অনন্য সাধারণ বর্ণনা। তিনি এতে স্থানিক বিবরণ (Topography) ও পরিসংখ্যান ভিত্তিক অসংখ্য ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। ইরানের সাথে যোগাযোগ ব্যবস্থার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ ছাড়াও বাগদাদ, কুফা এবং সামারা-এর অবস্থান সম্পর্কিত পূর্ণাঙ্গ বিবরণ এতে স্থান পেয়েছে। যদিও ভারত, চীন এবং বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্য সম্পর্কিত কিছু অধ্যায় বর্তমানে হারিয়ে গেছে, তবু যে অংশটুকু এখনো পাওয়া যায় সেগুলো নিঃসন্দেহে খুবই উঁচুমানের ভূগোল বিষয়ক লেখা। ইয়াকুবির অন্যান্য অবদান সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে জানার আগে থেকেই তাঁকে বলা হতো মুসলিম ভূগোলের জনক। মধ্যযুগীয় ভূগোলশাস্ত্রে তাঁর অসাধারণ অবদানের জন্য তিনি প্রশংসার যোগ্য।

আবূ যাইদ হায়ান আল সিরাফি ছিলেন আল মাসউদীর সমসাময়িক একজন লেখক, যিনি 'সিলসিলাত আত তাওয়ারিখ' গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ড রচনা করেছিলেন। এই গ্রন্থে সোলায়মান সওদাগরের ভ্রমণ বিবরণী লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। সোলায়মান সওদাগর ছিলেন পূর্বদিকে অবস্থিত সাগরসমূহ পাড়ি দেয়ায় অভিজ্ঞ একজন পরিব্রাজক। সিরাফি পূর্ববর্তী সফরকারীদের নিকট থেকে পাওয়া ভৌগোলিক তথ্যাবলীকে ধারণ করে তাঁর বর্ণনাকে আরো সমৃদ্ধ করেছেন।

বুজুর্গ ইবনে শাহরিয়ার-এর লেখা দিনপঞ্জি বা ভ্রমণ বিবরণী 'আল রামহুরমুযি' (মৃত্যু ৯১২-৯৫৩) নামে পরিচিত। এতে রয়েছে নৌচালনা সম্পর্কিত অবস্থা, পণ্যের আদান-প্রদান, চীনের উপকূলবর্তী এলাকার আর্থ-সামাজিক অবস্থা, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও পূর্ব আফ্রিকার উপকূলবর্তী অঞ্চলের চমৎকার বর্ণনা।

এ সময়ের আরেকজন ভ্রমণকারী ছিলেন আবু দুলাফ মিসার বিন আল মুহালহিল' (খ্রিস্টীয় দশম শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়)। তিনি সামানীয় রাজসভার একজন কূটনীতিক প্রতিনিধি হিসেবে মধ্য এশিয়া, চীন ও ভারত সফর করেন। তাঁর ভ্রমণ বৃত্তান্ত নিয়ে রচিত গ্রন্থের শিরোনাম রেখেছিলেন 'আজাইব আল বুলদান' (দেশসমূহের কিতাব)। আবু দুলাফ-এর গ্রন্থের বিষয়বস্তু ও পর্যবেক্ষণ ইবনুল নাদিম তাঁর 'ফিহরিস্ত' গ্রন্থে উদ্ধৃত করেছেন এবং অনুসরণ করেছেন। অনুরূপভাবে কাযবিনি এবং ইয়াকুত তাঁদের প্রণীত গ্রন্থ যথাক্রমে 'আছার আল বিলাদ' এবং 'মাউজাম আল বুলদান'-এ উদ্ধৃতি প্রদানসহ তাঁর দেয়া পর্যবেক্ষণ অনুসরণ করেছেন। কম বেশী প্রায় একই পর্যায়ের গ্রন্থ হলো 'ফাদলান'-এর দিনপঞ্জি। তিনি ছিলেন ৯২১ খ্রিস্টাব্দে খলীফা আল মুকতাদির কর্তৃক বাগদাদ থেকে 'ভলগা বুলগার'-এর রাজসভায় প্রেরিত দূত। তিনি তাঁর এই অভিযানকালে পথে যে সকল অঞ্চলের সাথে পরিচিত হয়েছিলেন তার

www.waytojannah.com

বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন, যা ছিল মুসলমানদের নিকট সম্পূর্ণরূপে অজানা। তাঁর লিখিত 'রিসালাহ' (দিনপঞ্জি) থেকে সাহায্য নিয়ে ইয়াকুত রুশ, খাজার এবং বুলগার-এর বিভিন্ন উপজাতির জীবন ও পরিবেশ সম্পর্কে লিপিবদ্ধ করেছেন। সম্প্রতি ইবনে ফাদলান রচিত বেশ কিছু পাণ্ডুলিপি পাওয়া গেছে, যা থেকে তাঁর স্মরণীয় ভ্রমণ কাহিনী সম্পর্কে আরো বিস্তারিতভাবে আলোকপাত সম্ভব হবে।

দশম শতাব্দীর কাছাকাছি সময়ে গুজগানান (আফগানিস্তান) থেকে ফারসী ভাষায় একজন অজ্ঞাতনামা লেখক বিশ্বের ভৌগোলিক অবস্থা সম্পর্কে (হুদুদ আল আনম) একখানা কিতাব লিখেছিলেন। এই গ্রন্থখানা ১৮৯২ সালে সমরকন্দের নিকটবর্তী স্থানে আবিষ্কৃত হয় এবং ১৯৩৭ সালে লণ্ডন থেকে মিনরস্কী এটিকে অনুবাদ ও সম্পাদনা করে প্রকাশ করেন। এই গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থে চীন, তিব্বত, তুর্কীস্তান, ভলগার নিম্নাঞ্চল, ককেশাস অঞ্চল, ভারত, স্পেন এবং পূর্ব ইউরোপের কিছু কিছু অংশের ভৌগোলিক বিবরণ প্রদান করা হয়েছে। এতে আফগানিস্তান ও তার নিকটবর্তী এলাকার বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। মিনরস্কীর মতে সম্ভবত পাণ্ডুলিপির সাথে অপরিহার্য অংশ হিসেবে একখানা মানচিত্র সংযুক্ত ছিল (যা এখন আর নেই)। কারণ লেখক তাঁর গ্রন্থে বারবার এই মানচিত্রের প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছেন।[৩] এই গ্রন্থে বর্ণিত তথ্যের উৎস থেকে পরবর্তীকালে খুরদাযবিহ, বলখী ও ইসতাখরী উদ্ধৃতি প্রদান করেছেন। মুহাল্লাবী ৯৮৫ খ্রিস্টাব্দে সুদান সম্পর্কে গ্রন্থ রচনা করেন। পরে ইয়াকুত হামাভীসহ অন্যান্য লেখক আফ্রিকার উপর গ্রন্থ প্রণয়নকালে উক্ত গ্রন্থের সাহায্য গ্রহণ করেন।

আবূ যাইদ আহমদ বিন সাহল আল বলখী ভূগোল বিষয়ে লিখনের জন্য একটি বিশেষ পদ্ধতির প্রবর্তন করেন। এই পদ্ধতি ছিল বিশেষ করে মানচিত্র অংকনের উপর নির্ভরশীল। এ কারণে তিনি তাঁর গ্রন্থের নাম দিয়েছিলেন 'কিতাবুল আশকাল বা সুয়ার আল আকলিম' (আবহাওয়ার চিত্র)। তাঁর নিজের অংকিত চিত্রাবলী সহযোগে রচিত (৯২১ খ্রিস্টাব্দ) গ্রন্থ এখন আর পাওয়া যায় না। কিন্তু নব প্রবর্তিত এই পদ্ধতি তাঁর উত্তরসুরিগণ যেমন ইবনে হায়কল, আল ইসতাখরী এবং আল মাকদিসি কর্তৃক অনুসৃত হয়েছিল। কখনো কখনো এই শ্রেণীর লেখাকে বলখীর ভৌগোলিক চিন্তাধারা (Balkhi School of Geography) নামে অভিহিত করা হয়। বলখী অঞ্চলভিত্তিক যে শ্রেণীবিভাগ রচনা করেছিলেন তা কিন্তু আবহাওয়ার ভিত্তিতে ছিল না। বরং তিনি ভৌগোলিক ও রাজনৈতিক অঞ্চলের ভিত্তিতে এই শ্রেণীবিভাগ করেছিলেন। আল বলখী চলাচলের পথ ও রাজ্যসমূহের উপরও গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। তিনি ৯৩৪ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন।

www.waytojannah.com

আল ইসতাখরী, ইবনে হায়কল এবং আল মাকদিসি প্রণীত মানচিত্রসমূহে আল বলখীর মানচিত্র অংকন পদ্ধতির (Cartography) সাযুজ্য খুঁজে পাওয়া যায়। আল ইসতাখরী ৯৫১ খ্রিস্টাব্দে অথবা তার কিছু পরে মৃত্যুবরণ করেন। কারণ, জানা যায় যে ৯৫১ খ্রিস্টাব্দে ইবনে হায়কলের সাথে তাঁর সাক্ষাত হয়েছিল। যদিও ইসতাখরী প্রণীত মানচিত্রে আল বলখীর সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া গেছে তথাপি ইসতাখরীর মানচিত্রে উপস্থাপিত ভৌগোলিক উপাদানসমূহের বিবেচনায় পূর্বসূরীদের তুলনায় এতে শ্রেষ্ঠত্ব লক্ষ্য করা গেছে এবং তা অন্যদের নিকট আদর্শরূপে পরিগণিত হয়েছে। তাঁর প্রণীত গ্রন্থের নাম 'চলাচলের পথ এবং রাজ্যসমূহ' (কিতাবুল মাসালিক ওয়া মামালিক)।

ইবনে হায়কল ত্রিশ বছর যাবত মুসলিম দুনিয়ার পূর্ব ও পশ্চিম উভয় অংশের বিস্তৃত এলাকা ভ্রমণ করেছিলেন। তিনি তাঁর পূর্বসূরী বহু নেতৃস্থানীয় ভূগোল বিজ্ঞানী রচিত কিতাবাদি অধ্যয়ন করেছিলেন এবং আল ইস্তাখরীর সাথে মানচিত্র ও তাঁর নিকট রক্ষিত বিভিন্ন তথ্য সম্পর্কে ফলপ্রসূ আলোচনা হয়েছিল। অতঃপর তিনি মানচিত্র সম্বলিত তাঁর বিখ্যাত 'চলাচলের পথ ও রাজ্যসমূহ'[৪] শীর্ষক গ্রন্থ রচনা করেন।

আল মাকদিসি আবূ আবদুল্লা মুহাম্মদ বিন আহমদ জেরুযালেমে বসবাস করতেন এবং সেখানেই তাঁর কর্মজীবন অতিবাহিত করেন। বলা যায় তিনি ছিলেন বলখী মতবাদের প্রধান প্রবক্তা। ৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে তিনি বায়তুল মুকাদ্দাস-এ জন্মগ্রহণ করেন এবং সেখানে সুশিক্ষা লাভ করেন। বিশ বছর বয়সে তিনি একজন ভূগোলবিদ হওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন এবং উপলব্ধি করলেন যে ভূগোল বিষয়ে তাৎপর্যপূর্ণ কিছু লিখতে হলে ভ্রমণ এবং পর্যবেক্ষণ খুবই জরুরী। তাই পূর্ব ও পশ্চিমের বিভিন্ন মুসলিম দেশে বিশ বছর যাবত ভ্রমণ শেষে ৯৮৫ খ্রিস্টাব্দে তিনি তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'আহসানুল তাকাসিম ফি মারফাতুল আকালিম' (আবহাওয়া সম্পর্কিত জ্ঞানের সর্বোত্তম শ্রেণীবিভাগ) রচনায় বসলেন। তিনি দাবী করেছেন যে তাঁর লেখায় বিভিন্ন এলাকার মানুষের জীবন, পরিবেশ, আচার-আচরণ ও প্রথা সম্পর্কে অলভাবে জানার জন্য বিভিন্ন প্রকার ভৌগোলিক উপাদান এবং অন্যান্য তথ্য প্রযোজ্য পদ্ধতিতে উপস্থাপন করেছেন।

মাকদিসির রচনাবলীতে বিভিন্ন ইসলামী দেশের ভৌগোলিক ও মানবীয় অবস্থার সাধারণ বর্ণনা উপস্থাপন করা হয়েছে। বিষয় উপস্থাপনায় নিজের পদ্ধতির ব্যাখ্যা তাঁর ভাষাতেই নিম্নে উপস্থাপিত হলোঃ[৫]

'আমি ভাবলাম, যে বিষয়ের প্রতি তাঁরা (বিজ্ঞানী ও লেখকগণ) উপেক্ষা প্রদর্শন করেছেন, জ্ঞানের একটি সুনির্দিষ্ট শাখা হিসেবে বিবেচনা না করে অপূর্ণাঙ্গরূপে বাঁচিয়ে রেখেছেন–ইসলামী সাম্রাজ্যের সেই ভূগোল বিজ্ঞানের প্রতি আমার মনোযোগ দেয়া

www.waytojannah.com

যুক্তিযুক্ত হবে, যাতে থাকবে মরুভূমি ও সাগরসমূহের বর্ণনা, হ্রদ ও নদীর কথা, থাকবে বিখ্যাত নগরী ও গুরুত্বপূর্ণ শহর, রাস্তার পার্শ্বের বিশ্রামস্থল, যোগাযোগের জন্য মহাসড়ক, মসলা ও ঔষধের প্রধান উৎসস্থল, বর্ধিষ্ণু স্থানসমূহ, মুখ্য রফতানীযোগ্য পণ্যের কেন্দ্রস্থল সম্পর্কিত তথ্যাবলী, বিভিন্ন দেশের বাসিন্দাদের ভাষা ও কথা বলার ধরনের বিভিন্নতা সম্পর্কিত বিবরণ..... পাহাড়, সমভূমি, পর্বতসমূহ, চুনাপাথর, বেলে পাথর, ঘন ও কম ঘনত্বের মাটি, উর্বরতা ও সমৃদ্ধির দেশ..... বিভিন্ন রাষ্ট্র ও তাদের সীমান্ত; শীত ও গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চল, পল্লী অঞ্চল ও সীমান্তবর্তী জেলাসমূহসহ ইত্যাদি বিবরণ। সাধারণ শিক্ষার ক্ষেত্রে এই বিষয়ের উপযোগিতা প্রশ্নে আধুনিক ভূগোলবিদের দৃষ্টিভঙ্গির সাথে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির এই সাদৃশ্য সত্যিই বিস্ময়কর। তিনি আরো বলেন, 'আমি বিশ্বাস করি এই বিষয় ভ্রমণকারী এবং ব্যবসায়ীদের জন্য সর্বতোভাবে গুরুত্বপূর্ণ। এটি রাজপুরুষ ও অভিজাত ব্যক্তিদের জন্য কাম্য, বিচারক ও আইনবিদদের জন্য কাঙ্ক্ষিত এবং সাধারণ মানুষ ও উচ্চপদস্থদের জন্য উপযোগ্য।'

দশম শতাব্দীর শেষের কয়েকটি বছরে ভূগোলকে উপজীব্য করে বেশ কিছু সংখ্যক আকর্ষণীয় গ্রন্থ রচিত হয়েছিল। বস্তুত এঁদের মধ্যে কিছু সংখ্যক গ্রন্থকার এমনি ধরনের বক্তব্য সামনে এগিয়ে দিয়েছিলেন, যেগুলো তাঁদের জ্ঞানের ব্যাপ্তির ক্ষেত্রে শুধুমাত্র চিন্তার বহুমুখিতা ও উদ্ভাবনী বৈশিষ্ট্যের প্রকাশ ঘটায়নি, একই সাথে বস্তুগত বিষয়াবলী উপলব্ধি করার ক্ষেত্রেও ভূমিকা রেখেছিলেন। এদের কিছু সংখ্যক ছিল বিশ্বকোষের আঙ্গিকে প্রণীত এবং অন্যগুলো ছিল বিভিন্ন বিষয় ও সমস্যা সম্পর্কিত রচনা।

মুতাহার বিন তাহির রচিত 'কিতাব আল বাদ ওয়াল তারকিখ', আল খাওয়ারিযমী মুহাম্মদ বিন আহমদ রচিত বিখ্যাত 'মাফাতিহ আল উলুম' এবং আবুল ফারাজ আল নাদিম রচিত বিখ্যাত 'আল ফিহরিস্ত' ইত্যাদি ছিল ভিন্ন ধরনের বিশ্বকোষ; আবার ইখওয়ানুস সাফা[৬] (শুদ্ধপন্থী ভ্রাতৃসংঘ)-এর চিন্তা গোষ্ঠির পুস্তক-পুস্তিকা রচয়িতাগণ তাদের রাসাইল-এ ভূগোল বিষয়ে মূল্যবান অবদান রাখেন।

ইখওয়ানুস সাফার ছদ্মনামা লেখকগণ তাঁদের উপস্থাপনায় ছিলেন যুক্তিবাদী এবং ভৌত উপাদান ও বিষয়াবলী যেমনঃ আবহাওয়া বিষয়ক অবস্থা, বৃষ্টি, ঋতু, বায়ুমণ্ডল, ভূতাত্ত্বিক গঠন প্রক্রিয়া, ভূমিক্ষয় ও আবহওয়ার বিশ্লেষণ ইত্যাদি বিষয়ে মুক্ত মনে তাদের ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। এই বিখ্যাত গ্রন্থ প্রণেতাগণ[৭] উদ্ভিদ, প্রাণীকুলের বসতি-এলাকার বন্টন এবং পরিবেশগত অবস্থার উপর সাধারণ আলোচনাসহ জীব-ভূগোলকে তাদের রচনার উপজীব্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করেন। কিছু কিছু পণ্ডিত মনে করতেন যে ইখওয়ানুস সাফা কর্তৃক তাঁদের বিজ্ঞান চিন্তাকে প্রণীত বিশ্বকোষসমূহে সুসমন্বিত রূপে তুলে ধরার জন্য সেটা ছিল সুবিধাজনক সময়। এর অল্প কিছুকাল

www.waytojannah.com

পরেই বিজ্ঞান চিন্তাকে মুক্ত মনে উপস্থাপনের ক্ষেত্রে গোঁড়া পন্থীদের দ্বারা প্রবল বাধার সম্মুখীন হতে হয়। তারও আগে বসরার জাহিয [৮] (মৃত্যু ৮৬৮ খ্রিস্টাব্দ) প্রাকৃতিক ও নৃতাত্ত্বিক বিজ্ঞানের প্রতি সুস্পষ্ট আগ্রহ তুলে ধরেন। তিনি তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'কিতাবুল হায়ওয়ান' (পশু সম্পর্কিত কিতাব) ও পশুদের জীবন সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন এবং প্রাণীজগতে বিবর্তন, তাদের বেঁচে থাকার লড়াই ও পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে নেয়ার প্রসঙ্গও তাঁর আলোচনায় অন্তর্ভুক্ত করেন। আল ফারাবী (মৃত্যু ৯৫০ খ্রিস্টাব্দ) নগর জীবনের অবস্থা সম্পর্কে একটি সুন্দর সমাজতাত্ত্বিক সমীক্ষা করেন এবং তাঁর প্রণীত 'আল মদীনাতুল ফাদিলাহ' (আদর্শ নগরী) গ্রন্থে ভবিষ্যতের জন্য একটি যুক্তিসঙ্গত নগর পরিকল্পনার রূপরেখা প্রদান করেন।

এ সময়ের ভৌত ভূগোল বিষয়ক আরেকটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হচ্ছে 'কিতাব ইনবাত আল মিয়াহ আল খিফিয়াহ (Kitab Inbat al Miyah al-Khifiya-একখানা ভূগোল বিষয়ক অভিধান)। গ্রন্থখানি রচনা করেছিলেন আল খারকী (খ্রিস্টীয় দশম শতাব্দীর শেষ দিকে)। এতে পাহাড়-পর্বত, মরুভূমি, ভূ-অভ্যন্তরস্থ পানি, মাটি ও পাথরের প্রকৃতি সম্পর্কিত সমীক্ষা তুলে ধরা হয়েছে।

সারসংক্ষেপ

তথাকথিত চিরায়ত উৎকর্ষের যুগের (Classical period) ভূগোলবিদগণের অবদানকে জ্ঞানের বহুমুখী চর্চা ও মৌলিকত্বের বৈশিষ্ট্য দ্বারা চিহ্নিত করা হয়েছে। তাদের কাছে ভূগোল ছিল জ্ঞানের একটি ক্ষেত্র বিশেষ, যা শুধু বিভিন্ন বস্তুগত বিষয়ের জ্ঞানের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। তারা মানুষের সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবেশের জ্ঞানকেও এর আওতাভুক্ত করেছিলেন। এমনকি যাঁরা মূলত ভূগোলবিজ্ঞানী ছিলেন না, তাঁরাও পৃথিবীর ব্যাপ্তি, এর সম্পদ এবং পরিবর্তনশীল পরিবেশ সম্পর্কে জানতে চেয়েছিলেন। এটা ছিল এমন এক পথ, যে পথ তাদেরকে ভৌত ভূগোল, ভৌত-ভূতত্ত্ব, জীব-ভূগোল, আবহাওয়া বিজ্ঞান, মানবজীবন ও তাদের অর্থনৈতিক অবস্থা এবং আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যসমূহের আলোচনার দিকে টেনে নিয়েছে।

এ সময়ে ভূমির গঠনগত শ্রেণীবিন্যাস এবং এর উৎপত্তি সম্পর্কিত আলোচনা করা হয়েছে। ভ্রমণ ও অনুসন্ধান অভিযানের মাধ্যমে নতুন নতুন ধারণার উদ্ভব হয়েছে এবং ভৌগোলিক তথ্যাবলীর বিস্তৃতি ও বিকাশ ঘটেছে। এ সব বিষয়কে একত্রিত করে তাঁদের সময়ের দুনিয়ার একটি সমন্বিত চিত্র পাওয়া সম্ভব। সুতরাং এ সময়ের ভূগোল বিষয়ক গ্রন্থাবলী ও তৎসংশ্লিষ্ট উপাদানগুলোকে শুধু ইসলামী দুনিয়াকে নয় বরং অমুসলিম দুনিয়াকেও উপলব্ধি করার চাবিকাঠি বলা যেতে পারে। মুসলিম ভূগোল বিজ্ঞানীগণ নিঃসন্দেহে আরব চিন্তাজগতকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করেছিলেন।

www.waytojannah.com

উদাহরণ হিসেবে বলা যায় যে, জীব-ভূগোল চর্চার সাথে যুক্ত ছিলেন আল জাহিয, ইখওয়ানুস সাফা-ভুক্ত লেখকগণ, ইবনে মিসকাবেহ, আল ফারাবী এবং আরো কিছু সংখ্যক লেখক। তাঁরা প্রাণীজগতের শ্রেণীবিন্যাস ও তাদের অঞ্চলভিত্তিক বন্টন, উদ্ভিদের উৎপত্তি ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। তাঁরা বিশ্বাস করতেন যে উদ্ভিদের অঞ্চলভিত্তিক বন্টন–ভূমির স্তর ও মাটির বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তন দ্বারা প্রভাবিত ও রূপান্তরিত হয়। তাঁরা আরো আলোচনা করেছেন যে উদ্ভিদের অঞ্চলভিত্তিক বন্টন আবহাওয়া, জলবায়ু, ভূমির অধঃক্ষেপণ, উন্নয়ন ও মাটির গুণাগুণের উপর নির্ভরশীল। বহু লেখক পানি সরবরাহ, সেচ ব্যবস্থা, তাপমাত্রা ইত্যাদি বিষয়কে উদ্ভিদ ও ফসলের বৃদ্ধির উপর প্রভাব সৃষ্টিকারী নিয়ামক হিসাবে স্বীকৃতি প্রদান করেছেন।

এ সময়ে আরব ভূগোলবিদগণ প্রায়শ পরিবেশের আঙ্গিকে মানব জীবন সম্পর্কে তাঁদের পর্যবেক্ষণ উপস্থাপন করেছেন। তাঁরা জ্যোতিষশাস্ত্রের দ্বারা প্রভাবিত জটিল ও বিভ্রান্তিপূর্ণ প্রচলিত জীবনবোধের স্থলে মানবিক ভূগোলের প্রাথমিক চিন্তার উন্মেষ ঘটান। মাসউদী,১ মাকদিসি এবং ইবনে রুসতাহ-এর মতো ভূগোল বিজ্ঞানীগণ আঞ্চলিক ও স্থানীয় ভৌগোলিক উপাদানের আঙ্গিকে বিষয়টিকে মানবীয় বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন এবং মানুষের সাধ্যসীমার আওতাধীন বিষয় হিসেবে উপস্থাপন করেন। তাঁদের এ সকল তত্ত্ব ভৌত পরিবেশ থেকে শুরু করে মানুষের ইতিহাস ও ঐতিহ্যের উপর প্রভাব রাখতে সক্ষম হয়।

মজার ব্যাপার হলো মাসউদী এবং পরবর্তীকালে ইবনে সাইদ-এর মতো লেখকগণ মনে করতেন যে মানুষের জীবনে অগ্রগতি, বুদ্ধিমত্তা এবং পৌরুষ ইত্যাদি নাতিশীতোষ্ণ আবহাওয়ার পর্যাপ্ত তাপ ও সূর্যের আলোর সাথে সম্পর্কিত। অপরদিকে অলসতা, উদ্যোগহীনতা, মনের জড়তা ইত্যাদি ঠাণ্ডা আবহাওয়া ও আর্দ্র পরিবেশের সাথে সম্পর্কিত। অবশ্য এই তত্ত্ব মানবিক ও সাংস্কৃতিক বিষয়ে কিছু সংখ্যক আধুনিক বৈজ্ঞানিক ধারণার সম্পূর্ণ পরিপন্থী। যাই হোক, আরব ভূগোল বিজ্ঞানীদের দ্বারা উত্থাপিত কিছু কিছু বিতর্ক তাদের মৌলিক তত্ত্বের কারণেই আকর্ষণীয় ছিল। কয়েকটি প্রজন্মের ধারাবাহিক প্রক্রিয়ায় এ ধরনের চিন্তাধারা ইবনে খালদূনের চিন্তাধারার মাধ্যমে নিজস্ব চেহারা পেতে সক্ষম হয়। ইবনে খালদূন পরবর্তীকালে সমাজবিজ্ঞান এবং মানবীয় ভূগোলের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেন।

খ্রিস্টীয় নবম ও দশম শতাব্দীতে আরব পরিব্রাজকদেরকে অনুসন্ধান ও আবিষ্কারের উদ্দেশ্যে ব্যাপক ভ্রমণ করতে দেখা গেছে। এগুলোর বেশীর ভাগই ছিল নেহায়েত জ্ঞান অনুসন্ধানের উদ্দেশ্যে অথবা পার্থিব লাভের আশায় কিংবা হজ্জ এবং সরকারী দায়িত্ব পালনের নিমিত্ত। মধ্যযুগের প্রথম ভাগে খ্রিস্টান ও অন্যদের তীর্থস্থানে ধর্মীয়

www.waytojannah.com

সফরের চাইতে এই সফরগুলো ছিল ভিন্ন প্রকৃতির। এ সময়ের উল্লেখযোগ্য মুসলিম পরিব্রাজকগণের কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে (ইবনে ফাদলান, সুলায়মান, বুজুর্গ ইবনে শাহরিয়ার, ইসতাখরী, ইবনে হায়কল, মাকদিসি এবং অন্য অনেকে) মুসলমানদের কাছে নিজ ধর্মবিশ্বাসের প্রচার করা এবং মক্কায় হজ্জ পালন করা গুরুত্বপূর্ণ কাজ। কিন্তু ব্যবসায়-বাণিজ্যের জন্য অজানা স্থান আবিষ্কার করা এবং বিভিন্ন সংস্কৃতির মানুষের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করা কোন অংশে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়।

এ সময়ে আঞ্চলিক ভিত্তিতে এমন কি অমুসলিম দেশে স্থলপথে ভ্রমণ করা এবং সাগরপথে দীর্ঘ পথ পাড়ি দেয়া একটা সাধারণ চিত্রে পরিণত হয়। বস্তুত ভৌগোলিক জ্ঞানের বেশির ভাগ প্রসার ঘটেছিল সকল চেনা এবং স্বল্প চেনা সাগর-মহাসাগরে, যেমন ভূমধ্যসাগর, আরব সাগর, ভারত মহাসাগর, চীন সাগর, আটলান্টিক ও প্রশান্ত মহাসাগরের অংশ বিশেষ পাড়ি দেয়ার মাধ্যমে। এ সময়ে বিশ্বের বিভিন্ন সাগরের সাথে আন্তঃসংযোগ সম্পর্কিত ধারণারও ব্যাখ্যা করা হয়। অবশ্য এই প্রাথমিক অবস্থায়ও আরবরা আরো ব্যাপক নৌ-অভিযানের সম্ভাবনা অনুমান করেছিল। সম্ভবত উত্তমাশা অন্তরীপ ঘুরে আসা, জাপান ও মাদাগাস্কারের পথে পাড়ি দেয়ার মাধ্যমে তাঁরা এই সম্ভাবনা দেখতে পেয়েছিলেন। কোন বাস্তব প্রমাণ ছাড়াই কেউ কেউ এমনও আশা করেছেন যে আরবদের পক্ষে অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড এবং আমেরিকা আবিষ্কার করা সম্ভব হতো।

ইবনে হায়কল, আল মাকদিসি, মাসউদীর মত লেখক এবং অন্য লেখকরা বিভিন্ন দেশ সফরের অভিজ্ঞতা থেকে প্রকাশ করেন যে কৃষিতে সমৃদ্ধি অর্জন, ব্যবসায়-বাণিজ্য ও শিল্প স্থাপনের মাধ্যমে ইসলামী দেশসমূহের বিভিন্ন অঞ্চল ধনী ও সমৃদ্ধশালী হয়েছে। বস্তুত উন্নত সেচ-ব্যবস্থা, ভাল যোগাযোগ ব্যবস্থা, পর্যাপ্ত শান্তি ও শৃংখলা ইত্যাদির ভিত্তিতে আরব ভূগোল বিজ্ঞানীগণ এ সকল এলাকার উন্নতি ও সমৃদ্ধির প্রশংসা করেছিলেন। পরবর্তীকালে যুদ্ধ, সেচ-ব্যবস্থা ধ্বংস হয়ে যাওয়া এবং রাজনৈতিক অস্থিরতার ফলে বস্তুগত উন্নতির এই চিত্র সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত হয়ে যায়। আর আধুনিক পশ্চিমা লেখকগণ এ সকল বিবরণের সত্যতা সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করতে শুরু করেন। সুখের কথা স্রোত ঘুরে যেতে শুরু করেছে, ইতিহাসের

বর্তমানে মধ্য এশিয়ার দেশসমূহে সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার পতনের ফলে লেখকের এই মন্তব্য সঙ্গতিপূর্ণ মনে নাও হতে পারে, তবে সার্বিক অর্থে একে মুসলিম পুনর্জাগরণের আশাবাদ হিসেবে ধরে নেয়া হলে এবং মূল আলোচনার প্রাসঙ্গিকতা বিবেচনায় আনা হলে তাঁর এই আশাবাদ যথার্থ

–অনুবাদক।

www.waytojannah.com

দূরদৃষ্টিহীন লেখকরা এখন বৈরিতার সম্মুখীন হচ্ছেন। উপরন্তু মধ্য এশিয়া ও তার আশপাশের দেশসমূহে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি গড়ে উঠা এবং এশিয়া ও আফ্রিকার নতুন স্বাধীনতা প্রাপ্ত দেশগুলোতে জাতীয় অর্থনীতির বিকাশের ফলে প্রমাণ হতে শুরু করেছে যে মধ্যযুগের ভূগোলবিদগণ কর্তৃক বর্ণিত সেকালের সমৃদ্ধির বহু চিত্র সত্য ছিল। বস্তুত এ সকল ভৌগোলিক বিবরণের মধ্যে আরো অনেক আকর্ষণীয় দিক খুঁজে পাওয়া যেতে পারে। কারণ মনে হয় ভূগোলের প্রতি মনোযোগ এতই একনিষ্ঠ ছিল যে কোন কিছুই তাদের গভীর পর্যবেক্ষণের আওতা থেকে বাদ পড়েনি কিংবা বিষয়ের বহুমুখী উপযোগিতা তাদের নজর এড়ায়নি। নগরজীবন সম্পর্কে অধ্যয়ন, অঞ্চলভিত্তিক বর্ণনা, শিল্প স্থাপনা, বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ড, যোগাযোগ ব্যবস্থা, সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য ইত্যাদি জীবনের সকল বিচিত্র উপযোগ এ সকল বিখ্যাত ভূগোল বিজ্ঞানীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। আর এভাবেই সংশ্লিষ্ট এলাকা এবং পৃথিবীর দূরবর্তী অঞ্চলের ইতিহাস রচনায় শ্রেষ্ঠতম উপকরণ তৈরী হয়েছিল।

তথ্যসূত্র

১. এস. এম. আলাভী, Arab Geography in the Ninth and Tenth Centuries (আলীগড় মুসলিম ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৬৫) পৃ. ২১

২. তু, Le Strange, Lands of the Eastern Caliphate (ক্যামব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস), পৃ. ১০৫।

৩. মিনরস্কি, সম্পা, হুদুদ আল আলম, ভূমিকা, পৃ. ৭।

৪. ফারসী ভাষায় রচিত ইবনে হায়কলের পাণ্ডুলিপির ইংরেজী অনুবাদ ১৮০০ সালে ওয়েসলি, লন্ডন থেকে প্রকাশিত হয়েছিল। অন্যান্য অনুবাদ এবং সংস্করণও দেখা হয়েছে।

৫. মাকদিসি, আহসানুত তাকাসিম, পৃ. ২–৩।

৬. ৯৮৩ খ্রিস্টাব্দে বসরায় গঠিত বুদ্ধিজীবী ও বিজ্ঞানীদের সংঘ। এর সদস্যদের নাম গোপন রাখা হয়েছিল। আজ অবধি এঁদের সম্পর্কে প্রকৃত ও পূর্ণাঙ্গ তথ্য জানা যায়নি। বিজ্ঞান ও সাহিত্য বিষয়ক কর্মকাণ্ডের সাথে এঁদের প্রায় ১৩ জনের নাম জড়িত করা হলেও তা মূলত অনুমানভিত্তিক।

৭. Levy, The Sociology of Islam, খ–২, পৃ. ৩৭০–৯৪ এবং ২৯১–৯৬।

৮. History of Muslim Philosophy,খ–২, পৃ. ১২৬০–৬১।

৯. মাসউদী তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'আত্তানবিহ' এবং 'মারাজ আল জাহাব'-এ মানুষের পরিবেশ ও এর প্রভাব সম্পর্কিত আলোচনা অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন।

www.waytojannah.com

চতুর্থ অধ্যায়

একাদশ থেকে পঞ্চদশ শতাব্দীর ভূগোল বিজ্ঞানীগণ

খ্রিস্টীয় দশম শতাব্দী শেষ হওয়ার সাথে সাথে মুসলিম ভূগোল বিজ্ঞানীদের চরম উৎকর্ষের যুগ সমাপ্ত হয়েছিল – এই প্রচলিত ধারণার বিপরীতে প্রকৃত সত্য হলো, বরং সামগ্রিকভাবে শ্রেষ্ঠ ভূগোল বিজ্ঞানীদের আবির্ভাব ঘটেছিল পরবর্তী শতাব্দীসমূহে। এ সকল শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতের মধ্যে কয়েকজন হলেন আল বিরুনী, আল ইদরিসি, ইয়াকুত আল হামাভী, আবুল ফিদা, আল কাযবিনি এবং ইবনে খালদূন। সুতরাং এঁদের কার্যক্রমের উপর কিছুটা আলোকপাত করা আবশ্যক। তাঁদের অবদান প্রাথমিক যুগের ঔপনিবেশিকতা ও আবিষ্কারের যুগের পূর্বে পাশ্চাত্যের লিখিত যে কোন বিজ্ঞানভিত্তিক ভূগোল চর্চার তুলনায় অগ্রগণ্য।

আল বিরুনী' আবূ রায়হান মুহাম্মদ বিন আহমদ ছিলেন যুগের শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী এবং বিশ্বের তাবৎ শ্রেষ্ঠ চিন্তাবিদগণের মধ্যে শীর্ষস্থানীয়দের একজন। তিনি তৎকালীন মধ্য এশিয়ার বিখ্যাত নগরী খাওয়ারিযম-এর শহরতলীতে (খিবা) হিজরী ৩৬২/৯৭২ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং সে অনুযায়ী তাঁর নামের সাথে খেতাব যুক্ত হয়। জ্ঞানচর্চায় উজ্জ্বল জীবনের প্রথম দিকেই তিনি ভূগোল ও এর বিভিন্ন দিক সম্পর্কে আগ্রহী হন। যদিও তাঁর বিভিন্নমুখী আগ্রহের মধ্যে ছিল পদার্থবিজ্ঞান, গণিত, দর্শন, জ্যোতির্বিজ্ঞান, ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্ব, খনিজবিজ্ঞান ও ধাতু বিদ্যাসহ বিভিন্ন বিষয়। কিন্তু ভূগোলে তাঁর অবদান এতই উঁচুমানের [১] ছিল যে উত্তরকালের জ্ঞানানুসন্ধানীদের কাছে স্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

আল বিরুনী আরবী ও ফারসী উভই ভাষাতেই লিখেছেন। তিনি হিব্রু ও প্রাচীন সিরীয় ভাষা 'সিরিয়াক' জানতেন এবং ভারতে অবস্থানকালে সংস্কৃত ভাষা আয়ত্ত করেছিলেন। এমনকি সুলতান মাহমুদ কর্তৃক খাওয়ারিযম দখল এবং তাঁকে তার রাজধানীতে নিয়ে আসার আগেও তিনি একজন বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন। তিনি জুরজান বা হাইরকানিয়া, মেডিয়া এবং খুরাসান ভ্রমণ করেন। হিজরী ৩৯০/১০০০ খ্রিস্টাব্দে

www.waytojannah.com

জুরজানের শাসকের দরবারে অবস্থানকালে 'প্রাচীন জাতিসমূহের কালক্রম' (Chronology of Ancient Nation- আল আছার আল বাকিয়াহ) রচনা করেন। শুরুর দিকে তিনি খাওয়ারিযমের তৎকালীন মামুনী শাসকের (যাকে ৪০৭ হিজরীতে সুলতান মাহমুদ বিতাড়িত করেছিলেন) দরবারে অবস্থান করতেন।

সুলতান মাহমুদ ভারত অভিযানকালে তাঁকে ভারতে নিয়ে আসার পর তাঁর বুদ্ধিবৃত্তিক জীবনের মোড় ঘুরে যায়। আল বিরুনী ভারতে বেশ কয়েক বছর অবস্থান করে সংস্কৃত ভাষা শিখেন এবং তৎকালীন ভারতীয় বিজ্ঞান সম্পর্কে জ্ঞান আহরণ করেন। তিনি ভারতের ব্যাপারে এতই আগ্রহী হয়ে পড়েছিলেন যে, তাঁর সবচাইতে স্মরণীয় গবেষণা গ্রন্থ সে দেশ সম্পর্কেই রচনা করেন। সম্ভবত এই গ্রন্থখানিই পরবর্তী প্রজন্মের জন্য তাঁর রেখে যাওয়া সবচাইতে মূল্যবান সম্পদ। তিনি এই গ্রন্থের নাম দিয়েছিলেন 'সাকিক মা ফিল হিন্দ' বা 'কিতাবুল হিন্দ' যা আল বিরুনীর 'ভারত তত্ত্ব' নামে সমধিক পরিচিত। সুলতান মাহমুদের মৃত্যুর অল্প কিছুকাল পরে ১০৩০ খ্রিস্টাব্দে এই কিতাব প্রণয়নের কাজ সম্পন্ন হয়। এই কিতাবের প্রধান আলোচিত বিষয় ছিল, সে দেশের ভূগোল এবং সে সম্পর্কিত জটিল বিষয়াদির উপর বিশেষ আলোচনা। এ ছাড়া রয়েছে নদীসমূহের বিন্যাস, ভূ-তত্ত্ব, জোয়ার-ভাটা, সাগর, আবহাওয়া, ভূগোলকের আকার ও পরিমাপ সম্পর্কিত বিষয়ে তাঁর মূল্যবান মন্তব্য।

সুলতান মাহমুদ-এর সময়ে গজনীতে অবস্থানকালে তিনি তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ 'আল কানুন আল মাসউদী' (যা পশ্চিমা জগতে 'ক্যানন মাসুডিকাস' নামে পরিচিত) রচনা করেন। পরবর্তী শাসক সুলতান মাওদুদ-এর শাসনকালে তিনি যে দুটি বিখ্যাত গ্রন্থ রচনা করেন সেগুলো হলো 'কিতাবুত তাফহীম' এবং কিতাবুল জাবমাহির ফি'ল মারফাত আল জাওয়াহির (মূল্যবান পাথর সম্পর্কিত কিতাব)। তাঁর আরেকখানা উল্লেখযোগ্য কিতাবের নাম 'কিতাব আল সাইদানা'। তুরস্কের আহমদ যাকী ভালিদি সহ কিছু সংখ্যক আধুনিক গবেষক মন্তব্য করেছেন যে তাঁর অপেক্ষাকৃত কম পরিচিত আরো কিছু কিতাবে খনিজ সম্পদ, ধাতুবিদ্যা এবং খনিজবিদ্যা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। যাকী ভালিদি-এর মতে আল বিরুনী বিভিন্ন স্থানের অক্ষাংশ, দ্রাঘিমাংশ নির্ণয় করা এবং টলেমীর ভূগোলে বর্ণিত জটিল বিষয়ের উপর মন্তব্য করা ইত্যাদি বিষয়ের পাশাপাশি ইসলামী সাম্রাজ্যের মধ্যে সামাজিক ও ধর্মীয় বৈচিত্র্যের যে সমাহার ঘটেছিল তার বিশ্লেষণেও সমভাবে আগ্রহী ছিলেন। সুতরাং আল বিরুনী তাঁর সমসাময়িক গবেষক ও বিজ্ঞানীদের মধ্যে ছিলেন অতুলনীয় এবং ভূগোলের ক্ষেত্রে তাঁর অবদান ছিল শ্রেষ্ঠতম।

একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দীর আরো দু'জন অসাধারণ ভূগোলবিদ ছিলেন আল ইদরিসি এবং ইয়াকুত আল হামাভী। আল ইদরিসি (আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ বিন

www.waytojannah.com

মুহাম্মদ আবদুল্লাহ বিন ইদরিসি আল শরিফ) ছিলেন পশ্চিমা জগতের মুসলমান। তিনি ১০৯৯ খ্রিস্টাব্দে সিয়োটাতে জন্মগ্রহণ করেন এবং আন্দালুসিয়ার কর্ডোভায় শিক্ষা গ্রহণ করেন। তিনি ইউরোপ এবং বহু ইসলামী দেশের বিস্তৃত এলাকা সফর করেন। পশ্চিম আফ্রিকা, নীল নদের উৎস এলাকা, সুদান ও ভূমধ্যসাগরীয় এলাকা এবং আটলান্টিকের উপকূলীয় এলাকা সম্পর্কে তাঁর গভীর জ্ঞান প্রণিধানযোগ্য।

আল ইদরিসি নরম্যান রাজা দ্বিতীয় রজার-এর পৃষ্ঠপোষকতায় সিসিলিতে বসতি স্থাপন করেন। ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে আরব ও অনারবের মাঝে সাংস্কৃতিক বিনিময়ের সংযোগস্থলে বসবাস করার কারণে তাঁর পক্ষে আকর্ষণীয় বিভিন্ন ভৌগোলিক তথ্য কুড়িয়ে নেয়া সহজ ছিল। তাঁর বিখ্যাত কিতাব 'নুজহাতুল মুশতাক ফি ইখতিরাক আল আশফাক' (সাধারণভাবে 'কিতাবুল রুজারী' বা রজারের কিতাব নামে পরিচিত) ১১৫৪ খ্রিস্টাব্দে রচিত হয়। এ প্রসঙ্গে তিনি নিজে বলেছেন–'যারা পৃথিবীময় ঘুরে বেড়াতে আনন্দ পান তাঁদের জন্য'–এই কিতাব রচিত হয়েছে। বলা হয়ে থাকে যে এই শ্রেষ্ঠ ভূগোল গ্রন্থ প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় ভূগোলকে একীভূতকরণের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ নমুনা। কিছু কিছু আধুনিক ভূগোলবিদ মন্তব্য করেছেন, এটা অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে, মধ্যযুগের খ্রিস্টান লেখকরা সেই যুগসন্ধিক্ষণে তাদের সীমিত দৃষ্টিভঙ্গি, ধর্মীয় পৌরাণিক কাহিনী, পঞ্জিকা, কোষ্ঠি এবং নক্ষত্র বিচার-এর দ্বারা প্রভাবিত থাকার কারণে ইদরিসি কিতাবে বর্ণিত বিষয়ের উপযোগিতা ও গুরুত্ব উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়েছিল।

আল ইদরিসি বহু মানচিত্র এবং বিশেষ করে মহাকাশের আঙ্গিকে রৌপ্য নির্মিত ভূগোলক প্রস্তুত করেছিলেন। সারটন ৪-এর মতে ইদরিসি 'রাউদ আল-উনস ওয়া নজুহাত আল-নাফ'স (মানুষকে আনন্দ দেয়া ও আত্মাকে আলোকিত করার জন্য) নামে আরেকখানা গুরুত্বপূর্ণ ভূগোল গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। এটা ছিল চলাচলের পথ সম্পর্কে কয়েক খণ্ড বিশিষ্ট কিতাব, যা সিসিলির রাজা দ্বিতীয় রজারের পরবর্তী প্রথম উইলিয়ামের নামে উৎসর্গ করা হয়েছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় বর্তমানে এই কিতাবের কোন সন্ধান পাওয়া যায় না। আল-ইদরিসি সিসিলির পালেরমোতে বসবাস করতেন এবং ১১৬৬ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন।

ইয়াকুত আল-হামাভী, ইবনে আবদুল্লাহ আল রুমী একজন বিখ্যাত লেখক, পরিব্রাজক এবং উঁচুমানের ভূগোল বিষয়ক পর্যবেক্ষক ছিলেন। তিনি 'মুজামুল বুলদান' নামে একখানা ভূগোল বিষয়ক অভিধান রচনা করেছিলেন, যার রচনা কাজ সম্পন্ন হয় ১২২৪ খ্রিস্টাব্দের ১৩ মার্চ। তাতারী ধ্বংসযজ্ঞের কালো মেঘ যখন মধ্য এশিয়া থেকে ইরাক পর্যন্ত সমৃদ্ধ অঞ্চলগুলো গ্রাস করে নিচ্ছিল, ইসলামের ইতিহাসের সেই

www.waytojannah.com

Contents

ক্রান্তিকালে ইয়াকুতের পর্যবেক্ষণ অনুসারে এটি কিছু ঐতিহাসিক উপাদান ও ভৌগোলিক তথ্য সংবলিত একটি অসাধারণ গ্রন্থ । এ সময়ে তিনি তাঁর মূল্যবান পাণ্ডুলিপিগুলো সাথে নিয়ে সিরিয়ার আলেপ্পো (হালাব) পৌছা পর্যন্ত পশ্চিম দিকে ধাবিত হন। পরে ১২২৯ খ্রিস্টাব্দে সেখানে মৃত্যুবরণ করেন।

ইয়াকুত পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চলে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে সফর করেছিলেন। এ সময়ে তিনি বিভিন্ন ব্যবসায়িক পণ্যের বিক্রেতা হিসাবে, আবার কখনো পুস্তক বিক্রেতার প্রতিনিধি হিসাবে কাজ করেন। এভাবে এক সময় তিনি জ্ঞান অর্জনের আনন্দ উপলব্ধি করতে সক্ষম হন এবং এ ক্ষেত্রে এতই উন্নতি লাভ করেন যে শুধুমাত্র মারভ (খাওয়ারিযম)-এর উন্নত পাঠাগারসমূহে অধ্যয়ন করার উদ্দেশ্যে তিনি সেখানেই থেকে যান। তিনি বলখেও কিছুকাল বসবাস করেন এবং সেখানে তাঁর বিখ্যাত কিতাব রচনা শুরু করেন। বিষয়বস্তু উপস্থাপন করার ক্ষেত্রে তিনি বর্ণানুক্রম এবং বিশ্বকোষের আঙ্গিক অনুসরণ করেন। এই কিতাবে আন্দালুসিয়া (স্পেন) থেকে ভারত এবং মাওয়ারুন নাহার (ট্রান্স অক্সিয়ানা) পর্যন্ত বিস্তৃত ইসলামী রাজ্যসমূহের বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন। এতে অন্তর্ভুক্ত আছে ভৌত-ভূগোল, ইতিহাস, রাজনৈতিক অগ্রগতি এবং নৃবিজ্ঞান সম্পর্কিত বিষয়াবলী। ইয়াকুত খুব উদার দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী ছিলেন এবং এ কারণে তাঁর সময়ের পূর্বে লিখিত গুরুত্বপূর্ণ কিতাবাদি থেকে প্রাপ্ত তথ্য যত্নের সাথে গ্রহণ করতেন। বস্তুতপক্ষে তিনি যে সকল কিতাব থেকে উদ্ধৃতি প্রদান এবং জ্ঞানগত অবদান গ্রহণ করেছেন সেগুলোর অস্তিত্ব বর্তমানে নেই। ইয়াকুত প্রণীত আরেকখানা গুরুত্বপূর্ণ কিতাব হচ্ছে 'জ্ঞানী লোকের অভিধান' (মুজামুল উবাদা) এবং এতেও প্রয়োজনীয় ভৌগোলিক উপাদান রয়েছে। মধ্যযুগের ভূগোল লেখকদের মধ্যে ইয়াকুত সত্যিই একটি মর্যাদাপূর্ণ অবস্থানে রয়েছেন।

নাসির-ই-খসরু (জ. ১০০৩ খ্রিস্টাব্দ) ছিলেন পারস্যে জন্মগ্রহণকারী একজন সুপরিচিত পরিব্রাজক। তিনি মুসলিম অঞ্চলসমূহ হয়ে বলখ থেকে ভারত, প্যালেস্টাইন ও হেজায সফর করেন। আল বিরুনীর একজন বয়োকনিষ্ঠ সমসাময়িক হিসেবে তিনি ভিন্ন আঙ্গিকে ভ্রমণ বিবরণী (সফরনামা) লেখার জন্য পরিচিত ছিলেন, যা ১০৪৫ খ্রিস্টাব্দে ফারসী ভাষায় রচিত হয়েছিল। এই সফরনামা আরবী ভাষায় প্রচলিত সফরনামাসমূহ থেকে ভিন্নতর ছিল। ক্রুসেড সংঘটিত হওয়ার পূর্বে জেরুযালেমের জীবন যাপন ও অবস্থা সম্পর্কে এতে বর্ণিত হয়েছে। এ ছাড়া মিশরের ভৌগোলিক বর্ণনার পাশাপাশি সেখানকার তৎকালীন ঘটনাবলীরও সুন্দর ব্যাখ্যা প্রদান করেছিলেন।

আল কাযবিনী যাকারিয়া বিন মুহাম্মদ বিন মাহমূদ আবূ ইয়াহইয়া ত্রয়োদশ শতাব্দীর একজন সুপরিচিত ভূগোলবিদ। তিনি ১২০৩ খ্রিস্টাব্দে উত্তর ইরানের

www.waytojannah.com

Contents

কাযবিনে জন্মগ্রহণ করেন। সর্বশেষ আব্বাসীয় খলীফা আল মুতাসিম-এর শাসনামলে তিনি 'ওয়াসিত' ও 'হিল্লাহ'-এর প্রধান কাযী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ছিলেন ভূগোল বিষয়ে বহু গ্রন্থের প্রণেতা এবং এমন এক ব্যক্তি যিনি কমপক্ষে পঞ্চাশ জন প্রখ্যাত পূর্বসূরী লেখক ও চিন্তাবিদের লেখা পাঠ করেছিলেন। এ ছাড়া তিনি অন্যান্য ওয়াকিবহাল পরিব্রাজকদের সাথে পরামর্শ করেন।

'আযাইব আল বুলদান' (বিভিন্ন দেশের আজব ঘটনা), 'আছার আল বিলাদ' (ঐতিহাসিক ভূগোল) এবং 'আযাইব আল মাখলুকাত ওয়া গারাইব আল মাওজুদাত (সৃষ্টির গঠনতত্ত্ব বা সৃষ্টির বিস্ময়) ইত্যাদি অসাধারণ গ্রন্থ কাযবিনিকে খ্যাতি এনে দেয়। তিনি জ্যোতির্বিদ্যা এবং পৃথিবী বিষয়েও গ্রন্থ রচনা করেছেন। শেষোক্ত গ্রন্থের ভূগোল অংশে বস্তুগত উপাদান সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। অপরদিকে ঐতিহাসিক ভূগোল অংশে ইতিহাস ও জীবনী বিষয়ক তথ্যাবলী সন্নিবেশ করা হয়েছে। তিনি বেশ কিছু স্পেনবাসী মুসলমান ভূগোলবিদের লেখা থেকে সাহায্য গ্রহণ করেন। এ ছাড়া অমুসলিম দেশসমূহ, বিশেষ করে ফ্রান্স ও জার্মানী সম্পর্কিত, বিবরণের জন্য তিনি আন্দালুসীয় পরিব্রাজক ইব্রাহীম আল তারতুশী (মৃত্যু ১০৮৫) এবং আফ্রিকার মধ্য অঞ্চলের বিবরণের জন্য সুলায়মানী রচনাবলী থেকে সাহায্য গ্রহণ করেন। কাযবিনির লেখা তৎকালীন মুসলিম দুনিয়ার পণ্ডিতবর্গ, আরবী, ফারসী ও তুর্কীভাষী মানুষের উপর ব্যাপক প্রভাব ফেলতে সক্ষম হয়।

আবুল ফিদা ইসমাঈল ইবন আলী ইবন মুহাম্মদ ইবন শাহানশাহ ইবন আইউব ইমাদুদ্দীন আল আইউবী হিজরী ৬৭২/১২৭৩ খ্রিস্টাব্দে দামেস্কে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা আল মালিক আল মনসুর মঙ্গোলিয়া থেকে সিরিয়ায় এসে আশ্রয় গ্রহণ করেন। আবুল ফিদা 'তাকবীম আল বুলদান' নামে একখানা সহজপাঠ্য ও ভারসাম্যপূর্ণ ভূগোল গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। পুরনো তথ্যের ভিত্তিতে এই গ্রন্থ রচনা করা হলেও এতে যথেষ্ট পরিমাণে নতুন তথ্যও সংযোজন করা হয়েছে। সৌভাগ্যবশত এটির অস্তিত্ব এখনো টিকে আছে এবং বিগত শতাব্দীতে ইউরোপের বিদ্বৎমহলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়। ফরাসী পণ্ডিত রেইনাউদ (Reinaud) 'তাকবীম আল বুলদান'-এর বিষয়বস্তু ও বৈশিষ্ট্যের উপর তাঁর মন্তব্যসহ একটি ভূমিকা লিপিবদ্ধ করেছেন।

আরেকজন সিরীয় ভূগোলবিজ্ঞানী ছিলেন আল দিমাশকী আল সূফী শামসুদ্দীন, যিনি ১৩২৭ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেছিলেন। তিনি সৃষ্টির গঠনতত্ত্ব সম্পর্কে 'নুহবাত আল-দাহার ফি আযাইব আল বার ওয়াল বাহর' শিরোনামে একখানা গ্রন্থ রচনা করেন, যা মূলত ভূগোল বিজ্ঞানের বৈশিষ্ট্যে সমৃদ্ধ। দিমাশকী তাঁর এই গ্রন্থে বহু নতুন স্থানের বিবরণ প্রদান করেছেন। মালাবার ও কারোমণ্ডল (মা'বার) উপকূল সম্পর্কে তাঁর প্রদত্ত

www.waytojannah.com

Contents

বিবরণ ভূগোলের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। মুহাম্মদ হুসাইন নাইনার ভারতীয় উপমহাদেশ সম্পর্কে একখানা আকর্ষণীয় গ্রন্থ রচনা করেন। গ্রন্থখানি ১৯৪২ সালে মাদ্রাজ থেকে প্রকাশিত হয়। উক্ত গ্রন্থে দক্ষিণ ভারত সম্পর্কিত আলোচনায় তিনি দিমাশকীর বিবরণ উদ্ধৃত করেছেন।

হামদ-আল্লাহ মুসতাওফি চতুর্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগের একজন প্রখ্যাত ভূগোলবিদ। তিনি ফারসী ভাষায় লিখেছেন 'নুযহাতুল কুলূব (অন্তরের আলো)। তিনি যখন এই কিতাব লিখেন তখন মঙ্গোলরা ইসলামের অনুসারীতে পরিণত হয়েছে এবং হালাকু খানের প্রপৌত্র সুলতান আবূ সাঈদ ঈলখানের শাসন আমলেই তিনি তাঁর এই কিতাব রচনা সম্পন্ন করেন। নুযহাতুল কুলূব-এ বস্তুগত ও মানবীয় উপাদান সমন্বয়ে ইসলামী দুনিয়ার ভূগোল উপস্থাপন করা হয়েছে। তাঁর বর্ণনায় দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার প্রাণী ও উদ্ভিদ সম্পর্কিত তথ্যাবলী এবং সুমাত্রা, জাভা ও জাপান সম্পর্কে উল্লেখ পাওয়া যায়। কাস্পিয়ান সাগর থেকে আরাল সাগর পর্যন্ত অক্সাস নদীর নিম্নমুখী গতিপথ পরিবর্তন সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য এতে উল্লিখিত হয়েছে। এ ছাড়া বাকু এলাকায় উষ্ণ পানির ঝর্ণা এবং তেল কূপ-এর কথাও এতে উল্লেখ করা হয়েছে। মঙ্গোল শাসনামলে রচিত তাঁর আরেকখানা গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ হচ্ছে 'তারিখ-ই-গুযিদাহ' (নির্বাচিত ইতিহাস)।

আবদুর রাজ্জাক আল সমরখন্দী ১৪১৩ খ্রিস্টাব্দে হেরাত-এ জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৪৮২ খ্রিস্টাব্দে তাঁর নিজ শহরে মৃত্যুবরণ করেন। ১৪৪১ খ্রিস্টাব্দে তাঁকে দূত হিসাবে ভারতে প্রেরণ করা হয় এবং সেখান থেকে ফিরে এসে রচনা করেন 'মাতলা আল-সা'দাইন ওয়া মাজমা 'আল বাহরাইন'। এটি অদ্যাবধি তৎকালের গুরুত্বপূর্ণ ভূগোল গ্রন্থ হিসেবে বিবেচিত।

হাফিজ আবরু আল খাওয়াফি ছিলেন সম্রাট তাইমুর-এর সমসাময়িক এবং বন্ধু। তিনি ছিলেন একজন সুপরিচিত ইতিহাসবিদ ও ভূগোলবিদ। ১৪২৯ খ্রিস্টাব্দে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। ১৪১৪ খ্রিস্টাব্দে তাইমুর-এর পুত্র শাহরুখ কর্তৃক প্রাচীন উৎস থেকে তথ্যাবলী সংকলন করে ভূগোল গ্রন্থ রচনা করা এবং নতুন জ্ঞান লিপিবদ্ধ করার জন্য তাঁকে নিয়োজিত করা হয়েছিল। তাঁর লেখা 'যুবদাতুত তাওয়ারিখ' গ্রন্থখানি ছিল সৃষ্টির গঠনতত্ত্ব সম্পর্কে প্রচলিত জ্ঞান এবং নতুন ভূগোল জ্ঞানের সমন্বয়। তিনি মরক্কো থেকে কিরমান পর্যন্ত এলাকার ভৌগোলিক বিবরণ এবং খোরাসান এ ট্রান্স অক্সিয়ানা সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ প্রদান করেছেন। বিখ্যাত রুশ পণ্ডিত বারথল্ড (Barthold)-এর মতে এটি তৎকালীন ঘটনা ও অবস্থা সম্পর্কে জানার জন্য একখানা উঁচুমানের গ্রন্থ।

সর্বকালের শ্রেষ্ঠ পরিব্রাজক ইবনে বতুতা শামসুদ্দীন-এর সফরসমূহ চতুর্দশ শতাব্দীতে ধারাবাহিকভাবে সংঘটিত হয়। তিনি তৎকালীন দুনিয়ার বিশাল অংশ তথা

www.waytojannah.com

Contents

মরক্কো থেকে চীন পর্যন্ত সফর করেন। মুসলিম এবং অমুসলিম উভয় অঞ্চলের উপর দিয়ে তাঁর এই সফর সম্পন্ন হয়। তিনি মোট ত্রিশ বছরে ৭৫০০০ মাইলেরও বেশী পথ সফর করেন। এই সফরকালে তিনি কয়েকবার হজ্জ করেছেন, বহু ক্ষমতাসীন নৃপতির রাজধানীতে উপস্থিত হয়েছেন, প্রত্যন্ত অঞ্চলের বহু অলি আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করেছেন আবার কখনো বা রাজকর্মচারী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। স্থলপথ এবং জলপথ উভয় পথেই তিনি সফর করেছেন। ভূগোল এবং সর্বোপরি সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিষয়ে তাঁর পর্যবেক্ষণ অত্যন্ত তাৎপর্যবহ। মরক্কোয় ফিরে এসে তাঁর লেখা আফ্রিকা ও এশিয়া ভ্রমণের বিবরণ (রিহলাহ) লিপিবদ্ধ করেন, যা এই শ্রেণীর ভ্রমণ বিবরণের ক্ষেত্রে সবচাইতে মনোমুগ্ধকর নমুনা হিসেবে বিবেচিত।

ইবনে বতুতা হিজরী ৭০৪/১৪০৪ খ্রিস্টাব্দে তানজিয়ারে জন্মগ্রহণ করেন। বড়জোর বিশ বছর বয়সে তিনি তাঁর পূর্বমুখী অভিযাত্রা শুরু করেন এবং পরবর্তী ত্রিশ বছর পর্যন্ত তাঁর এই অভিনব আকাঙ্ক্ষা কোথাও থেমে থাকেনি। তিনি উত্তর আফ্রিকা, মধ্যপ্রাচ্য, এশিয়া মাইনর, রাশিয়ার দক্ষিণাঞ্চল, আরব, পূর্ব আফ্রিকা, মধ্য এশিয়া, আফগানিস্তান, ইরান, খোরাসান, ভারত, মালদ্বীপ, শ্রীলংকা, বঙ্গদেশ, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, চীনের দক্ষিণ ও উত্তরাঞ্চলের মতো দূরতম অঞ্চলে ব্যাপক সফর করেন।

পূর্বদিকের সফর শেষে ফিরে আসার পথে তিনি আন্দালুসিয়া সফর করেন।

অতঃপর সেখান থেকে সাহারা অতিক্রম করে টিমবাকু এবং নাইজার পৌঁছেন। অবশেষে তাঁর অভ্রান্ত বিবরণ মরক্কোর রাজধানী ফেজ-এ সুলতান আবূ ইনান-এর রাজদরবারে সভাসদ ইবনে জুযাই-এর নিকট উপস্থাপন করেন। তাঁর এই সফর বিবরণে বিভিন্ন স্থানের অর্থনৈতিক ও মানবিক ভূগোল বিষয়ক উপাদান, ব্যবসায়-বাণিজ্য, বন্দর, নৌপথ এবং আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যাবলীর বিবরণ ভূগোল বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর স্মৃতিশক্তি ছিল বিস্ময়কর এবং ভূগোল চেতনা ছিল অসাধারণ। ইবনে বতুতা ১৩৭৭ খ্রিস্টাব্দে ফেজ-এ মৃত্যুবরণ করেন।

জ্ঞান অন্বেষার জন্য সফর করার ঐতিহ্য আবারো আমরা প্রতিফলিত হতে দেখি ইবনে খালদূন আবু যাইদ আবদুর রহমান কর্তৃক ইসলামী দুনিয়ার পশ্চিমাংশে ব্যাপক সফর করা এবং তাঁর বিস্ময়কর রচনার মাধ্যমে। দুনিয়ার বিভিন্ন সংস্কৃতি, সমাজ ও মানব বসতির ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক এবং বস্তুগত উপাদানের প্রভাব সম্পর্কিত তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি এখানে বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য।

www.waytojannah.com

তাঁর এই ধারণা প্রকাশিত হয়েছে 'চিরন্তন ইতিহাস' (কিতাবুল বার) এবং 'ভূমিকা' (মুকাদ্দিমাহ) ৫ নামক গ্রন্থে। তাঁর গ্রন্থাবলীর গুরুত্ব, বিশেষ করে সামাজিক বিজ্ঞান সম্পর্কে তাঁর ধারণা এবং বস্তুগত ও সাংস্কৃতিক পরিবেশ কিভাবে জীবন ও মানব বসতির উপর প্রভাব ফেলে-এ সম্পর্কিত তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি আধুনিক কালে আরো অধিক গুরুত্ব লাভ করেছে।

ভূগোল বিষয়ে বিশেষ আগ্রহ লক্ষ্য করা যায় তাঁর নিম্নে বর্ণিত ধারণাসমূহের মধ্যে; যেমন মানুষের সংঘবদ্ধ হওয়ার প্রয়োজনীয়তা, দুনিয়া জুড়ে মানব সংস্কৃতির বিন্যাস, মানুষের গাত্রবর্ণের উপর আবহওয়ার প্রভাব এবং এর ফলে তাদের শিল্পকলা ও জীবন যাপনের উপর সৃষ্ট প্রতিক্রিয়া, মানুষ ও তাদের আচরণের উপর খাদ্যের প্রাচুর্য ও দৈন্যের প্রভাব এবং বিভিন্ন পরিবেশে মানব বসতির উপর তাঁর গভীর পর্যবেক্ষণ। রাজনৈতিক বিষয়াবলীর উপর তাঁর পর্যবেক্ষণ নতুন সংস্কৃতি বিজ্ঞানের অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হয়েছে। ইবনে খালদূন মানুষ ও সমাজকে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে অধ্যয়ন করেছিলেন।

স্পেন ও মাগরিবের ভূগোল বিজ্ঞানীগণ

স্পেন বেশ কিছু সংখ্যক অসাধারণ প্রতিভার অধিকারী ভূগোলবিদের জন্ম দিয়েছে। তাঁরা ব্যাপকভাবে সফর করেছেন, গভীর মনোনিবেশ সহকারে পর্যবেক্ষণ করেছেন এবং ভূগোলের বিভিন্ন বিষয়ের উপর প্রচুর লিখেছেন। আল বাকরী আবূ উবাইদ আবদুল্লাহ বিন আবদুল আযীয হিজরী ৪৩২/১০৪০ খ্রিস্টাব্দে কর্ডোভায় জন্মগ্রহণ করেন এবং হিজরী ৪৮৭/১০৯৪ খ্রিস্টাব্দে সেখানেই মৃত্যুবরণ করেন। তিনি 'ভৌগোলিক অভিধান' (মু'জাম মা ইসতা'ইজাম) রচনা করেন এবং 'চলাচলের পথ ও রাজ্যসমূহ' (আল মাসালিক ওয়াল মামালিক) নামেও তাঁর একখানা গ্রন্থ আছে। বাকরী তাঁর পূর্বসূরীদের লেখা বহু কিতাব অধ্যয়ন করেছিলেন এবং তাঁর নিজের কিতাব সংকলনকালে প্রাপ্ত এই বিশাল জ্ঞানকে কাজে লাগান। মনে হয় তিনি স্পেনীয় ভূগোলবিদ মুহাম্মদ আল তারিকি-কে (মৃত্যু হিজরী ৩৬৩/৯৭৩ খ্রিস্টাব্দ) তাঁর প্রধান তথ্যসূত্র হিসেবে ব্যবহার করেছিলেন, যিনি উত্তর আফ্রিকা সম্পর্কে গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। বাকরী-এর অন্য আরেকটি তথ্যসূত্র ছিল ইহুদী ব্যবসায়ী ও দাস সরবরাহকারী ইব্রাহীম বিন ইয়াকুব-এর রচনাবলী। স্পেনে জন্মগ্রহণকারী ইব্রাহীম বিন ইয়াকুব অটো দি গ্রেট-এর সময় তিনি জার্মানী হয়ে স্লাভ দেশসমূহ সফর করেছিলেন। সম্ভবত বাকরী ছিলেন স্পেনীয় মুসলিম ভূগোলবিদদের মধ্যে সর্বপ্রথম ব্যক্তি।

www.waytojannah.com

গ্রানাডার আরেকজন ভূগোলবিদের নাম মুহাম্মদ বিন আবূ বকর আল যুহরী। যে অল্প কয়েকজন লেখক তাঁদের লিখিত কিতাবকে ভূগোল নামে অভিহিত করেছিলেন, তিনি তাঁদের অন্যতম। তিনি লিখেছিলেন 'ভূগোল গ্রন্থ' (কিতাব আল জুগ্রাফিয়াহ)। তিনি হিজরী ৫৩২/১১৩৭ খ্রিস্টাব্দের দিকে জীবিত এবং কর্মরত ছিলেন। কথিত আছে যে, তিনি খলীফা আল মামুনের সময়ে ভূগোলবিদগণ কর্তৃক সংগৃহীত সরেজমিন তথ্যাবলী তার লেখনীর কাজে ব্যবহার করেছিলেন। আল ফাযারী ও আল কুমারী-এর রচনাবলীর মাধ্যমে তাঁর নিকট এ সকল তথ্য এসেছিল। আল যুহরী তাঁর 'ভূগোল গ্রন্থ' ও সকল বক্তব্য ও বিবরণকে আরো বিস্তৃত আকারে উপস্থাপন করেছেন।

তবে সবচেয়ে বেশী খ্যাতিমান স্পেনীয় ৬ ভূগোলবিদ ছিলেন আল মাযিনি আবূ আবদুল্লাহ বিন আবদুর রহীম আল মাযিনি আল কাইসি আল আন্দালুসী। যিনি হিজরী ৪৭৩/১০৮০ খ্রিস্টাব্দে গ্রানাডায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মিশরে আগমন করেছিলেন হিজরী ৫০৮/১১১৪ খ্রিস্টাব্দে এবং বাগদাদ গিয়েছিলেন হিজরী ৫৫৬/১১৬১ খ্রিস্টাব্দে। একটি উল্লেখযোগ্য সময় তিনি খুরাসানে এবং পরে আলেপ্পো-তে অধ্যয়নের জন্য অতিবাহিত করেন। আল মাযিনি হিজরী ৫৬৫/১১৬৯ খ্রিস্টাব্দে দামেস্কে মৃত্যুবরণ করেন। সফরের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে প্রণীত ভৌগোলিক বিবরণ সংবলিত তাঁর একখানা কিতাবের নাম (তুহফত আল আলবাব ওয়া নুখবাত আল আ'যাব)। এ ছাড়া তিনি স্পেন হয়ে আফ্রিকা, দামেস্ক, আরদবিল, কাস্পিয়ান সাগর উপকূল, দারবান্দ এবং খাজারদের এলাকা সফরের বিবরণী লিপিবদ্ধ করেছেন। তাঁর এই কিতাবের নাম 'নুখবাত আল আধান ফি আজাইব আল বুলদান। এই অসাধারণ ভূগোলবিদের আরো দু'টি সুপরিচিত কিতাবের নাম ঃ আল মাগরিব আন বা'আদ আযাইব আল বুলদান' (মাগরিবের বিবরণ) এবং 'তুহফাত আল কিবার ফি আশ'আর আল বহর' (সাগরপথে অভিযানের বর্ণনা)।

আরেকজন স্পেন দেশীয় ভূগোলবিদ ছিলেন আল মুনাজ্জিম (ইসহাক বিন হুসাইন), যিনি হিজরী ৩৪০/৯৫১ খ্রিস্টাব্দ থেকে ৪৫৪ হিজরী /১০৬৩ খ্রিস্টাব্দের মধ্যবর্তী কোন সময়ে মরক্কোতে কর্মরত ছিলেন। তার প্রণীত কিতাবে কয়েকটি বিখ্যাত নগরী সম্পর্কে বিবরণ প্রদান করা হয়েছে (কিতাব আকাম আল মারজান ফি যিকর আল মাদাইন আল মাশহুরাহ বিকুল মাকান–নগরসমূহের ভৌগোলিক অভিধান)। কিতাবখানি এতই গুরুত্বপূর্ণ ছিল যে ইদরিসি এবং ইবনে খালদূনের মতো নন্দিত ভূগোলবিদ ও লেখকগণ এ থেকে সাহায্য গ্রহণ করেছেন। ভ্যালেন্সিয়ার অধিবাসী আবূ মুহাম্মদ আল আবদারী হিজরী ৬৮৮/১২৮৯ খ্রিস্টাব্দে উত্তর আফ্রিকা হয়ে মক্কায় হজ্জে গমন ও ফিরে আসার সফর বিবরণী লিপিবদ্ধ করেছিলেন।

www.waytojannah.com

আবূ জুবাইর আবুল হুসাইন মুহাম্মদ ইবনে আহমদ ইবনে জুবাইর আল কিনানী ভ্যালেন্সিয়ার অধিবাসী ছিলেন। তিনি ১১৪৫ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ভ্রমণ বিবরণী লেখক হিসেবে তিনি খ্যাতি অর্জন করেন। তিনি দিনপঞ্জি সংরক্ষণ করতেন এবং হিজরী ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে মক্কায় হজ্জের উদ্দেশ্যে পূর্বদিকে তাঁর প্রথম ভ্রমণের আকর্ষণীয় বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন। স্পেনে ফিরে এসে তিনি 'রিহালাত ইবনে জুবাইর' (ইবনে জুবাইরের ভ্রমণ বিবরণী) শিরোনামে তাঁর এই দিনপঞ্জি প্রকাশ করেন। তাঁর এই বিবরণে ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের মুসলিম দেশসমূহের ভূগোল, সংস্কৃতি ও বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ডের উপর আলোকপাত করা হয়েছে। আল আবদারী, আল বালাভী, ইবনুল খাতিব, আল মাকরিযি, আল ফাসি, আল মাক্কারী এবং ইবনে বতুতার মতো উত্তরকালের বিখ্যাত লেখক ও ঐতিহাসিকগণ ইবনে জুবাইরের রচনাবলী থেকে সাহায্য গ্রহণ করেছেন। জীবনের শেষ বছরগুলোতে তিনি মালাগা, ফেজ এবং সিওটাতে শিক্ষকতা করেন। ১২১৭ খ্রিস্টাব্দে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। এই দিনপঞ্জি তৎকালের একটি অসাধারণ তথ্যসূত্র।

ইবনে সাইদ আল মাগরিবি (মৃত্যু ১২৭৪ খ্রিস্টাব্দ) 'কিতাব জুগ্রাফিয়াহ ফিল আকালিম' (বিভিন্ন দেশের ভূগোল) নামে একখানা উল্লেখযোগ্য ভূগোল গ্রন্থ লিখেন, যার শুধুমাত্র সারাংশটুকু বর্তমানে সংরক্ষিত আছে। আবহাওয়া সম্পর্কে প্রচলিত ধারণার ভিত্তিতে রচিত হলেও ইবনে সাইদ অনেক নতুন স্থানের অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমাংশ উল্লেখ করেছেন। লেখক তাঁর এই গ্রন্থে বেশ কিছু নতুন তথ্য সংযোজন করেছেন। তন্মধ্যে রয়েছে পশ্চিম আফ্রিকার উপকূলে ইবনে ফাতিমার সফর সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ কাহিনী এবং কিছু সংখ্যক দ্বীপ আবিষ্কারের তথ্যাবলী। এই দ্বীপগুলো সম্ভবত বর্তমানে আজোর ও ক্যানারী দ্বীপপুঞ্জ নামে পরিচিত। তিনি আল-মোহাদেস (আল-মুয়াহহিদুন)-এর সময়ের পরে উত্তর আফ্রিকার উপজাতিদের বসতি এলাকা সম্পর্কে বর্ণনা প্রদান করেছেন। তিনি পশ্চিম ইউরোপ, আরমেনিয়া এবং তাতারীদের দ্বারা দখলকৃত কিছু কিছু এলাকা সফর করেন। কথিত আছে যে, তিনি হালাকু খানের দরবারে হাযির হয়েছিলেন।

১৪৯১ খ্রিস্টাব্দে মুসলমান শাসনের পতনের পর সেখানে অব্যাহত বর্বরতার ফলে বহু পাণ্ডুলিপি হারিয়ে যাওয়া সত্ত্বেও স্পেন মুসলমান ভূগোল বিজ্ঞানীদের নিকট থেকে যে মূল্যবান উত্তরাধিকার অর্জন করেছিল তাঁর মূল্য অপরিসীম।

মাগরিবের (উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকা) এবং আন্দালুসিয়ার (স্পেন) বিখ্যাত ভূগোল বিজ্ঞানীগণের মধ্যে শাইখ আলী আল হারাভী, আল ইদরিসি, তারতুশী ইবনে বতুতা এবং ইবনে খালদূন[৭] সহ অন্যান্য ভূগোল বিজ্ঞানীদের কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। আবিষ্কারের যুগের (১৪৯২-১৫২৬) আবির্ভাবের সাথে এবং বিভিন্ন সাগরে

www.waytojannah.com

ইউরোপীয়দের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর এবং পশ্চিমা ধ্যান-ধারণার বিপরীতে ভূগোলের প্রতি মুসলমানদের আগ্রহ কখনো অবদমিত হয়নি। এ সময়েও বেশ কিছু জনপ্রিয় ভূগোল গ্রন্থ রচিত হয়, যা সমসাময়িক ইউরোপীয় লেখকদের রচিত গ্রন্থাবলীর তুলনায় শ্রেষ্ঠতম। আবুল ফজল আল্লামী (জ. ১৫৫১ খ্রিস্টাব্দ) রচিত 'আইন-ই-আকবরী প্রায়োগিক ভূগোল' প্রশাসন ও ইতিহাস বিষয়ে এক অতুলনীয় গ্রন্থ। এটা হচ্ছে বিশাল মোঘল সাম্রাজ্যের বাস্তবভিত্তিক গেজেটিয়ার। এতে এতো বিপুল পরিমাণ অর্থনৈতিক, ভৌগোলিক ও প্রশাসনিক তথ্যাবলী রয়েছে যে গবেষকগণ অদ্যাবধি এর সকল তথ্য ব্যবহার করতে সক্ষম হয়নি। মহান মোঘল সম্রাট আকবর-এর শাসনামলে ফারসী ভাষায় এই গ্রন্থ রচিত হয়েছে। 'রায়' থেকে আগত আমিন আহমদ রাযী আকবরের শাসনামলে ভারত সফর করেছিলেন। উক্ত সফরের ভিত্তিতে তিনি রচনা করেন বৃহদাকার ভৌগোলিক অভিধান (১৫৯৩) 'হাফত ইকলিম'। ১৫৯৮ খ্রিস্টাব্দে দামেস্ক থেকে আসেন আল আশিক। ব্যাপক সফর শেষে রচনা করেন 'মানাযির আল আলম' (পৃথিবীর বিবরণ)। বস্তুত এর পরও নতুন নতুন অভিযান এবং অনুসন্ধান চলতে থাকলেও ইউরোপীয় উপনিবেশবাদের আবির্ভাবের সাথে সাথে মুসলিম জগতে ভূগোল শিক্ষার আলো নির্বাপিত হয়ে যায়।

তথ্যসূত্র

১. বিস্তারিতভাবে জানার জন্য ৬ষ্ঠ অধ্যায় দেখুন।
২. তু,'তাহদিদ আল নিহায়াত আল আমাকিন' পূর্বোক্ত, ইসলামিক কালচার, খ-৮ (১৯৩৪) পৃ. ৫১৭-১৮।
৩. ৭ম অধ্যায় দেখুন।
৪. তু, 'হিস্টরী অব মুসলিম ফিলসফি' ওয়াইজব্যাডেন, খ-২, পৃ. ১২৫৭।
৫. Universal History (চিরন্তন ইতিহাস) এর প্রথম খণ্ড এবং ভূমিকা 'মুকাদ্দিমাহ' নামে পরিচিত। মূলত ইবনে খালদূন তাঁর রচিত ইতিহাস গ্রন্থকে ভূমিকাসহ তিনটি খণ্ডে বিভক্ত করেছেন। প্রথম খণ্ডে রয়েছে তাঁর নতুন সংস্কৃতি বিজ্ঞান এবং দ্বিতীয় খণ্ডে রয়েছে আরব জাতি ও অন্যান্য জাতির ইতিহাস।
৬. দেখুন, নাফিস আহমদ রচিত 'Some Contributions to Geography by Spanish Muslims, Publicationes de la Real Sociedad Geografica, সিরিজ-বি, নুমেরু ২৯৫, মাদ্রিদ, ১৯৫৩।
৯. History of Muslim Philosophy খ-২, ওয়াইজব্যাডেন, ১৯৬৬, পৃ. ১২১৫।

www.waytojannah.com

পঞ্চম অধ্যায়

ভূগোলের সাথে সম্পর্কিত জ্যোতির্বিজ্ঞান ও গণিত বিষয়ক রচনাবলী

জ্যোতির্বিজ্ঞানের প্রতি আগ্রহ আরবদের ঐতিহ্যের অন্তর্গত। তাদের চারপাশের পরিবেশ নিত্যনৈমিত্তিক সফর ও ব্যবসা বাণিজ্যের জন্য ব্যবহারিক প্রয়োজনেই তাদের এই কৌতূহলের উৎপত্তি। কিন্তু ইসলামের আবির্ভাবের সাথে সাথে ধর্মীয় ও প্রশাসনিক প্রয়োজনে জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ক জ্ঞানের প্রয়োগ অপরিহার্য হয়ে পড়ে। অনুবাদের মাধ্যমে জ্ঞান আহরণের প্রাথমিক যুগে মুসলমানরা গণিত ও জ্যোতির্বিজ্ঞানে গ্রীকদের উৎকর্ষ দেখে অনুপ্রাণিত হয়েছিল। এর অল্প কিছু পরেই ইসলামী দুনিয়ার বিভিন্ন অংশে মুসলমানরা জ্যোতির্বিদ্যা বিষয়ক বিভিন্ন নকসা ও ছক প্রণয়ন করা, বিভিন্ন স্থানের অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমাংশ নিরূপণ করা এবং মক্কা ও মদীনার অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমাংশভিত্তিক অবস্থান নিরূপণে ব্যাপকভাবে মনোনিবেশ করে। খলীফা আল মামুন কর্তৃক নিয়োজিত বিজ্ঞানীদের দ্বারা পরিচালিত ব্যাপক জরীপ ও মাঠভিত্তিক অনুসন্ধান কার্যক্রম এবং সিরিয়ার তাদমুর অঞ্চলের সমতল এলাকায় স্থাপিত গবেষণা কেন্দ্রে প্রচুর মানচিত্র অংকনের ফলে আব্বাসীয় খিলাফতের প্রথম দিকে ভূগোলকের আকার নিরূপণ সংক্রান্ত প্রচেষ্টার সূচনা হয়। এ ছাড়া রাজস্ব ও কর আদায়ের প্রয়োজনেও ভূমি জরীপের কাজ সম্পাদিত হয়। জ্যোতির্বিজ্ঞানের তাত্ত্বিক চর্চার পাশাপাশি চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণ, জোয়ার-ভাটা, পৃথিবীর আকার-আকৃতি, এর চলাচল ও বৈশিষ্ট্য, পরিমাপ এবং হিসাব সম্পর্কিত গবেষণাও চলতে থাকে। ভূগোল বিজ্ঞানীগণ পুরো শতাব্দী জুড়ে এ সকল বিষয়ে তাঁদের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখেন। এ সম্পর্কিত একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ এখানে উপস্থাপিত হলো।

বায়তুল হিকমাহ প্রতিষ্ঠিত হওয়া এবং খিলাফতের পৃষ্ঠপোষকতার কারণে স্বভাবতই বাগদাদ এ সকল বৈজ্ঞানিক কর্মকাণ্ডকে বেগবান করার ক্ষেত্রে সূচনাস্থল হিসাবে ভূমিকা পালন করে। কিন্তু সময়ের আবর্তনে একদিকে মধ্য এশিয়া থেকে

www.waytojannah.com

কায়রো পর্যন্ত, অন্যদিকে মাগরিব (উত্তর আফ্রিকা) এবং আন্দালুসিয়া (স্পেন) পর্যন্ত প্রধান প্রধান আঞ্চলিক ও প্রাদেশিক রাজধানীতে প্রতিষ্ঠিত এরূপ কেন্দ্রসমূহও প্রসিদ্ধি লাভ করতে থাকে। এমনকি পরবর্তীকালে তাতারী দুর্যোগ নিজে থেকে শেষ হয়ে যাওয়ার পর ইসলাম গ্রহণকারী মঙ্গোলীয় রাজপুরুষ ও অভিজাতরা এ সকল বিজ্ঞানের চর্চায় ব্যাপক সহযোগিতা ও পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করে।

এ সকল রচনাকর্মের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো এগুলোতে শুধুমাত্র তত্ত্বগত ধারণা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়নি বরং নির্ভুলভাবে পর্যবেক্ষণও করা হয়েছে। সরেজেমিনে পরিমাপ গ্রহণ ও পর্যবেক্ষণ এই উভয় প্রকার প্রচেষ্টার মাধ্যমে ফলাফল নিরূপণ করতে গিয়ে নতুন ধারণার উন্মেষ হওয়ার পাশাপাশি অতীতের কিছু কিছু ভুলেরও সংশোধন করা হয়েছে। এ সকল অব্যাহত কর্মকাণ্ডের আরেকটি বৈশিষ্ট্য ছিল মানসম্মত যন্ত্রপাতির সচরাচর ব্যবহার, যার কিছু কিছু যন্ত্রপাতি নতুনভাবে তৈরী করা হয়েছিল। সাধারণত যে সকল বিষয় নিয়ে চর্চা করা হতো তার মধ্যে রয়েছেঃ[১] দুটি নির্দিষ্ট কেন্দ্রের মধ্যবর্তী দূরত্ব পরিমাপ করা, অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমাংশ নিরূপণ করা, লেভেলিং ও উচ্চতার পরিমাপ করা, ভূগোলেকের আকার সম্পর্কিত পরিমাপ করা এবং মক্কাসহ অন্যান্য পবিত্র স্থানের অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমাংশভিত্তিক অবস্থান নিরূপণ করা।

পূর্ববর্তী যুগের চিন্তাধারাসমূহের উত্তরাধিকার পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে খ্রিস্টীয় অষ্টম শতাব্দীর তিন-চতুর্থাংশ সময় অতিবাহিত হওয়ার পর গ্রীক, পারসিক ও ভারতীয় (হিন্দু)-দের দ্বারা রচিত মৌলিক গ্রন্থাবলী বাগদাদে সহজ প্রাপ্য ছিল। উদাহরণস্বরূপ 'সিন্দ-হিন্দ' (ব্রহ্মগুপ্ত রচিত 'সিদ্ধান্ত') এবং 'আরকান্দ' (খন্দ-খাদকা) বাগদাদে নিয়ে আসা হয়। অতঃপর আল ফাযারী এবং ইয়াকুব ইবনে তারিক এগুলোর আরবী অনুবাদ করেন। তাদেরকে এ কাজে সহায়তা করার জন্য কিছু সংখ্যক ভারতীয় পণ্ডিত সম্ভবত মানকাহ এবং ইবনে দাহা নগরীতে এসে পৌঁছেন। বস্তুত এটা ঐতিহাসিক সত্য যে গ্রীক সাহিত্যেরও আগে ভারতীয় এবং ফার্সী সাহিত্য তাঁদের হাতে আসে এবং এর চর্চা হতে থাকে। এদিক থেকে খলীফা আল মামুনের শাসনকাল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর পৃষ্ঠপোষকতা ও উদারতার ফলে মুসলমান চিন্তাবিদগণের মধ্যে সার্বিকভাবে বিজ্ঞান চিন্তার সূচনা হয় এবং বিশেষ করে ভূগোলকের আকার পরিমাপ বিষয়ক গণিতবিদ্যা ও গাণিতিক ভূগোলের বিকাশ ঘটে। কথিত আছে যে, আল মামুন বাইজেন্টাইন সম্রাটকে অনুরোধ করেছিলেন যে বিখ্যাত পণ্ডিত লিউকে তাঁর দরবারে প্রেরণ করা হলে বিনিময়ে পাঁচ টন স্বর্ণ এবং দুই শাসকের মধ্যে দীর্ঘ মেয়াদী শান্তিচুক্তি সম্পাদন করা হবে।[২] প্রথম পর্যায়ে ভূগোল বিষয়ক জ্যোতির্বিজ্ঞান

www.waytojannah.com

ও গণিতে আরবদের জ্ঞানচর্চার একটি ব্যাপক অংশ নিবেদিত হয়েছিল ক্লডিয়াস টলেমী রচিত আলমাজেস্ট (আলমাজিসতি) ও ভূগোলকে কেন্দ্র করে। কিন্তু যতই সময় অতিবাহিত হতে লাগলো ততই টলেমীর সিদ্ধান্তসমূহ চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হলো এবং নতুন নতুন সংশোধনীসমূহের আবির্ভাব ঘটতে থাকলো।

মুসলিম গাণিতিক-জ্যোতির্বিজ্ঞানের দুটি দিক রয়েছে, যার ভিত্তিতে গাণিতিক ভূগোলের বিকাশ ঘটেছে। প্রথমত জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ক পর্যবেক্ষণগুলো তাঁরা তাঁদের গ্রহ নক্ষত্র বিষয়ক জ্ঞানের বিকাশ[৩] এবং এ সংক্রান্ত ছক (যিজ) ও পঞ্জিকা প্রণয়নের প্রয়োজনেই করেছিলেন। এই প্রচেষ্টাসমূহের আরেকটি দিক ছিল-অসংখ্য স্থান ও শহরের অক্ষাংশ এবং দ্রাঘিমাংশ নির্ণয় করা, পূর্ববর্তী হিসাবসমূহের ত্রুটি সংশোধন করা। এর সাথে যুক্ত হয় ভূগোলকের পরিমাপ গ্রহণের প্রয়োজনে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানের দূরত্ব পরিমাপ করার কাজ। এর ফলে অবশ্য মানচিত্র অংকনের কাজও চলতে থাকে।[৪]

এই কর্মকাণ্ডের একটি আবশ্যকীয় অনুষঙ্গ ছিল বিভিন্ন স্থানে মানমন্দির ও পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা, প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির আবিষ্কার ও তার ব্যবহার করা। বিভিন্ন সময়ে ইসলামী দুনিয়ার বেশ কয়েকটি স্থানে মানমন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং এ সকল গাণিতিক ও জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ক কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন যন্ত্রপাতির পূর্ণাঙ্গতা দান করা হয়। রাযীউদ্দীন সিদ্দিকী নামে একজন আধুনিক গণিতবিদ[৫] এরূপ ষোলটি মানমন্দির ও বিভিন্ন যন্ত্রপাতির তালিকা প্রণয়ন করেছেন। ইসলাম-পূর্ব যুগে একমাত্র মানমন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল মিশরের আলেজান্দ্রিয়ায়, যা বেশি দিন কার্যকর ছিল না।

মানমন্দিরসমূহ

১. হিজরী ২১৪/খ্রিস্টাব্দ ৮২৯ ইরাকে আল মামুন কর্তৃক নির্মিত সৌর মানমন্দির।
২. ইস্পাহানে হানিফা আল দিনাওয়ার (মৃ. ২৮২/৮৯৫) কর্তৃক নির্মিত মানমন্দির।
৩. আল বিরুনী নির্মিত খাওয়ারিযম মানমন্দির।
৪. ছাবিত বিন কুররা নির্মিত বাগদাদ মানমন্দির।
৫. খলীফা আল মুসতারশিদ-এর মানমন্দির, যেখানে বিখ্যাত জ্যোতির্বিজ্ঞানী বদিউদ্দিন কাজ করেছিলেন।
৬. ইবনে সীনার মানমন্দির।
৭. আল রাক্কাহ এবং আনতাকিয়া মানমন্দির, যেখানে আল বাত্তানী ২৬৪–৩০৬/৮৭৭–৯১৮ সময় পর্যন্ত কাজ করেছিলেন।
৮. বাগদাদে বানু মূসা কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত – আল 'তাক' মানমন্দির।
৯. সিরাজ নগরীতে নির্মিত সরফুদ্দৌলা মানমন্দির, যেখানে আল সাঘানী ও আল কুহি কাজ করেছিলেন।

www.waytojannah.com

১০. আবূ ইসহাক নির্মিত তাবিতালা মানমন্দির।
১১. বুযজান মানমন্দির, যেখানে আবুল ওয়াফা তাঁর বেশীর ভাগ কাজ সম্পাদন করেছিলেন।
১২. বাগদাদের ইবনুল আলম মানমন্দির (৩৫১–৩৫২/৯৬২ –৯৬৩)।
১৩. ইবনে ইউনুস-এর মিসরীয় মানমন্দির, যেখান থেকে তার আল মানিক প্রস্তুত করা হয়েছিল।
১৪. নাসিরুদ্দিন তুসির (৬৫৮/১২৫৯) মারাঘা মানমন্দির।
১৫. তাকিউদ্দিনের মানমন্দির।
১৬. তৈমুর-এর নাতি উলুগ বেগ মির্যা (৮২৩/১৪২০) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত সমরকন্দ মানমন্দির।

পরবর্তীকালে আরো কিছু সংখ্যক মানমন্দির নির্মিত হয়েছিল, তন্মধ্যে ভারতের কাশ্মীর, দিল্লী, হায়দরাবাদ ও দাক্ষিণাত্যে প্রতিষ্ঠিত মানমন্দির উল্লেখযোগ্য।

যন্ত্রপাতিসমূহ

লিবনাহ (Libnah)
হালকাহ ইতিদাল (Meridian circle)
দাহত আল অতার (Daht al Autar)
ধাত্ আল আল্ক (Dhat al Alq)
ধাত্ আল সামত ওয়াল ইরতিফা (Dhat al Samt wal-Irtifa)
ধাত্ আল শূ'বাতাইন (Dhat al-Shubatain) আকাশের বস্তুসমূহের উচ্চতা পরিমাপের জন্য।
ধাত আল জাইব (Dhat al Jaib) (উচ্চতা পরিমাপের জন্য)
আল মুশাব্বাহ বি আল নাতিক (Al Mushabbah bi-al-Natiq)
তাবাক আল মানাতিক (Tabaq al Manatiq) চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণ সংক্রান্ত পর্যবেক্ষণের কাজে ব্যবহৃত হতো।
স্পেনের যারকালাহ (Zarqalah) মহাকাশের বস্তুর গতিবিধি পর্যবেক্ষণের জন্য।
বদিউদ্দীনের ধাত্ আল কুরসি (Dhat al-kursi)
কাশফ আল যানুন বর্ণিত বিভিন্ন প্রকারের কোয়াড্রেন্ট (quadrent)
এ্যাস্ট্রল্যাব সারতানি মিজনাহ (Astrolabe Sartani Mijnah)
সুদসী ফখরী (এক ধরনের স্যাক্সটেন্ট)
ম্যাগনেটিক কম্পাস (Magnetic Compass) ও অন্যান্য উপকরণ।

ইসলামী দুনিয়ার[৬] কিছু সংখ্যক কেন্দ্রের বৈজ্ঞানিক কার্যক্রম নিম্নে বর্ণিত ধারাক্রম অনুসারে ও অঞ্চলভিত্তিতে উপস্থাপন করা হলো।

www.waytojannah.com

Contents

জুন্দী শাপুর (ইরান) এবং বাগদাদ

বায়তুল হিকমায় অনুবাদ কর্মের প্রাথমিক যুগ শেষ হওয়ার পর গ্রীক ও প্রাচ্য দেশীয় রচনাবলীর প্রভাব গাণিতিক জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ক রচনাবলীতে ব্যাপকভাবে প্রতিফলিত হতে দেখা যায় এবং এর ফলে মানমন্দিরসমূহ প্রতিষ্ঠা ও যন্ত্রপাতির ব্যবহার শুরু হয়। বস্তুত আব্বাসীয় খিলাফতের প্রথম দিকে খলীফাগণের উদারতা ও পৃষ্ঠপোষকতার কারণে এ সকল বৈজ্ঞানিক কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন সম্ভব হয়। ভূগোলের ক্ষেত্রে এর প্রয়োগ ঘটে পৃথিবীর আকার-আকৃতি নিরূপণ করা, অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমাংশ পরিমাপ করা, ভূগোলকের আকৃতি সম্পর্কিত পরিমাপ গ্রহণ করা এবং বিভিন্ন প্রকারের মানচিত্র ও চার্ট প্রস্তুতকরণের মধ্য দিয়ে। মূলত জ্যোতির্বিজ্ঞানীগণ এ সময়ে নক্ষত্র বিষয়ক ছকের উৎকর্ষ সাধন করেন এবং মহাকাশের গঠনবিন্যাস বিষয়ে গবেষণা করেন।

আহমদ আল নাহাওয়ান্দী (৮০৩ খ্রি.) জুন্দী শাপুর-এ কাজ করেছিলেন এবং বিখ্যাত 'আল যিজ আল মুশতামিল' (সাধারণ ছক) প্রস্তুত করেন। বাগদাদ এবং দামেস্কে মানমন্দির প্রতিষ্ঠা করা ছিল অগ্রগতির পথে এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ, ফলে সেখানে বৈজ্ঞানিক কার্যাবলী পরিচালনার ক্ষেত্রে ঐতিহ্য রচিত হয়। পরবর্তী প্রজন্মের বিজ্ঞানীদের মাধ্যমে এর ধারাবাহিকতাও সংরক্ষিত হয়েছিল। বাগদাদে প্রাথমিক যুগের পথিকৃতদের মধ্যে কয়েকজনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁরা হলেন ইয়াকুব বিন ইসহাক আল কিন্দি (৮১৩-৮৭০ খ্রি.), আল মা'শার (মৃ. ৮৮৬ খ্রি.), মুহাম্মদ বিন মূসা আল খাওয়ারিযমী (মৃ. ৮৩৫ খ্রি.) এবং আল ফারঘানী (মৃ. ৮৬১ খ্রি.)। এ সকল বিজ্ঞানী আরবী, সিরিয়াক, গ্রীক, ফারসী ও সংস্কৃত সহ কয়েকটি ভাষায় পারদর্শী ছিলেন।

আল খাওয়ারিযমী (মৃ. ৮৩৫ খ্রি.) গ্রীক ও ভারতীয় উৎস ব্যবহার করে শুধুমাত্র তাঁর 'কিতাবুল যিজ' এবং 'কিতাব সুরাতুল আরদ' (পৃথিবীর চেহারা)-ই রচনা করেন নি। তিনি এ্যাস্ট্রল্যাব সম্পর্কেও একখানা কিতাব রচনা করেছিলেন। তিনি খলীফা আল মামুনের সময়ে ভূগোলকের পরিমাপ বিষয়ক (geodetic) কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেছিলেন। কাছির আল ফারঘানীও (৮৩১-৮৬১ খ্রি.) এ্যাস্ট্রল্যাব সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। এ ছাড়া তিনি সূর্যঘড়ি এবং ছক তৈরী করেছিলেন। আল কিন্দি (৮৩১-৮৭০ খ্রি.) ছিলেন প্রচুর সংখ্যক গ্রন্থের রচয়িতা। তিনি কয়েক ডজন গ্রন্থ রচনা করেছিলেন (কমপক্ষে ২০০), যার মধ্যে অল্প কিছু সংখ্যক গ্রন্থ এখনো অটুট আছে। তাঁর রচনাবলীর মধ্যে অধিকতর ভৌগোলিক উপাদান সমৃদ্ধ গ্রন্থাবলী হচ্ছে[৭] 'আল রিসালা আল কুবরা ফিরুব আল মাসকুন', 'আল রিসালাত আল কুবরা ফি ইল্লাত আল মাদদি ওয়াল জায়ার' এবং 'রিসাল্লাতু রাসম আল মা'মুর মিনাল আরদ'। আবু মাশার

www.waytojannah.com

Contents

আল বালখী ছিলেন (ইউরোপে আল-বুমাসের–Al Bumaser নামে পরিচিত) জ্যোতির্বিজ্ঞান ও গণিতের বিশারদ ব্যক্তিত্ব। তিনি বহুবিধ ভাষা জানতেন। জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্পর্কিত তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ কিতাব মুদখাল আল কবির' ছাড়াও তিনি বিভিন্ন সাগর ও স্রোতধারাসমূহ এবং মৌসুমী বায়ু সম্পর্কে গ্রন্থ রচনা করেছেন। ইংলন্ডের রজার বেকন সহ মধ্যযুগের বিভিন্ন পণ্ডিতের লেখনীতে তাঁর জ্ঞানের প্রভাব লক্ষ্য করা গেছে। ইয়াহইয়া বিন আবি মনসুর (৮৩১ খ্রিস্টাব্দ) সহ আরো কয়েকজন গবেষকের প্রচেষ্টায় 'সত্যায়িত ছক' (Verified tables –আল যিজ আল মামুনী আল মুমতাহিন) প্রণীত হয়েছিল। আল মাহানী (৮৫৪-৬৮ খ্রিস্টাব্দ) সূর্যগ্রহণ, চন্দ্রগ্রহণ ও গ্রহপুঞ্জের সংযোগস্থল বিষয়ে গবেষণা করেন।

খলীফা আল মামুনের নির্দেশে কিছু সংখ্যক জ্যোতির্বিজ্ঞানী ও ভূগোলবিদের প্রচেষ্টায় ঐ সময়ে পৃথিবীর বিখ্যাত মানচিত্র প্রণয়ন করা হয়। দুঃখের বিষয়, সেই মানচিত্র এখন আর পাওয়া যায় না। এ সময়ের আরেকটি উল্লেখযোগ্য অবদান হলো এক ডিগ্রি অক্ষাংশের পরিমাপ নির্ণয় করা। (পরবর্তী আলোচনায় দেখুন)

মূসা বিন শাকির-এর তিন পুত্র মুহাম্মদ, আহমদ এবং হাসান ছিলেন মহান ও নিষ্ঠাবান জ্যোতির্বিজ্ঞানী। বাগদাদে অবস্থিত তাঁদের প্রসিদ্ধ মানমন্দির 'বাব আল তাক'-এ তাঁরা ৮৫০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ৮৭০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে পর্যবেক্ষণ কার্য পরিচালনা করেন। তাঁদের প্রণীত এ সংক্রান্ত ছক ইসলামী দুনিয়ায় আদর্শ নমুনা হিসেবে পরিগণিত হয়। আল বাত্তানী (মৃ. ৯২৯) ৮৭৭ খ্রিস্টাব্দ থেকে ৯১৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত রাক্কায় তাঁর পথিকৃতসুলভ কাজে নিয়োজিত ছিলেন। তিনি তাঁর সময় পর্যন্ত জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ক রচনাবলীর সারসংক্ষেপ প্রণয়ন করেন। এ কাজের মাধ্যমে তিনি আরব বিশ্বে টলেমীর অনুরূপ ভূমিকা পালন করেন। তাঁর এই রচনাকর্মের ল্যাটিন অনুবাদ ইউরোপে বেশ জনপ্রিয়তা অর্জন করে এবং অত্যন্ত উঁচুমানের কাজ হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করে। বাগদাদে প্রাথমিক যুগের অন্যান্য জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের মধ্যে ছাবিত বিন কুররা (মৃ. ৮১৩) এবং হাবাশ আল হাসিব উল্লেখযোগ্য।

খ্রিস্টীয় দশম শতাব্দীর শেষাংশে অন্যান্য জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের মধ্যে যারা বাগদাদে কাজ করেছিলেন তাঁরা হলেন ইবনুল আলম (মৃ. ৯৮৮ খ্রি.), আবদুর রহমান আল সুফী (মৃ. ৯৮৬ খ্রি.)। অপরদিকে আদুদ আল দাওলাহ এবং শারফুদ্দৌলাহ-এর শাসনামলে বুওয়াহিদ রাজদরবারে পৃষ্ঠপোষকতায় যে সকল পণ্ডিত কাজ করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন আল কুহি (মৃ. ১০০৪ খ্রি.) এবং আবুল ওয়াফা। আবুল ওয়াফা টলেমীর চাঁদ বিষয়ক অসম্পূর্ণতা সম্পর্কে গবেষণা করেন।

আরো যাঁরা পর্যবেক্ষণ কার্যক্রমের পাশাপাশি নিজেরা যন্ত্রপাতিও প্রস্তুত করেছিলেন, তাঁরা হলেন আল খুজান্দি (৯৯২ খ্রি.), হারুন বিন আলী এবং আবূ

www.waytojannah.com

ইসহাক। সুতরাং বলা যায় আব্বাসীয় খিলাফতের পতন না হওয়া পর্যন্ত দুইশত বছরেরও বেশি সময় ধরে বাগদাদ জ্যোতির্বিজ্ঞান ও গাণিতিক ভূগোলের প্রধান কেন্দ্র হিসেবে ভূমিকা পালন করে।

মিশর-কায়রো

কায়রোর ফাতিমী খলীফাগণ সকল প্রকার বৈজ্ঞানিক কর্মকাণ্ডের প্রধান পৃষ্ঠপোষকে পরিণত হন এবং এ সকল কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রস্থল মিশরে স্থানান্তরিত হয়। দু'জন মহান খলিফা আল আযিয এবং আল হাকিম জ্যোতির্বিজ্ঞান, পৃথিবীর আকার ও পরিমাপ বিষয়ক বিজ্ঞানের বিকাশের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। আল আযিয ছিলেন হিজরী ৩৭৫/৯৯৬ খ্রিস্টাব্দে স্থাপিত বিখ্যাত কায়রো মানমন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা। এই সেই স্থান, যেখানে সর্বজনশ্রদ্ধেয় ইবনে ইউসুফ (মৃত্যু ১০০৯ খ্রিস্টাব্দ) আল মুকাত্তাম পাহাড়ে অবস্থিত মানমন্দির থেকে পর্যবেক্ষণ করেছেন এবং হাকিমী ছক (যিজ আল হাকিম) প্রণয়ন করেছেন। যে ছক তার নির্ভুলতা এবং পূর্ণাঙ্গতার কারণে প্রাচ্য এবং মধ্যযুগীয় ইউরোপে ইতোপূর্বে প্রণীত সকল ছকের শীর্ষে স্থান দখল করে নেয়। বিখ্যাত পদার্থবিজ্ঞানী, প্রকৌশলী, গণিতবিদ ও আলোকবিজ্ঞানী ইবনুল হায়সাম এখানে আসতে এবং নিজ ধ্যান-ধারণার ভিত্তিতে কাজ করতে আগ্রহী হয়েছিলেন।

প্রাচ্য

বিজ্ঞানী ও ভূগোলবিদ হিসেবে আবূ রায়হান আল বিরুনীর মেধা ও দক্ষতা সম্পর্কে পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে। গাণিতিক-জ্যোতির্বিজ্ঞানী হিসেবে তিনি ছিলেন তাঁর সময়ের একজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিত্ব। তিনি শুধু পর্যবেক্ষণ ও তাত্ত্বিক হিসাব-নিকাশের ব্যাপারেই আগ্রহী ছিলেন না বরং তিনি খাওয়ারিযম ও ভারতে পৃথিবীর আকার ও পরিমাপ বিষয়ক কার্যক্রম সংগঠন ও বাস্তবায়নে নিয়োজিত হয়েছিলেন। ভারতে এবং অন্যান্য স্থানে অর্জিত অভিজ্ঞতা পরিপক্কতা লাভ করার পর ১০৩৮ খ্রিস্টাব্দে গজনীতে তাঁর বিখ্যাত 'ক্যানন মাসুডিকাস' (আল কানুন আল মাসউদী) রচনা করেন। সুলতান মাহমুদের পুত্র সুলতান মাসুদ-এর নামে এই কিতাব উৎসর্গ করা হয়। এটি একটি উল্লেখযোগ্য জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ। তবে এতে তাঁর বিভিন্নমুখী চিন্তাভাবনার প্রতিফলনও দেখা যায় তাঁর অন্যান্য আরো কয়েকটি সুপরিচিত গ্রন্থে। যেমন 'কিতাব মা'ফিল হিন্দ' (ভারত), 'কিতাব আল তাফহীম আল আওয়াইল সানাআত আল তানজিম' এবং 'প্রাচীন জাতিসমূহের ইতিহাস' (আল আছার আল বাকিয়াহ)। কথিত আছে যে, আল বিরুনী কমপক্ষে পনেরখানা গ্রন্থ রচনা করেছিলেন এবং পৃথিবীর আকার ও পরিমাপ বিষয়ক গবেষণা করেছিলেন,অক্ষাংশ ও

www.waytojannah.com

দ্রাঘিমাংশের পরিমাপ গ্রহণ করেছিলেন, বিভিন্ন ধরনের যন্ত্রপাতি নির্মাণ ও ব্যবহার করেছিলেন।

আল বিরুনী ভারতের পাঞ্জাবে অবস্থিত ঝিলাম জেলায় অবস্থানকালে ব্যক্তিগতভাবে ভূগোলকের পরিমাপ গ্রহণ কাজে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। তিনি পৃথিবীর অক্ষরেখা, গতিপথ ও চলাচল সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমাংশ নিরূপণের জন্য অনুসৃত ভারতীয় (হিন্দু) পদ্ধতির প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যকে তিনি সংক্ষেপিত করেন ও সারাংশ প্রস্তুত করেন। তিনি সর্বপ্রথম পৃথিবী যে তার অক্ষরেখায় আবর্তিত হয়, সে সম্পর্কে কানুন আল মাসউদী গ্রন্থে আলোচনা করেন। তিনি ব্যাখ্যা করেন পৃথিবী নিজ অক্ষের উপর আবর্তিত হওয়ার কারণে কিভাবে গ্রহ-নক্ষত্রের উদয় ও অস্ত দৃষ্টিগোচর হয়। 'পৃথিবী সূর্যের চারদিকে ঘুরে'—এই ধারণার ভিত্তিতে তিনি সূর্যকেন্দ্রিক তাঁর তত্ত্ব এবং গ্রহসমূহের উপবৃত্তাকার কক্ষপথ সম্পর্কিত তত্ত্বের প্রায় কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছিলেন। আল বিরুনী ত্রিমাত্রিক প্রজেকশনের পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছিলেন। এভাবে তিনি নিজেকে একজন মহান গাণিতিক-ভূগোলবিদ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেন।

আল বিরুনীর সমসাময়িক আরেকজন উঁচুমানের পণ্ডিত ছিলেন আবূ আলী সিনা, যিনি প্রাচ্যে ইবনে সিনা (মৃত্যু ১০৩৬ খ্রিস্টাব্দ) এবং পাশ্চাত্যে আভেসিনা নামে ব্যাপকভাবে পরিচিত ছিলেন। তিনি ছিলেন মধ্যযুগের শ্রেষ্ঠতম দার্শনিক। কিন্তু বিজ্ঞান সম্পর্কে তাঁর কৌতূহল ছিল বহুমুখী। জ্যোতির্বিজ্ঞান ও পদার্থবিজ্ঞান সম্পর্কে ছিল তাঁর গভীর আগ্রহ।

বিশ্বজগত, মহাকাশের গ্রহ-নক্ষত্র এবং বিষুব রেখার মতো বিষয়াবলী নিয়ে তিনি লেখালেখি করেছেন। ইবনে সিনা টলেমী রচিত 'আল মাজেস্ট'-এর উপর সমীক্ষা রচনা করেন এবং বিভিন্ন যন্ত্রপাতির ব্যবহার সম্পর্কে প্রবন্ধাবলী রচনা করেন।

ওমর খৈয়াম (হিজরী ৪৩০-৫১৭/১০৩৮-১১২৩ খ্রিস্টাব্দ) ছিলেন একজন খাঁটি জ্যোতির্বিজ্ঞানী ও গণিতবিদ। তিনি খুরাসানের নিশাপুর মানমন্দিরে নিরবচ্ছিন্নভাবে গবেষণাকর্ম পরিচালনা করেছিলেন। ১০৭৪ খ্রিস্টাব্দে সুলতান মালিক শাহজাজাল আল দীন সালজুকী রায় নগরীতে তাঁর নবপ্রতিষ্ঠিত মানমন্দিরে পঞ্জিকা সংশোধনের কাজের জন্য তাঁকে আহ্বান জানান। তিনি পঞ্জিকার যে সংশোধন করেন তা ছিল এক অসাধারণ গণিতকর্ম। তাঁর বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ রুবাইয়াত ছিল মূলত জীবনের প্রতি আগ্রহ ও ভাবাবেগ প্রদর্শনের নিমিত্ত নিছক বিনোদনমূলক প্রচেষ্টা মাত্র।

খাজা নাছির উদ্দীন আবূ জাফর বিন মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ বিন হাসান ছিলেন মঙ্গোলীয় আগ্রাসনকালের একজন বিখ্যাত শিয়া রজনীতিবিদ। তিনি তুস নগরীতে

www.waytojannah.com

Contents

(৫৯৭/১২০১) জন্ম গ্রহণ করেন। ১২৫৬ খ্রিস্টাব্দে তুসী হালাকু খানের বন্ধু হিসেবে পরিগণিত হন। তিনি ১২৫৯ খ্রিস্টাব্দে আজারবাইজানের উরমিয়াহ্ হ্রদের তীরে মারাঘা নামক স্থানে বিখ্যাত মানমন্দির (রাসাদখানা) প্রতিষ্ঠা করার জন্য হালাকু খানকে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। তিনি 'যিজ আল ইলখানী' প্রণয়ন করেন এবং মারাঘা মানমন্দিরে বুদ্ধিজীবীদের একটি নিয়মিত পাঠচক্র প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। উক্ত মানমন্দিরের সাথে ছিল একটি বৃহৎ পাঠাগার, যাতে পুস্তক সংখ্যা ছিল চার লাখেরও অধিক। তুসী হিজরী ৬৭২/১২৭৪ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন। কিন্তু মারাঘাতে যে জ্ঞানচর্চা ও গবেষণার সূচনা হয়েছিল, তা পরবর্তী কয়েকটি প্রজন্ম ধরে চলতে থাকে।

আল তুসী তৎসময়ে খুরাসান, বাগদাদ, মসুল এবং সিরিয়াতে যতগুলো বিখ্যাত গ্রন্থ পাওয়া সম্ভব ছিল, তার সবই সংগ্রহ করেছিলেন। তাঁর সূচিত কার্যক্রম বার বছর ধরে পূর্ণোদ্যমে চলতে থাকে এবং এই কার্যক্রমের সাথে নিযামউদ্দীন কাযভিনি মুয়াইয়াদ আল দীন, মহিউদ্দীন, ফখরুদ্দীন সহ আরো অনেক জ্যোতির্বিজ্ঞানী সম্পৃক্ত হয়েছিলেন। যদিও ইবনে ইউনুস কর্তৃক প্রণীত যিজ (ছক) ইলখানী যিজ-এর ভিত্তিতে প্রণীত হয়েছিল, তথাপি সেগুলোকে পুনরায় সংশোধনের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয়। আল তুসী-র ছাত্র কুতুব উদ্দীন মাহমুদ আশ শিরাযী তাঁর গবেষণাকর্ম অব্যাহত রাখেন। বলা হয়ে থাকে যে, কিছুসংখ্যক চীন দেশীয় বিজ্ঞানী নাসির উদ্দীনের অধীনে কাজ করেছিলেন। এ থেকে চীন ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে মুসলিম বিজ্ঞানীদের চিন্তাধারার প্রভাব সম্পর্কে ধারণা করা যায়। তৈমুর-এর দৌহিত্র মির্যা উলুগ বেগ (হিজরী ৯৯৬/১৩৯৩ খ্রিস্টাব্দ থেকে হিজরী ৮৫৩/১৪৪৯ খ্রিস্টাব্দ ছিলেন একজন নিষ্ঠাবান জ্যোতির্বিজ্ঞানী। তিনি জ্ঞানের এ শাখায় নিয়োজিত শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গকে সমরকন্দে তাঁর পাশে সমবেত করেন। এঁদের মধ্যে ছিলেন জামশেদ আল কাশী, কাযীযাদে রুমী এবং মুইনউদ্দীন কাশানী ১৪২০ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত তাঁর মানমন্দিরে বহু পর্যবেক্ষণ ও গবেষণা কার্য সম্পাদন করা হয় এবং সুলতান নিজেই ১৪৩৭ খ্রিস্টাব্দে তাঁর বিখ্যাত ছক (যিজ জাদিদ আল সুলতানী) সম্পাদনা করেন। এতে পৃথিবীর বড় বড় নগরীসমূহের নিরূপিত অক্ষাংশের একটি তালিকা সংযোজিত আছে। এই মানমন্দিরে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি ছিল ঐ সময়ের শ্রেষ্ঠ যন্ত্রপাতি।

স্পেন ও মাগরিব

গাণিতিক জ্যোতির্বিজ্ঞানের চর্চার ক্ষেত্রে স্পেন ছিল বৈজ্ঞানিক ক্রিয়াকর্মের লালনক্ষেত্র। কর্ডোভা, সেভিল, টলেডো এবং গ্রানাডা ছিল স্পেনের প্রধান কেন্দ্র। অপরদিকে তানজিয়ার, সিওটা, ফেয এবং মরক্কো উত্তর আফ্রিকার কেন্দ্র হিসেবে গড়ে উঠে। এটা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক যে, খ্রিস্টীয় দশম শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে তৎপরবর্তীকালে বিজয়ী শক্তির বর্বর কর্মকাণ্ডের ফলে বহু গ্রন্থ হারিয়ে যায়।

www.waytojannah.com

Contents

দশম আলফনসো (খ্রিস্টাব্দ ১২৫২-১২৮২)-এর শাসনামলে স্পেনিশ ও ল্যাটিন ভাষায় বহু গ্রন্থ অনূদিত হলেও সেগুলোর মুসলিম উৎস স্বীকার করা হয়নি অথবা সংশ্লিষ্ট লেখক ও পণ্ডিতের নাম উল্লেখ করা হয়নি, এমনকি বিষয়বস্তুরও চরম বিকৃতি ঘটানো হয়।

আল মাররাকুশি (১২৩০ খ্রিস্টাব্দ) ১৩৫টি স্থানের অক্ষাংশ দ্রাঘিমাংশ ভিত্তিক অবস্থান নির্ধারণ করেছিলেন, তন্মধ্যে চৌত্রিশটি স্থানের কাজ তিনি নিজেই করেছিলেন। তিনি উত্তর আফ্রিকা থেকে স্পেন সফর করেছিলেন এবং মেরু থেকে একচল্লিশটি নগরীর উচ্চতা নিরূপণ করেছিলেন। মাসলামা আল মাজরিতি (মৃত্যু ৩৯৮/১০০৭ খ্রিস্টাব্দ) আল বাত্তানী প্রণীত ছকের (যিজ) সারসংক্ষেপ তৈরী করেছিলেন, যার উপর আলফনসাইন ছকের প্রণেতাগণ বিশেষভাবে নির্ভর করেছিলেন। আল যারকালী (আরযাচেল) যিনি টলেডোতে (১০২৯-১০৮৮ খ্রিস্টাব্দ) বসবাস করেছেন এবং সেখানে তাঁর গবেষণা কর্ম পরিচালনা করেছিলেন। তিনি সবচাইতে উত্তম এ্যাস্ট্রল্যাব-এর উদ্ভাবন করেছিলেন এবং তিনিই ছিলেন 'টলেডো ছক'এর প্রণেতা। তিনি এ্যাস্ট্রল্যাবসহ বিভিন্ন প্রকার যন্ত্রপাতির নকশা প্রণয়ন করেছিলেন। তাঁর কিছু কিছু লেখার ল্যাটিন অনুবাদ প্রকাশিত হওয়ার পর তিনি পাশ্চাত্যে ব্যাপক খ্যাতি লাভ করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত তাঁর প্রণীত সকল মূল কিতাব হারিয়ে গেছে। মূলত উইলাম দি ইংলিশম্যান ১২৩১ খ্রিস্টাব্দে যারকালী সম্পর্কে প্রথম লেখালেখি করেন। অন্যান্য বিজ্ঞানীদের মধ্যে ছিলেন সেভিল-এর জাবির বিন আফলাহ (জেবের) (১১৪০-৫০ খ্রিস্টাব্দের কোন এক সময়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন) এবং ইবনে রুশদ (আভেরস) যিনি কর্ডোভায় জন্মগ্রহণ এবং ১১৯৯ খ্রিস্টাব্দে মাররাকুশে মৃত্যুবরণ করেন। তিনি ছিলেন একজন বিখ্যাত দার্শনিক ও বিজ্ঞানী। গ্রহ-নক্ষত্রের গতিবিধি সম্পর্কে এবং টলেমী রচিত 'আলমাজেস্ট'-এর সারসংক্ষেপ সংবলিত গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। ইবনে বাজ্জা (এ্যাভেনপাস) (মৃত্যু ৫৫৩ হিজরী/১১২৯ খ্রিস্টাব্দ) এবং আল বিতরুজি (আল বাতরাজিয়াস) (মৃত্যু ৬০০ হিজরী/১২০৪ খ্রিস্টাব্দ) ছিলেন জ্যোতির্বিজ্ঞান ও ভূগোল বিষয়ে স্পেনদেশীয় লেখকদের অন্যতম। টলেমীর তত্ত্ব সম্পর্কে স্পেন থেকে অনেকগুলো আপত্তি উত্থাপিত হয়েছিল এবং তাঁরা বেশ কিছু সংশোধনীও উত্থাপন করেছিলেন। তানজিয়ার, সিওটা, ফেয ও মরক্কো এ সকল কাজে শরীক হয়েছিল এবং সেখানকার গবেষক ও বিজ্ঞানীগণ ক্লান্তিহীনভাবে এ কাজে উৎসাহ দেখিয়ে গেছেন।

মানমন্দির প্রতিষ্ঠা

বিপুল পরিমাণ বৈজ্ঞানিক তথ্য সংগ্রহ এবং সে ভিত্তিতে রচিত অসাধারণ মানের গ্রন্থাবলী থেকে লব্ধ জ্ঞানকে উন্নত ও আধুনিক যন্ত্রপাতি সমৃদ্ধ মানমন্দিরের সাথে

www.waytojannah.com

সম্পৃক্ত করা হবে এটাই স্বাভাবিক। এ সকল মানমন্দির কখনো কখনো শাসকদের অর্থানুকুল্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আবার কখনো কখনো বিজ্ঞানী বন্ধুর প্রতি অভিজাত শ্রেণীর কারো উদারতার কারণেও মানমন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। খ্রিস্টীয় নবম শতাব্দীর প্রথমার্ধে অনারবদের সাথে সাংস্কৃতিক বিনিময়ের ফলে বিজ্ঞান চর্চার সূত্রপাত তখনো বেশিদূর অগ্রসর হয়নি, তেমনি এক সময়ে জুনদিশাপুর মানমন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এটা ছিল খুজিস্তানের (দক্ষিণ-পশ্চিম ইরান) একটি ছোট্ট শহর। সাসানীয় শাসক প্রথম শাপুর এই মানমন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। পরে এই মানমন্দির আনুশিরওয়ান (৫৫০ খ্রিস্টাব্দ)-এর সময়ে সূচিত বৈজ্ঞানিক কর্মকাণ্ডের উত্তরসুরি হিসেবে ভূমিকা পালন করেছিল। বর্তমানে এই স্থানটিকে শাহাবাদের ধ্বংসাবশেষ-এর সাথে চিহ্নিত করা হয়েছে। যিজ আল মুশতামিল (সাধারণ ছক, ৮০৩ খ্রিস্টাব্দ)-এর সংকলক আল নাহাওয়ান্দী এই মানমন্দিরে কাজ করেছিলেন। জানা যায় সেখানে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি ছিল নিখুঁত। ২১৬ হিজরীতে আল মামুনের সময়ে তাদমুর (পালমিরা)-এর সমতল এলাকায় প্রতিষ্ঠিত বিখ্যাত শামাসিয়া মানমন্দিরে আল মামুন ইয়াহইয়া বিন আবি আল মসনুর, খালিদ বিন আবদুল মালিক মারওয়ারুযী, সিন্দ বিন আলী এবং আব্বাস বিন সাঈদ জোহারী এবং দূর ও কাছে থেকে আগত অন্যান্য আরো অনেক জ্যোতির্বিজ্ঞানী ও গণিতবিদ নিয়োজিত করেছিলেন। আধুনিকতম ও সবচাইতে নিখুঁত যন্ত্রপাতির সাহায্যে এই মানমন্দিরে পর্যবেক্ষণ পরিচালনা করা হয়েছিল, দামেস্ক থেকে দুই মাইল উত্তরে কাসিউন পাহাড়ে আরেকটি রাষ্ট্র পরিচালিত মানমন্দির ছিল। এই দুটি ও অন্যান্য মানমন্দির ইয়াহইয়া বিন আবি আল মনসুর-এর নেতৃত্বে জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের একটি পরিষদের অধীনে পরিচালিত হতো। আর সংগৃহীত তথ্যাবলী বিখ্যাত 'পরীক্ষিত ছক' (শণরধতধণঢ টঠফণ্র) তৈরীতে ব্যবহার করা হতো। অল্প কিছু কাল পরে ২৩৫ হিজরীতে আল দিনাওয়ারী (আবূ হানিফা, আহমদ বিন দাউদ) ইসফাহানে একটি মানমন্দির নির্মাণ করেন। এই মানমন্দির থেকে পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যাবলী তিনি তাঁর রচিত 'কিতাব আল রাসাদ' গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেন। পরবর্তী কয়েক বছরের মধ্যে তিনি সম্ভবত পারসিয়ান ইরাকে অবস্থিত তাঁর নিজ শহর দিনাওয়ারে ফিরে যান। এই শহরে নির্মিত তাঁর মানমন্দিরের ধ্বংসাবশেষ পরবর্তী কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত অবশিষ্ট ছিল। বাগদাদে টাইগ্রীস নদীর তীরে প্রতিষ্ঠিত বাব আল তাক (তাক তোরণ) মানমন্দিরের কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছিল। এই মানমন্দিরে মূসা বিন শাকির-এর পুত্রগণ বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেছিলেন। তাই গ্রীস নদীর উপর নির্মিত সেতুর অপর যে প্রান্ত খোরাসান সড়কের সাথে মিলেছে তাঁর পূর্বদিকে ছিল এই বাব আল তাক। এই তোরণ পূর্ব বাগদাদের বাজারমুখী সড়কের সাথে সংযোগ তৈরী করে দিয়েছিল এবং জনসাধারণের চলাচলের প্রধান পথ হিসেবে ব্যবহৃত হতো। পরে ৯৮৮ খ্রিস্টাব্দে শরফ আল দাওলাহ বাগদাদে তাঁর রাজপ্রাসাদের

www.waytojannah.com

বাগিচায় একটি মানমন্দির নির্মাণ করেছিলেন। এই মানমন্দিরে আল সাঘানী নির্মিত যন্ত্রপাতি ব্যবহৃত হতো। আল সাঘানী ছিলেন সে সময়ের একজন বিখ্যাত যন্ত্রপাতি নির্মাতা। এখানে আল কুহি এবং আবুল ওয়াফা নামে দু'জন বিখ্যাত বিজ্ঞানীও কাজ করেছিলেন বলে জানা যায়।

ইবনে ইউনুস তাঁর বেশীর ভাগ গবেষণা কাজ পরিচালনা করেছিলেন আল মুকাত্তাম মানমন্দিরে। এই মানমন্দির নির্মিত হয়েছিল পাহাড়ী এলাকায় প্রায় ৬০০ ফুট উচ্চতায়। কায়রোর সামান্য পূর্ব দিকে অবস্থিত এই মানমন্দির থেকে নীল নদ দেখা যেত। আল হাকিম এবং আল আযিয উভয়েই এই মানমন্দিরের রক্ষণাবেক্ষণ এবং যন্ত্রপাতি সজ্জিতকরণের জন্য প্রচুর অর্থ ব্যয় করেছিলেন।

পরবর্তীকালে প্রাচ্যে নির্মিত দুটি মানমন্দির বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিল। আর এ দুটি মানমন্দিরই নির্মিত হতে পেরেছিল মোঘল রাজপুরুষদের পৃষ্ঠপোষকতার কারণে। হালাকু খান তাবরিজ থেকে সোজাসুজি পঞ্চাশ মাইল দূরে মারাঘা-তে তাঁর বাসস্থান স্থাপন করেছিলেন। শহরটি ছিল একটি উপত্যকার উপর, যেখান থেকে নয় মাইল দূরের উরমিয়াহ হ্রদ পর্যন্ত সুবিস্তৃত উর্বর সমভূমি অবলোকন করা যেত। শহরের পশ্চিম দিকে সেই সমভূমিতে তাঁর উযীর নাসির উদ্দীন তুসীর অনুরোধে তিনি নির্মাণ করেছিলেন সুবিশাল মানমন্দির। আজও সেই মানমন্দিরের ভিত্তি-দেয়াল দেখতে পাওয়া যায়। একে বিভিন্ন ধরনের যন্ত্রপাতি দ্বারা সজ্জিত রাখা হয়েছিল। মানমন্দিরের চূড়ায় গম্বুজের মধ্যে এমনভাবে কিছুসংখ্যক ছিদ্র রাখা হয়েছিল, যাতে সূর্যরশ্মি ঐ ছিদ্রসমূহ দিয়ে ভিতরে অবস্থিত বাঁধানো চত্বরের কয়েকটি নির্দিষ্ট রেখায় এসে পতিত হতে পারতো। এর দ্বারা ডিগ্রি, মিনিট, উচ্চতা এবং বিভিন্ন ঋতুতে সূর্যের অবস্থান বদলের হিসাব রাখা হতো এবং সারা বছর ধরে প্রতি দিনের সময় ও ঘন্টার হিসাব রাখা হতো। একটি বিশাল ভূগোলক তৈরী করে তাতে বসতি এলাকা চিহ্নিতকরণসহ সাগর, নদী, হ্রদ ও দ্বীপসমূহের রূপরেখা প্রণয়ন করা হয়েছিল।

একই সাথে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের জলবায়ু সম্পর্কিত বিবরণও তৈরী করা হয়েছিল। জানা যায় সদরুদ্দীন আলী বিন আল সুজা ছিলেন এই মানমন্দিরের তত্ত্বাবধায়ক এবং তুসী সেখানে চারজন উপদেষ্টা নিয়োগ করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে একজন ছিলেন শহরের বিখ্যাত জ্যোতির্বিজ্ঞানী ফখরুদ্দীন। উলুগ বেগ সমরকন্দে একটি মানমন্দির নির্মাণ করেছিলেন। এই মানমন্দির এত বৃহৎ এবং যন্ত্রপাতি দ্বারা সুসজ্জিত ছিল যে একে তৎকালে পৃথিবীর অন্যতম অত্যাশ্চর্য বিষয় হিসেবে গণ্য করা হতো। জামশেদ আল কাশী ছিলেন এই মানমন্দিরের প্রথম তত্ত্বাবধায়ক। রাজকুমার নিজেই বিজ্ঞানের বাস্তব প্রয়োগে আগ্রহী ছিলেন এবং মানমন্দির ব্যবহার করতেন।

www.waytojannah.com

Contents

সম্রাট বাবর তাঁর আত্মজীবনীতে উল্লেখ করেছেন যে, তিনি সমরকন্দের এই মানমন্দিরের ধ্বংসাবশেষ দেখেছিলেন।

ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি

নিখুঁত যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা ছাড়া উপরে বর্ণিত বৈজ্ঞানিক কার্যক্রম এবং বিভিন্ন প্রকার পরিমাপ ও পর্যবেক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করা সম্ভব হতো না। অবশ্য কিছু কিছু যন্ত্রপাতি ছিল পূর্ববর্তী বিজ্ঞানীদের আবিষ্কার। কিন্তু এগুলো ব্যবহার এবং পুনর্নির্মাণ করতে গিয়ে বহু সংস্কার ও উন্নয়ন করতে হয়েছিল। গ্রীক নমুনায় প্রস্তুতকৃত যন্ত্রপাতির মধ্যে ছিল (ক) এ্যাস্ট্রল্যাব (Astrolabe-আস্তরল্যাব), (খ) ল্যাটারকাস (Latercus-আল লিবনা) একটি চতুষ্কোণ মাত্রাংকিত ধাতু নির্মিত পাত, যা দিয়ে দুটি বস্তুর দূরত্ব নিরূপণ করা হয়, (গ) এনুলাস (Annulus-বা-Aquinoctialis) (আল হালকাত আল ই'তিদালিয়া – এটি একটি মাত্রাংকিত চক্রাকার পাত, যাকে নিরক্ষীয় বৃত্তের সমকোণে স্থাপন করে, মধ্যাহ্নকালীন পাতন পর্যবেক্ষণ করা হতো, (ঘ) ট্রাইয়াড (Triad- ত্রিযোজী) (ঙ) স্যাক্সট্যান্ট (Sextant-কৌণিক দূরত্ব মাপার যন্ত্র) এবং (চ) ক্লেসিদ্রা (clessydra) ইত্যাদি।

এ সকল যন্ত্রপাতির সাথে আরবদের নিজস্ব সংযোজনও ছিল। যেমন, (ক) ধাত আল আউতার (Dhat al Autar-চারটি সমকোণী সিলিণ্ডারকে এমন কৌশলে স্থাপন করা হতো, যা দ্বারা বিভিন্ন অক্ষাংশ থেকে সময় নিরূপণ করা যেত), (খ) ধাত আল সিম্‌ত ওয়াল ইরতিফা, আল মুশাবাহাত বি আল মানাতিক (সাধারণভাবে দূরত্ব নিরূপণের জন্য যন্ত্র বিশেষ) (গ) হালকাত আল কুবরা এবং (ঘ) হালকাত আল সুগরা (ঙ) বিভিন্ন ধরনের সূর্যঘড়ি এবং সম্ভবত (চ) কম্পাস। বর্ণিত যন্ত্রপাতি ছাড়া আরো অন্যান্য যন্ত্রপাতি ব্যবহৃত হয়ে থাকতে পারে।

টেলিস্কোপ, মাইক্রোস্কোপ এবং ভার্নিয়ার আবিষ্কৃত হওয়ার পূর্বে তেমন কোন নিখুঁত যন্ত্রপাতি ছিল না। কিন্তু প্রয়োজন মানুষকে আবিষ্কারের জন্য অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে এবং যেহেতু তখন ভূমির পরিমাপ গ্রহণ করা, লেভেলিং করা এবং উচ্চতার পরিমাপ গ্রহণ করার প্রয়োজন হতো, তাই প্রয়োজনের তাগিদে কিছু কিছু আকর্ষণীয় যন্ত্রপাতি তাদেরকে তৈরী করে নিতে হয়েছিল। সাধারণভাবে ধারণা করা যায় যে প্রাচীনকালের জরীপকারীগণ দূরত্ব পরিমাপ করার জন্য রশি বা কাঠি ব্যবহার করতেন। পরিমাপের 'একক' অঞ্চল ভেদে বিভিন্ন রূপ হতো। তারা আজকের দিনে কাঠমিস্ত্রীদের দ্বারা ব্যবহৃত চতুষ্কোণীর অনুরূপ সমকোণী যন্ত্র ব্যবহার করতেন।

www.waytojannah.com

Contents

এ্যাস্ট্রল্যাব (Astrolabe)

মুসলিম জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ক ভূগোলবিদগণের নিকট বিভিন্ন ধরনের এ্যাস্ট্রল্যাব ব্যবহার করা ছিল নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। গাণিতিক-জ্যোতির্বিজ্ঞানে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতিসমূহের মধ্যে এ্যাস্ট্রল্যাব-এর রয়েছে দীর্ঘ ইতিহাস। এ্যাস্ট্রল্যাব শব্দটি এসেছে গ্রীক D›TPou অর্থাৎ নক্ষত্র এবং A¢BdYELY অর্থাৎ 'গ্রহণ করা' শব্দদ্বয় থেকে। কারণ যন্ত্রটি শুধুমাত্র নক্ষত্র বিষয়ক পর্যবেক্ষণের কাজেই ব্যবহৃত হয়নি বরং সূর্য ও চাঁদের উচ্চতা পরিমাপের কাজেও ব্যবহৃত হয়েছে। যন্ত্রটিকে প্রধানত তিনটি ধরনে রূপান্তরিত করা যেত, যেমন কোন সমতল বস্তুতে মহাকাশভিত্তিক গোলকসমূহের অভিক্ষেপণ (Projection) করা অথবা একই অভিক্ষেপণকে একটি সরল রেখার উপরে অভিক্ষেপণ করা অথবা কোন অভিক্ষেপণ ব্যতিরেকেই গোলক আকারে উপস্থাপন করা। এ্যাস্ট্রল্যাব সম্ভবত হিপ্পার্কাস (Hipparchus)-এর পরবর্তী সংস্করণ, অবশ্য যন্ত্রটি যদি ইরাটস্থেনিস (Eratosthenes) অপেক্ষা প্রাচীন না হয়ে থাকে। বহুবিধ কারণে একে আধুনিক সেক্সট্যান্ট (Sextant)-এর পূর্বসূরী বলা যায়। মুসলমান জ্যোতির্বিজ্ঞানী ও গণিতবিদগণের নিকট এটি একটি অতিপ্রিয় যন্ত্র হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। তাঁরা এর প্রচলিত নমুনার উপর বেশ কিছু উন্নতি সাধন করেন। প্রথম দিকে তাঁরা কিছু সংখ্যক চাকতি বা তখতির সমন্বয়ে সমতল বিশিষ্ট এক ধরনের যন্ত্র ব্যবহার করতেন। একে বলা হতো এ্যাস্ট্রলাবিয়াম প্ল্যানিসফায়েরাম (Astrolabium planis-phaerum সাথি বা মুসাত্তাহ)। আরবীতে একে 'ধাত্ আল সাফা'ইহ'[৭] ও বলা হতো। এটা ছিল চাকতি (disc) আকারের বহনযোগ্য ধাতব যন্ত্র, যার ব্যাস ছিল ৩.৯ থেকে ৭-৮" ইঞ্চির মধ্যে। হাতল (উরওয়া)-এর সাথে সংযুক্ত ঝুলিয়ে রাখার জন্য একটি বলয় (হালকা, 'ইলাকা) থাকতো, যার সাহায্যে যন্ত্রটিকে ঊর্ধ্বমুখী করে স্থাপন করা যেত। পরবর্তীতে আরো কিছু উৎকর্ষ সাধনের পর এ্যাস্ট্রল্যাবের সাহায্যে তাৎক্ষণিক পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে যে কোন তারকার উচ্চতা নির্ণয় করা যেত এবং একই সাথে দিন ও রাত্রির অতিবাহিত ঘন্টা সম্পর্কে জানা সম্ভব হতো।

ভূ-তাত্ত্বিক কার্যক্রম পরিচালনায় এই যন্ত্রের ব্যবহার হতো, যেমন-যে কোন অগম্য স্থানের দূরত্ব ও ভবনের উচ্চতা পরিমাপ করা এবং কোন কূপের গভীরতা ও ব্যাস পরিমাপ করা। এটা স্পষ্ট যে এরূপ একটি ছোটখাট যন্ত্রের সাহায্যে সর্বোচ্চ নির্ভুলতা পাওয়া সম্ভব নয়। বিশেষত মহাকাশ বিষয়ক পর্যবেক্ষণ কালে যেমন বিষুবীয় সময় এবং চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণের ক্রমহ্রাসমানতা ঠিকভাবে নিরূপণ করা এবং সময়ের বিভিন্নতা নিরূপণ করা এই যন্ত্রের সাহায্যে যথাযথরূপে সম্ভব ছিল না। উত্তর গোলার্ধের পর্যবেক্ষণ কাজে ব্যবহৃত এ্যাস্ট্রল্যাবকে বলা হতো 'শিমালী' এবং দক্ষিণ গোলার্ধের পর্যবেক্ষণ কাজে ব্যবহৃত এ্যাস্ট্রল্যাবকে বলা হতো 'জুনাবী'। অধিকতর উন্নতমানের

www.waytojannah.com

Contents

আরেকটি এ্যাস্ট্রল্যাব আবিষ্কৃত হয়েছিল, যার নাম ছিল 'কামিল' (perfect)। বস্তুত পর্যবেক্ষণ ও পরিমাপ কাজে প্রকৃত নির্ভুলতা অর্জিত হয়েছিল টেলিস্কোপ, আধুনিক স্যাক্সট্যান্ট এবং থিওডলাইট (theodolite) আবিষ্কৃত হওয়ার পর। এমন কি সপ্তদশ শতাব্দীতে আবিষ্কারের যুগ শুরু হওয়া পর্যন্ত নাবিকেরা সূর্যের উচ্চতা পরিমাপ করার জন্য এ্যাস্ট্রল্যাব ব্যবহার করতো। এক সময় ইউরোপবাসীরা আরবদের নিকট থেকে পূর্ণাঙ্গ এ্যাস্ট্রল্যাব সম্পর্কে জানতে সক্ষম হলো। যা পরবর্তীতে উপযোগিতা, উদ্ভাবনী ও সুবিধার বিচারে এক বিস্ময় হিসেবে[৮] (Marvel of Convenience and Ingenuity) বিবেচিত হতো এবং এক গাণিতিক রত্ন (Mathemetical Jewel) নামেও অভিহিত হতো। এই যন্ত্রের কয়েকজন বিখ্যাত নির্মাতা এবং এ বিষয়ের উপর কয়েকজন লেখকের নাম এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। প্রাথমিক যুগের মুসলমান এ্যাস্ট্রল্যাব নির্মাতাদের মধ্যে ছিলেন আল ফাজারী (মৃত্যু ৭৯৬ খ্রিস্টাব্দ) এবং আল নাইরিজি (মৃত্যু ৯২২ খ্রিস্টাব্দ)। আল খাজিন এ বিষয়ে একখানা কিতাব লিখেছিলেন।

এই কিতাবের নাম ছিল কিতাব যিজ আল সাফাইহ। আল খুজান্দি (মৃত্যু ৩৮২ হিজরী/৯৯২ খ্রিস্টাব্দ) ফখরুদ্দৌলাহ আর বুওয়াহিদ-এর রাজদরবারে থাকতেন। তাঁর নির্মিত যন্ত্রের নাম ছিল সুদাস আল ফখরী। এই যন্ত্রের সাহায্যে বিভিন্ন স্থানের অক্ষাংশ নিরূপণ করা যেত। আল জিলি (৯৭১-১০২৯ খ্রিস্টাব্দ)। এ্যাস্ট্রল্যাব সম্পর্কে একখানা কিতাব রচনা করেছিলেন। ১০০০ খ্রিস্টাব্দের দিকে বাগদাদে অবস্থিত শারফুদ্দৌলাহ-এর মানমন্দিরে দু'জন বিখ্যাত যন্ত্র নির্মাতা ছিলেন। তাঁরা হলেন সাঘানি এবং রুস্তম আল কুহি। আল বিরুনী তৎকালে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি এবং আস্তরল্যাব সম্পর্কে একখানা কিতাব রচনা করেছিলেন। তিনি তাঁর কিতাব আল তাফহিম নামক গ্রন্থে অন্যান্য বিজ্ঞানীদের সাথে আল খুজান্দি, আবূ সাঈদ আল সিনজারী (বৃহৎ এ্যাস্ট্রল্যাব নির্মাতা) এবং আল জিলি প্রমুখ-এর নাম উল্লেখ করেছেন। পাশ্চাত্যের আল যারকালী (১০২৯-১০৮৮ খ্রিস্টাব্দ) ছিলেন একজন দক্ষ এ্যাস্ট্রল্যাব নির্মাতা।

তাঁর নির্মিত 'সাফিহা' এ ক্ষেত্রে সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলতে সক্ষম হয়েছিল এবং ইউরোপে এই উন্নতমানের এ্যাস্ট্রল্যাব ব্যবহারকে জনপ্রিয় করে তুলতে সক্ষম হয়েছিল। কয়েক শতাব্দী কাল ধরে মুসলমান গণিতবিদ, জ্যোতির্বিজ্ঞানী ও নাবিকগণ এ্যাস্ট্রল্যাব ব্যবহারের সাথে সুপরিচিত ছিলেন। পরবর্তীকালে প্রাচ্যে বদিউজ্জামান আসতুরলাবী (মৃত্যু ১১৩৯-৪০ খ্রিস্টাব্দ) সেকালের সবচাইতে দক্ষ এ্যাস্ট্রল্যাব নির্মাতা হিসেবে খ্যাতি লাভ করেন। তিনি অন্যান্য যন্ত্রপাতি নির্মাণ ছাড়াও মহাকাশের নমুনা-চিত্র ও ভূগোলক নির্মাণ করেছিলেন। মুজাফফার আল তুসী মারাঘা মানমন্দিরে 'আস্সাঈ-তুসি' এবং 'আলউর্দি' নামক দুটি যন্ত্র তৈরী করে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। কথিত আছে যে, তিনি মারাঘা মানমন্দিরের সাথে সংযুক্ত [৯] যন্ত্র কারখানা

www.waytojannah.com

Contents

ও ঢালাই কারখানার তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন। খুব সম্ভব তিনিই আল মারাঘায় ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি সম্পর্কে রচিত প্রবন্ধের লেখক। অন্যান্য যন্ত্রপাতি ছাড়াও তিনি হিপ্পারকাস ডাইঅপটার (Hipperchus diopter) নির্মাণ করেন এবং টলেমীর পরে তিনি ছিলেন প্যারালাকটিক রুলার (Parallactic rulers)-এর নির্মাতা। বলা হয়ে থাকে যে, এই মানমন্দিরে এমন এক ধরনের যন্ত্র ছিল, যা দ্বারা দূরবর্তী কোন বস্তু স্পষ্টভাবে অবলোকন করা সম্ভব হতো। (এ থেকে ছোটখাট ধরনের টেলিস্কোপ সম্পর্কে ধারণা করা যেতে পারে)।[১০] সমরকন্দে উলুগ বেগ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মানমন্দিরে নিয়মিতভাবে উন্নতমানের যন্ত্রপাতি তৈরী ও ব্যবহার করা ছিল নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। যন্ত্রপাতি নির্মাণের এই ধারা পরবর্তীকালে ভারতেও সম্প্রসারিত হয়। দিল্লীতে হুমায়ুন কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মানমন্দিরেও এ সকল যন্ত্রপাতি ব্যবহৃত হয়েছিল বলে জানা যায়। জিয়াউদ্দীন আসতুলাবি একজন বিখ্যাত এ্যাস্ট্রল্যাব নির্মাতা ছিলেন।

আনভূমিক সূর্যঘড়ি (বাসেত) নির্মাণের জন্য অক্ষাংশ সম্পর্কিত নির্ভুল জ্ঞানকে কাজে লাগানো হয়েছিল। আজকের দিনে নগরঘড়ির মতো তখন সাধারণত মসজিদের খোলা আঙ্গিনায় সূর্যঘড়ি নির্মাণ করা হতো। এ সকল সূর্যঘড়ি কোন নির্দিষ্ট স্থানের অক্ষাংশের ভিত্তিতে তৈরী করা হতো, পুরনো দিনের সেই উত্তরাধিকার হিসেবে আজও আমরা বড় বড় মসজিদের ভিতরের দেয়ালে ঘড়ি এবং আঙ্গিনায় সূর্যঘড়ি দেখতে পাই।

নাবিকদের কম্পাস

নাবিকদের ব্যবহৃত কম্পাস প্রকৃতপক্ষে কারা আবিষ্কার করেছিলেন, এ বিষয়টি এখনো অস্পষ্ট রয়ে গেছে। কম্পাস আবিষ্কারের উৎস সম্পর্কিত দাবী চীন, গ্রীক, ইট্রুরিয়াবাসী, ফিন, ইতালীয় এবং আরবদের মধ্যে বিভাজিত হয়ে আছে। চীনাদের দ্বারা আবিষ্কৃত হওয়া সম্পর্কিত দাবী পুরোপুরিভাবে বাতিল হয়ে যায়। কারণ এটা নিশ্চিত হওয়া গেছে যে, চুম্বকশক্তি সম্পন্ন সুঁই-এর বাস্তব ব্যবহার চীনারা সর্বপ্রথম কোন বিদেশীর নিকট থেকে শিখেছিল[১১] এবং খুব সম্ভব তাঁরা ছিলেন মুসলমান। মুসলমানদের ব্যাপক নৌ-তৎপরতা সম্ভবত এরূপ যন্ত্রপাতি ব্যবহারকে নিশ্চিত করেছিল। চীন দেশের বাইরে কম্পাস সম্পর্কিত প্রাচীনতম উদ্ধৃতি পাওয়া যায় ইউরোপে আলেকজান্ডার নেসকাম (Alexander Neckam) এর ল্যাটিন ভাষায় রচিত সাহিত্যাবলীতে। কিন্তু ইংরেজরা একে নতুন কিছু হিসেবে উল্লেখ করেনি। এ বিষয়ে মুসলমান উদ্ধৃতিগুলো পাওয়া যায় তুলনামূলকভাবে কিছুকাল পরে। এর কারণ সম্ভবত নাবিকদের মধ্যে এর ব্যবহার সম্পর্কে গোপনীয়তা রক্ষা করা হতো। যদিও মাওলানা সুলায়মান নদভীর[১২] মতে কুতবনুমা (কম্পাস) সম্পর্কে আল ইদরিসির গ্রন্থে উল্লেখ

www.waytojannah.com

ছিল। উক্ত কিতাবে উল্লেখ ছিল যে, আরবরা এই যন্ত্র সচরাচর ব্যবহার করতো। ভাসমান কম্পাসের ব্যবহার এবং ভারত মহাসাগরে মুসলমান নাবিকদের মধ্যে এই যন্ত্রের জনপ্রিয়তা সর্বজনবিদিত (আওফি রচিত জাওয়ামি আল হিকায়াত)।

অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমাংশের পরিমাপ

নৌচালনা এবং নির্ভুল মানচিত্র তৈরী করার জন্য কোন স্থানের অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমাংশ যথাযথরূপে নিরূপণ করা একান্ত অপরিহার্য। অক্ষাংশ নিরূপণ করা হতো সূর্য এবং ধ্রুবতারার উচ্চতা অথবা মেরু অঞ্চলে দৃষ্ট কোন তারকার উচ্চতম ও নিম্নতম উচ্চতার পরিমাপের ভিত্তিতে। সূর্যের উচ্চতা পরিমাপ করার জন্য প্রাচীনতম যে যন্ত্রের কথা জানা যায়, তা হলো গ্নমন (Gnomon) বা মিকইয়াস। এটা ছিল একটি সাধারণ খাড়া দণ্ড বিশেষ। দণ্ডটি খাড়া অবস্থায় যে ছায়া পড়ত, সে ছায়ার সাহায্যে সূর্যের উচ্চতা পরিমাপ করা হতো।

ব্যাবিলনীয় সভ্যতায়ও এই যন্ত্রের ব্যবহার ছিল বলে জানা যায়। ইউরোপীয় লেখকগণ মনে করেন যে মুসলমান ভৌগোলিক জ্যোতির্বিজ্ঞানীগণ টলেমী রচিত আলমাজেস্ট-এ বর্ণিত জ্ঞানের বাইরে কোন উন্নতি সাধন করতে সক্ষম হননি। উপরে বর্ণিত আলোচনা এবং দীর্ঘকাল যাবত মুসলমান বিজ্ঞানীদের অবদান পর্যালোচনা করলে তাদের এই বক্তব্যের সারবত্তা প্রমাণ হয় না। এটা স্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয়েছে যে, আরব বিজ্ঞানীগণ কখনো কখনো তাঁদের সূক্ষ্ম গবেষণার মাধ্যমে ভৌগোলিক অক্ষাংশ নিরূপণ করেছিলেন। তাঁদের উদ্ভাবিত পন্থা এতই সঠিক ছিল যে, প্রায়শই তাঁদের হিসাব নির্ভুল হতো। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় ইবনে ইউনুস সর্বপ্রথম গ্নমন-এর ছায়ার সাহায্যে অক্ষাংশ নিরূপণে ত্রুটির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন।

এই ত্রুটির ফলে প্রকৃত অবস্থা থেকে প্রায় ১৫ ডিগ্রি নীচের অবস্থান জানা যায়। কারণ ছায়া পতিত হয় সূর্যের উপরের প্রান্ত থেকে, কেন্দ্র থেকে নয়। প্রথম যুগের জ্যোতির্বিজ্ঞানীগণ যেমন আল খাওয়ারিযমী, ফারঘানী, হাবাশ আল হাসিব এবং আল বাত্তানী অক্ষাংশ নিরূপণে মূলত গ্রীক ও ভারতীয় পদ্ধতি অনুসরণ করতেন। তবে এটা জানা গেছে যে আল খাওয়ারিযমী মেরু এলাকার তারকার উচ্চতার সাহায্যে অক্ষাংশ নিরূপণের সম্ভাব্যতা সম্পর্কে ইঙ্গিত প্রদান করেছিলেন, যদিও তিনি নিজে এ পদ্ধতি প্রয়োগ করেননি।

ইবনে হায়সাম (৯৫৫-১০৩৮ খ্রিস্টাব্দ) সঠিকরূপে অক্ষাংশ নিরূপণের পদ্ধতি সম্পর্কে পৃথক একখানা কিতাব রচনা করেছিলেন। তিনি মনে করতেন যে মেরু এলাকার অক্ষাংশ সঠিকভাবে নিরূপণের জন্য একটি উজ্জ্বল স্থির নক্ষত্রের সাহায্য

www.waytojannah.com

Contents

নিতে হবে। কিন্তু আল বিরুনী এ বিষয়ে আরো মৌলিক ও বিজ্ঞানভিত্তিক সুপারিশ উপস্থাপন করেছিলেন তাঁর লেখা সুবিখ্যাত 'কানুন আল মাসউদী' গ্রন্থে। তিনি এতে মেরু এলাকায় দৃষ্ট নক্ষত্র ও সূর্যের উচ্চতাভিত্তিক একটি পদ্ধতির কথা উল্লেখ করেন। এই পদ্ধতিতে তিনি গজনীর যে অক্ষাংশ নিরূপণ করেছিলেন তা সঠিক ছিল। তিনি আরো বহু স্থানের অক্ষাংশ নিরূপণ করেছিলেন, যে সম্পর্কে কিতাবুল হিন্দ, কিতাবুল তাফহিম এবং কানুন আল মাসউদীতে উল্লেখ করা হয়েছে। অক্ষাংশ নিরূপণে অন্যান্য আরো যাঁরা প্রায় সঠিক হিসাব তৈরী করেছিলেন, তাঁরা হলেন বাগদাদে মূসা বিন শাকির-এর পুত্র, সুররামান'রাআ-তে আল মাহানী, আল মুকাত্তাম-এ ইবনে ইউনুস এবং সমরকন্দে উলুগ বেগ।

অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত দ্রাঘিমাংশ নিরূপণ করার কাজ যথেষ্ট জটিল ছিল। এর কারণ ছিল দু'টি – প্রথমত, সঠিকরূপে মধ্যাহ্নকাল নির্বাচনের সমস্যা এবং এই রেখার পূর্ব ও পশ্চিম দিকের কৌণিক দূরত্ব নিরূপণের সমস্যা। টলেমী উত্তমাশা দ্বীপপুঞ্জের মধ্যাহ্নকালকে (ক্যানারী দ্বীপপুঞ্জের মধ্যাহ্নকালের সাথে অনুমানের ভিত্তিতে তুলনা করে) আদর্শমিতি (Standard) হিসেবে ধরে নিয়েছিলেন। দ্রাঘিমাংশ নিরূপণের ক্ষেত্রে মুসলমান বিজ্ঞানীগণ পশ্চিম প্রান্ত যেমন গ্রীস থেকে শুরু করে পূর্ব দিকে ১৮০ ডিগ্রি পর্যন্ত গণনা করেছেন অথবা কখনো তাঁরা পূর্ব এবং পশ্চিমে যেখানে ইচ্ছা পূর্ণ মধ্যাহ্নকাল নিরূপণ করে নিতেন। ঐ সময়ে ভূ-পৃষ্ঠের কেন্দ্রে পৃথিবীর শীর্ষছাদ (Cupola মত ইরধভ-কুব্বাত আল আরদ) অতিক্রম করেছে বলে ধরে নেয়া হতো। ইরধভ শব্দটি সম্ভবত ভারতের মালওয়াতে অবস্থিত একটি শহর উজ্জয়ন এর অপভ্রংশ থেকে এসেছে। আল বিরুনীর সময়ের আগে চন্দ্রগ্রহণের সময়কে ব্যবহার করে দ্রাঘিমাংশ নিরূপণ করা ছিল একটি প্রচলিত সাধারণ পদ্ধতি।

এর ফলে হিসাবের ক্ষেত্রে ভুলের পরিমাণ কয়েক ডিগ্রি পর্যন্ত হয়ে যেত। বলা হয়ে থাকে যে তিনিই সর্বপ্রথম তথাকথিত স্থলজ (terrestrial) পরিমাপের পদ্ধতির উপর গুরুত্বারোপ করেছিলেন। "একটি বিন্দু থেকে অপর বিন্দুর হ্রস্বতম লৈখিক দূরত্ব এবং প্রতিটির অক্ষাংশ নির্ভুলভাবে নিরূপণের পর উক্ত তথ্যের ভিত্তিতে আল বিরুনী দ্রাঘিমাংশের পার্থক্য নিরূপণ করতেন। তিনি এভাবে আলেকজান্দ্রিয়া ও গজনীর মধ্যে দ্রাঘিমাংশের দূরত্ব সম্পর্কিত পূর্ববর্তী তথ্যাবলী সংশোধন করেছিলেন। অনুরূপভাবে উক্ত দুটি স্থানের মধ্যবর্তী আরো কিছু সংখ্যক দ্রাঘিমাংশ চিহ্নিত করেছিলেন। এই হিসাব সম্পর্কে তাঁর বিখ্যাত ভৌগোলিক জ্যোতির্বিজ্ঞান গ্রন্থ কানুন আল মাসউদীর একটি অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। তাঁর এই গ্রন্থকে টলেমী রচিত আলমাজেস্ট-এর সাথে তুলনা করা যেতে পারে।

www.waytojannah.com

Contents

ইবনে ইউনুস আরব ভূগোলবিদগণের দ্বারা অনুসৃত প্রচলিত পদ্ধতিতে চন্দ্রগ্রহণ পর্যবেক্ষণের সাহায্যে দ্রাঘিমাংশ নিরূপণ করেছিলেন। দ্রাঘিমাংশ নিরূপণের ক্ষেত্রে মুসলমান জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের যত্নশীল পর্যবেক্ষণের ফলে ভূমধ্যসাগরের দৈর্ঘ্য সম্পর্কিত পূর্বের অতিরঞ্জিত হিসাব সংশোধিত হয়। টলেমীয় তত্ত্বের ভিত্তিতে দীর্ঘদিন ধরে অনুসৃত এই ভুলের ব্যবধান ছিল কমপক্ষে ১৭ ডিগ্রি।

ভূ-তাত্ত্বিক কার্যাবলী এবং পৃথিবীর আকৃতি

মধ্যযুগের ইউরোপে পৃথিবীর গোলত্ব সম্পর্কে বিভ্রান্তিকর ধারণা চালু ছিল। পৃথিবীর আকার সম্পর্কে কসমাস-এর উদ্ভূত ধারণা যেমন ছিল, তেমনি খ্রিস্টান চিন্তাবিদগণ কর্তৃক প্রচলিত পৌত্তলিক ধারণাসমূহ গ্রহণ করতে দ্বিধার বিষয়টিও ছিল। সেইন্ট অগাস্টাইন পৃথিবী গোলাকৃতি হওয়াকে অসম্ভব ব্যাপার বলে মনে করতেন। মোটকথা পুরো বিষয়টি ছিল অমিমাংসিত। মধ্যযুগে ইউরোপীয় মানসিকতা ধর্মীয় গোঁড়ামিপ্রসূত অজ্ঞতা দ্বারা এত বেশী আবিষ্ট ছিল যে পৃথিবী গোল হওয়ার ধারণা গ্রহণে তাঁরা প্রস্তুত ছিলেন না। যা কখনো কখনো কিছুটা স্ববিরোধী এবং অবিশ্বাস্য বলেও মনে হয়।

তাই প্রতিপাদ্য স্থান বা ভূপৃষ্ঠের বিপরীত দিক সম্পর্কে নানা বিতর্ক এবং সেখানে মনুষ্য বসতি সম্ভব কিনা সে বিষয়ে প্রচুর মতভেদ ছিল। অধিকাংশ আরব ভূগোলবিদ পৃথিবীর গোলত্বে বিশ্বাসী ছিলেন। কারণ হনিগমান (Honigmann)-এর মতে তাঁদের (আরবদের) বর্ণিত আবহাওয়া তত্ত্ব থেকে এরূপ ধারণা পাওয়া যায়। তাঁদের অধিকাংশই মনে করতেন যে পৃথিবী গোলাকার এবং তা মহাশূন্যে ভাসমান। প্রাথমিক যুগের ভূগোলবিদগণের মধ্যে ইবনে রুসতাহ তাঁর রচিত ঘমরপ মত ডর্ম্রফহ´রণট-লরণ্র গ্রন্থে এ সকল ধারণা উপস্থাপন করেছিলেন।

অতি প্রাচীন কাল থেকেই পৃথিবীর আকার সম্পর্কে চিন্তাভাবনা চলে আসছে। তখন থেকেই পৃথিবীর পরিধি নির্ণয়ের প্রচেষ্টাও গ্রহণ করা হয়েছিল। নিম্নে পৃথিবীর পরিধি সম্পর্কিত কিছু মতবাদ বা তথ্য উল্লেখ করা হলো।

গ্রীকঃ এ্যারিস্টটল ৪৫৯৬৪ মাইল; ইরাটসথেনিস ২৫০০০ মাইল; পসিডেনাস ১৮০০০ মাইল এবং টলেমী ১৮০০০ মাইল।

হিন্দুঃ আর্য্যভট্ট ৩৩১৭৭ মাইল, ব্রহ্মগুপ্ত ৫০৯৩৬ মাইল এবং আচার্য্য ৪৮৭১৪ মাইল।

মুসলমানগণ বিজ্ঞানভিত্তিক জ্যোতির্বিজ্ঞান ও গাণিতিক ভূগোলের চর্চা শুরু করার পর পরই বিভিন্ন ভূ-তাত্ত্বিক কার্যক্রমও গ্রহণ করেন। পৃথিবীর পরিধি পরিমাপ করার সর্বপ্রথম সংগঠিত উদ্যোগ গৃহীত হয়েছিল খলীফা আল-মামুন কর্তৃক নিয়োজিত কিছু সংখ্যক জরীপকারীর মাধ্যমে।

www.waytojannah.com

তাঁরা কয়েকজন বিজ্ঞানীর তত্ত্বাবধানে সিরীয় মরুভূমির সিনজার সমতল এলাকায় এই কার্যক্রম শুরু করেছিলেন। তাঁরা এক্ষেত্রে যে পদ্ধতি প্রয়োগ করেছিলেন তা হলো, কয়েকজন পর্যবেক্ষক একটি নির্দিষ্ট স্থান থেকে একই সময়ে পায়ে হেটে চলতে শুরু করতেন। তাঁদের কেউ যেতেন উত্তর দিকে, অন্যরা যেতেন দক্ষিণ দিকে। এভাবে তাঁরা চলতে থাকতেন যতক্ষণ না মেরু নক্ষত্রের উদয় হয়ে এক ডিগ্রি পর্যন্ত ডুবে যেত। এ সময়ে তাঁরা একটা খুঁটিতে রশি বেঁধে এগুতেন। চলা শেষে পুরো দূরত্বের পরিমাপ গ্রহণ করা হতো এবং তা থেকে উভয় দিকে দূরত্বের গড় পরিমাপ বের করা হতো।

প্রকৃতপক্ষে তাঁরা গড় পরিমাপকে ফলাফল হিসেবে গ্রহণ করতেন না। বরং দুটি পৃথক পরিমাপের বৃহত্তর সংখ্যাকে ফলাফল হিসেবে গ্রহণ করতেন। এভাবে নির্ণীত সংখ্যা ছিল ৫৬ মাইল। এই পদ্ধতিতে পরিমাপ গ্রহণের পর পৃথিবীর পরিধি স্থির করা হয় ২০৪০০ মাইল। আল বাত্তানী এবং আল ফারঘানীর মতে পৃথিবীর ব্যাসার্ধ ৩২৫০ আরব মাইল এবং ইবনে রুসতাহ-এর হিসাবে তা ৩৮১৮ মাইল। তবে আল বিরুনীর পরিমাপ সম্ভবত সবচাইতে উত্তম। কানুন আল মাসউদী গ্রন্থের সপ্তম অধ্যায়ে তিনি পৃথিবীর পরিধি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তিনি জুরজানের উত্তর দাহিস্তানে সমতল এলাকায় তাঁর পরিমাপ কার্যক্রম পরিচালনা করেছিলেন। কিন্তু তিনি মনে করলেন যে তাঁর এই উদ্যোগ সফলতা অর্জনে সক্ষম হবে না। তাই তিনি তাঁর কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জনের জন্য কার্যক্রমটিকে স্থানান্তর করলেন পাঞ্জাবের ঝিলাম জেলায় (বর্তমানে পাকিস্তান)। এখানে তিনি তাঁর তথাকথিত পদ্ধতি অর্থাৎ পাহাড়ের চুড়া থেকে নীচের দিকে আনুভূমিক পরিমাপ গ্রহণের পদ্ধতি গ্রহণ করলেন।

এতে ফলাফল দাঁড়ালো ৫৬ মাইল, ^{14} ০৫০"। তিনি মন্তব্য করেছেন যে মূসা বিন শাকির-এর পুত্রদের তদারকীতে এবং আনুকূল্যে এই হিসাব নিরূপণ করা হয়েছে। সমসাময়িক ইউরোপে পৃথিবীর গতি সম্পর্কিত বিষয়টি আলোচিত হয়নি। মনে করা হতো যে গ্রহটি বিশ্বের কেন্দ্রস্থলে স্থির হয়ে আছে। কিন্তু কিছু সংখ্যক মুসলমান ভূগোলবিদ যেমন আলী বিন উমর আল কাতিবি, কুতুবউদ্দীন সিরাজী এবং সিরিয়াবাসী আবুল ফারাজ এ ব্যাপারে অন্যদের সাথে ভিন্নমত পোষণ করতেন। তাঁরা পৃথিবীর চক্রাকারে আবর্তিত হওয়া সম্পর্কে ইঙ্গিত প্রদান করেছিলেন, যদিও তাঁদের এই ধারণা সার্বিকভাবে গৃহীত হয়নি। কারণ, তখনো গতি সম্পর্কিত সূত্রাবলী পরিপূর্ণতা লাভ করেনি, যা পরবর্তীকালে গ্যালিলিও এবং কেপলার কর্তৃক আবিষ্কৃত হয়। তবে টলেমী প্রদত্ত সূত্রসমূহ সম্পর্কে মুসলিম চিন্তাবিদগণ ধারাবাহিকভাবে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন এবং সমালোচনা করেছেন। ফলে ১৫৪৩ খ্রিস্টাব্দে কোপার্নিকাসের

www.waytojannah.com

Contents

আবিষ্কৃত সংস্কারসমূহের পথ সুগম হয়। আল বিরুনী ব্যাবিলনীয় ও হিন্দু দর্শনের ভিত্তিহীন ধারণাগুলো গ্রহণ করেছিলেন এবং বিশ্বাস করেছিলেন যে সূর্য পৃথিবীর চারদিকে ঘূর্ণায়মান। কিন্তু একজন বিজ্ঞানী ও উদারচেতা মানুষ হিসেবে তিনি পৃথিবী সূর্যের চারদিকে আবর্তিত হওয়ার সম্ভাবনা সম্পর্কিত আবূ সাঈদ সিনজারীর বক্তব্যের প্রশংসা করতেন।

পরবর্তীকালে আবর্তিত হওয়ার বিষয়টিকে গ্রহণ করেন উমর আল কাতিবি (মৃত্যু ১২৭৭ খ্রিস্টাব্দ)। তিনি ছিলেন মারাঘা মানমন্দিরের একজন বিজ্ঞানী। তাঁর রচিত 'হিকমাত আল আইন' গ্রন্থে তিনি সূক্ষ্ম যুক্তির অবতারণা করেন, যেমন, "যদি ইহা অর্থাৎ পৃথিবী না ঘুরে তাহলে কোন পাখি কি উড়ন্ত অবস্থায় থাকতে পারতো?" এর জবাবে তিনি বলেন, হাঁ, কারণ তা হলে (অর্থাৎ পৃথিবী ঘুরলে) বায়ুমণ্ডলও সে সাথে ঘুরে যেত এবং পাখিটিকে সেদিকে টেনে নিয়ে যেত।

তিনি গ্যালিলিও এবং কেপলারকে বুঝতে সক্ষম হননি। অন্যদের মধ্যে যিনি এ বিষয়ে আলোচনা করেছিলেন, তিনি হলেন নাসির উদ্দীন তুসীর ছাত্র কুতুবউদ্দীন আল শিরাযী (১২৩৬-১৩১১ খ্রিস্টাব্দ)। তাঁর ভৌগোলিক জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ 'নিহায়াত আল ইদরাক ফি দিরায়াত আল আফলাক' (ভূগোলক সম্পর্কিত সর্বোচ্চ জ্ঞান) রচিত হয়েছিল তুসী রচিত 'তাযকিরা'-এর অনুসরণে। উক্ত গ্রন্থে ভূগোল, ভূতত্ত্ব এবং আবহাওয়া বিদ্যা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। শিরাযী গতি সম্পর্কে প্রচলিত ধারণার ঊর্ধ্বে উঠতে পারেননি। তিনি এই উপসংহারে এসেছিলেন যে পৃথিবী হচ্ছে বিশ্বের কেন্দ্রস্থলে স্থাপিত একটি গতিহীন গোলক।

তথ্য সূত্র

১. History of Muslim Philosophy-২য় খণ্ড, পৃ. ১২৬৬-৬৭।
২. শিবলি নোমানী, মামুন, পৃ. ১৭০-৭৫।
৩. তাঁরা মাত্র সাতটি গ্রহের কথা জানতে পেরেছিলেন। সেগুলো হলো বুধ, শুক্র, পৃথিবী, চাঁদ, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি এবং এমনকি তাঁরা সূর্যকেও একই শ্রেণীভুক্ত হিসেবে বিবেচনা করতেন।
৪. 'সুরাত আল মামুনিয়াহ' (বর্তমানে পাওয়া যায় না)।
৫. History of Muslim Philosophy, ২য় খণ্ড, পৃ. ১২৮৪-৮৫।
৬. আলভী, Arab Geography ইত্যাদি, পৃ. ২০-২১।
৭. এ্যানসাইক্লোপেডিয়া অব ইসলাম, নতুন সংস্করণ, ১৯৬৩।

www.waytojannah.com

Contents

৮. এ্যানসাইক্লোপেডিয়া অব ব্রিটানিকা, ত্রয়োদশ সংস্করণ, ১ম খণ্ড, পৃ. ৭৯৫।
৯. আহমাদ, Muslim Contributions to Geography পৃ. ১০৮-৯।
১০. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১০।
১১. Sarton, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬২৯।
১২. নদভী, 'Arab Navigation,' ইসলামিক কালচার (অকটোবর ১৯৪২)।
১৩. আহমাদ, Muslim Contributions to Geography, তু, পৃ. ১১৪,
আরো দেখুন, Schoy, Geography of the Muslim of the Middle Ages.
১৪. আহমাদ, Muslim Contributions to Geography, পৃ. ১১৬-১৭.

www.waytojannah.com

ষষ্ঠ অধ্যায়

ম্যাপ ও চার্ট প্রস্তুতকরণ

প্রথম থেকেই ম্যাপ ও চার্ট প্রস্তুতকরণের ব্যাপারে আরব ভূগোলবিদগণের আগ্রহ ছিল। প্রথমত এই আগ্রহ দেখা দেয় কোন নির্দিষ্ট স্থানকে খুঁজে পাওয়া এবং কোন এলাকার সীমানা চিহ্নিত করার প্রয়োজনে। সম্ভবত ম্যাপ প্রস্তুতকরণে গ্রীক ধারাবহিকতাও এক্ষেত্রে প্রভাব রাখতে সক্ষম হয়েছিল। এ ছাড়া সে সময়ে টলেমীর প্রভাব ছিল অত্যন্ত শক্তিশালী। তাঁর প্রস্তুতকৃত ম্যাপ প্রাথমিক যুগের মুসলিম ভূগোলবিদগণকে তাঁদের সংগৃহীত তথ্যাবলী ও জ্ঞানভাণ্ডারকে বিশ্লেষণ করা এবং মানচিত্রাংকন প্রচেষ্টায় অনুপ্রাণিত করে। ধীরে ধীরে টলেমীয় ধারার ম্যাপের অনেক উন্নতি সাধিত হয় এবং পাশাপাশি আরব মানচিত্রাংকন ধারায় নতুন নতুন জ্ঞানের সংযোজন হতে থাকে।

যাই হোক, দীর্ঘদিন যাবত একটা ধারণা সাধারণভাবে প্রচলিত ছিল যে স্থলভাগকে একটি মাত্র মহাসাগর পরিবেষ্টন করে আছে। কারণ মুসলমান ব্যবসায়ী, নাবিক, অথবা বিজেতাগণ যে কোন দিক দিয়েই প্রবেশ করুন না কেন, আটলান্টিক থেকে ভারত মহাসাগর এবং প্রশান্ত মহাসাগর পর্যন্ত সব দিক থেকেই তারা একটি বিশাল মহাসাগরীয় বিস্তার লক্ষ্য করতেন। তাদের এই বাস্তব অভিজ্ঞতা প্রাচীন ব্যাবিলনীয় এবং গ্রীক ঐতিহ্য সূত্রে প্রাপ্ত তথ্যাবলী দ্বারা আরো জোরদার হয়েছে। তৎসত্ত্বেও এমনকি প্রাথমিক যুগের মুসলমান মানচিত্র প্রণেতা যেমন ইবনে হায়কল, আল মাকদিসি, আল ইদরিসি এবং অন্যান্য আরো অনেকের দ্বারা এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সূচিত হয়। তন্মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন হলোঃ ভারত মহাসাগর স্থলবেষ্টিত হওয়া এবং আফ্রিকার সাথে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সংযোগ থাকা সম্পর্কে টলেমীর ধারণা বাতিল করে দেয়া। তাদের মানচিত্রে নতুনভাবে আবিষ্কৃত সাগর, উপসাগর ও দ্বীপনমূহ স্থান পেতে থাকে।

www.waytojannah.com

আর এটা ছিল আরবদের ব্যাপক নৌও-তৎপরতার ফলশ্রুতি। এ সময়ে ইউরোপ এবং ভূ-মধ্যবর্তী অঞ্চলে নৌ-তৎপরতা সম্পর্কে ফিনিশীয়দের প্রাচীন ঐতিহ্য প্রায় বিস্মৃত হয়ে গিয়েছিল। গ্রীক যুগে এবং তৎপরবর্তী সময়ে নৌ-পথে বিচরণ বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে ভূমধ্যসাগর এবং উপকূলবর্তী এলাকার মধ্যে সীমিত ছিল। মধ্যযুগে ইউরোপীয় সমুদ্র যাত্রায় একমাত্র ব্যতিক্রম ছিলঃ উত্তর আটলান্টিক অতিক্রম করে আইসল্যাণ্ড, গ্রীনল্যান্ড, লাব্রাডর এবং নিউফাউন্ডল্যাণ্ডের উপকূলবর্তী এলাকায় আয়ারল্যান্ডবাসী সাধু-সন্ন্যাসী ও নরওয়েবাসীদের দুঃসাহসিক অভিযান। কিন্তু এ সকল বিবরণ মূলত গির্জাকেন্দ্রিক গল্প-কথার মধ্যেই সীমিত ছিল। এদের প্রকৃত তথ্যের সন্ধান খুব কমই পাওয়া গেছে। পরবর্তী সকল সমুদ্র অভিযানের ক্ষেত্রে ক্রিস্টোফার কলম্বাস, আমেরিগো ভেসপুচি, জন ও সিবাসতিয়ান ক্যাবট এবং ভাসকো দ্যা গামা প্রমুখ অভিযাত্রীর আবির্ভাবের জন্য অপেক্ষা করতে হয়েছিল।

অপরদিকে প্রাচ্যের পারস্য, ইসলাম-পূর্ব আরব, ভারত [১] ও চীনে প্রাচীনকাল থেকে মধ্যযুগ পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে নৌ-তৎপরতা অব্যাহত ছিল। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতির বিকাশ বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে সম্পন্ন হয়েছিল সমুদ্র পথে। লক্ষণীয় যে, চীন সাগর অতিক্রম করে ভারত মহাসাগর পর্যন্ত চীনাদের নৌ-তৎপরতা এখন আবার পুনর্জীবিত হয়েছে। খ্রিস্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দী পর্যন্ত আরব সাগর ও তার সীমানা ছাড়িয়ে ব্যাপক নৌ-তৎপরতা ও সমুদ্রপথে চলাচল পারসিকদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতো। ইসলাম-পূর্ব যুগে আরবরা ভারত মহাসাগরের উত্তরাংশে এবং চীন সাগরের দক্ষিণ উপকূলে কয়েক শতাব্দী যাবত তৎপর ছিল। ইসলামের আবির্ভাব ও বিজয়াভিযানের ফলে পরবর্তী একশত বছরের মধ্যে আরবরা মহাসাগরের প্রধান অভিযাত্রীরূপে পরিগণিত হয়। স্থলপথে এমন ব্যাপকতা লাভ করে এবং প্রশাসন ও রাজস্ব আদায়ের কাজে বিস্তারিত ভৌগোলিক তথ্যাবলীর প্রয়োজন দেখা দেয়।

এই নতুন জ্ঞানই হচ্ছে মুসলমানদের ম্যাপ প্রস্তুতকরণ ও মানচিত্রাংকনের পটভূমি। তাদের জাহাজকে নিরাপদ করা এবং সঠিক সময়ে নৌ-যাত্রা নিশ্চিত করার প্রয়োজন দেখা দেয়। এ্যাস্ট্রল্যাব ও কম্পাস-এর মতো যন্ত্রপাতির নিত্যনৈমিত্তিক ব্যবহার, বায়ুপ্রবাহ ও আবহাওয়া সম্পর্কিত জ্ঞান তাদের বাণিজ্যিক প্রয়োজনে নৌ অভিযানসমূহকে সহজ করে তোলে। বাস্তবতা ও কল্পনার মিশ্রণে রচিত কিছু আকর্ষণীয় কাহিনী এ সকল নৌ অভিযানকে আরো উচ্চকিত করে তোলে। সিন্দবাদ নাবিকের অভিযানের মতো এক শ্রেণীর সাহিত্য গড়ে উঠে, অপরদিকে সোলায়মান সওদাগর, বুজুর্গ ইবনে শাহরিয়ার, আহমাদ ইবনে মজিদ এবং সোলায়মান আল মাহরী রচিত নৌপথের তাত্ত্বিক বর্ণনা সম্পর্কিত সাহিত্যাবলীরও আবির্ভাব ঘটে। সুতরাং

www.waytojannah.com

মুসলমানদের ম্যাপ প্রস্তুতকরণ কার্যাবলীকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন প্রাথমিক পর্যায় এবং পরবর্তীকালের মানচিত্রাংকন তৎপরতা সম্পর্কিত পর্যায়।

প্রাথমিক পর্যায়ের ম্যাপ ছিল নেহায়েত সূচনা এবং তথ্যাবলীর নিরেট সমাহার মাত্র। কিছুকাল পর নবম ও দশম খ্রিস্টাব্দে প্রচুর পরিমাণে ম্যাপ প্রস্তুত হয়ে যায়। এ সকল ম্যাপে বিস্তারিত ও বিশ্লেষণধর্মী আলোচনা সংযোজিত হওয়া ছাড়াও সহজ সরল পদ্ধতি অবলম্বনে যথেষ্ট পরিমাণে তথ্যাবলী সন্নিবেশপূর্বক মানচিত্র অংকন করা হয়। উমাইয়া যুগে কিছু সংখ্যক প্রাথমিক পর্যায়ের ম্যাপ প্রস্তুতকরণ তৎপরতা লক্ষ্য করা যায়। এ সময়ে বেশ কিছু সংখ্যক ম্যাপের সমন্বয়ে 'ইরান এ্যাটলাস' প্রস্তুত করা হয়। এ সকল ম্যাপ এবং স্থানীয় চার্ট সম্পর্কে আল বালাজুরী (ফুতুহুল বুলদান) এবং ইবনুল ফকিহ-এর রচনাবলী থেকে জানা যায়। আব্বাসীয় খিলাফতের প্রাথমিক যুগে খলীফা আল মামুন কর্তৃক নিয়োজিত বিজ্ঞানীগণ ভূ-তাত্ত্বিক পরিমাপ গ্রহণ করেন এবং এই তৎপরতার ফলে বিখ্যাত 'আল সুরাত আল মামুনিয়া' নামে পরিচিত ম্যাপ প্রস্তুত করা হয়। বলা হয়ে থাকে যে উক্ত ম্যাপ টলেমীর ওয়ার্ল্ড ম্যাপের আদলে প্রণীত হলেও এতে তদপেক্ষা অধিক পরিমাণে তথ্যাবলী সংযোজন করা হয়েছিল। তবে এই ম্যাপ হারিয়ে যাওয়ায় আরবদের মানচিত্রাংকনের ইতিহাস প্রণয়নের ক্ষেত্রে এক দুঃখজনক ছেদ রচিত হয়।

আল খাওয়ারিযমী ছিলেন প্রথম পর্যায়ের ম্যাপ প্রস্তুতকারকদের অন্যতম। বস্তুত তাঁর বিখ্যাত 'কিতাব সুরাতুল আরদ' গ্রন্থের প্রধান বিষয়বস্তু ছিল ম্যাপ-এর ব্যাখ্যা করা। এ সকল ম্যাপে কোন জালি (grid)-র ব্যবহার, অক্ষাংশ এবং দ্রাঘিমাংশ চিহ্নিত করা হয়নি। খুব সম্ভব খাওয়ারিযমী খলীফা আল মামুন কর্তৃক পৃথিবীর ম্যাপ প্রস্তুতকরণ কার্যক্রমে শরীক ছিলেন। ঐ সময়ের উল্লেখযোগ্য ম্যাপের মধ্যে যেগুলো সাধারণভাবে ব্যবহৃত হতো, তাদের প্রস্তুতকারকগণ হলেন-আল জায়হানী, আল মাকদিসি এবং আল মাসউদী। রেকর্ড হিসেবে এগুলো উপযোগী হলেও মানচিত্রাংকনের কলা কৌশলের বিচারে ছিল অনুন্নত এবং যথার্থতার বিচারে শূন্যমানের। এ সকল ম্যাপ এবং এমনকি আল বলখী চিন্তাধারা (আল বলখী, আল ইস্তাখরী এবং ইবনে হায়কল) কর্তৃক কিছুটা বিশ্লেষণধর্মী প্রচেষ্টার মাধ্যমে প্রণীত ম্যাপসমূহেও সুন্দরভাবে সজ্জিতকরণের প্রবণতা অধিক হারে লক্ষ্য করা গেছে। তবে এ সকল ম্যাপে সাধারণভাবে গ্রীড (grid), পরিমাপক (scale) এবং বিশ্লেষণাত্মক পদ্ধতি তথা অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমাংশের ভিত্তিতে অবস্থান (co-ordinates) নিরূপণ ইত্যাদি কৌশল ব্যবহার করা হয়নি।

এরূপ ম্যাপের উদাহরণ হচ্ছে আল জায়হানী কর্তৃক প্রস্তুতকৃত আরব উপদ্বীপ ও তৎসংলগ্ন এলাকার ম্যাপ, আল মাকদিসি কর্তৃক প্রণীত মিশরের ম্যাপ এবং ইবনে

www.waytojannah.com

হায়কল কর্তৃক প্রণীত আরবদেশ, সেচ ব্যবস্থাসহ মিশর ও ইরাকের ম্যাপ। এ সকল ম্যাপ প্রয়োজনীয় তথ্য প্রকাশ করে, কিন্তু প্রস্তুত প্রণালীর দিক থেকে ছিল খুবই সরল প্রকৃতির। আল মাসউদীর ম্যাপও বিশদভাবে প্রণীত হয়নি। তারপরও তা থেকে তৎকালে জানা পৃথিবী সম্পর্কে টলেমীর তুলনায় স্পষ্টতর ধারণা পাওয়া যায়। আল মাসউদীর ম্যাপে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াকে আফ্রিকা থেকে পৃথকরূপে দেখানো হয়েছে এবং ভূমধ্যসাগর, আল মাগরিব, আন্দালুসিয়াকে স্পষ্টভাবে, সাকালিবাকে উত্তর দিকে, ভারত ও সিন (চীন)-কে পূর্বদিকে দেখানো হয়েছে। নীল নদ ও তার উৎসকে স্পষ্টরূপে দেখানো হয়েছে। মাকদিসি তাঁর রচিত 'আহসান আত তাকাসিম' গ্রন্থে ম্যাপ প্রস্তুতকরণ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। তিনি উল্লেখ করেছেন যে তাঁর ম্যাপে তিনি প্রাকৃতিক পরিবেশ ও মানুষের তৈরী পরিবেশকে চিহ্নিত করার জন্য রঙের ব্যবহার করেছেন। তিনি চলাচলের পথকে লাল রং, মরুভূমি সোনালী ও হলুদ রং, পাহাড় বাদামী রং, নদী ও সাগরকে নীল রং দ্বারা চিহ্নিত করেছেন।[২]

আল বলখী এবং আল ইস্তাখরীর প্রস্তুতকৃত ম্যাপগুচ্ছ পরবর্তীকালে ইবনে হায়কল কর্তৃক আরো সমৃদ্ধ করা হয়। এগুলোকে কখনো কখনো 'ইসলামী এ্যাটলাস'[৩] নামে অভিহিত করা হয়ে থাকে। আল বলখী তাঁর প্রণীত ভূগোল গ্রন্থে আলোচ্য বিষয়ের ব্যাখ্যাকল্পে ম্যাপ অংকন করেছিলেন। এতে ইসলামী দুনিয়ার ব্যাপক এলাকাকে ধারণ করা ছাড়াও বিভিন্ন অঞ্চল ও দেশ যেমন মরক্কো, মিশর, সিরিয়া এবং ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের পৃথক পৃথক ম্যাপ অংকন করা হয়েছিল। দুর্ভাগ্যবশত এ সকল ম্যাপের সবগুলোই হারিয়ে গেছে। তবে সুখের কথা, আল ইস্তাখরী এবং ইবনে হায়কল আলোচ্য ম্যাপগুলো ব্যবহার করেছিলেন এবং এ সকল ম্যাপের কিছু সংখ্যক নকলও তৈরী করেছিলেন। প্রস্তুতকৃত ম্যাপের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ছদ্মনামা লেখক ফারসী ভাষায় রচনা করেছিলেন 'হুদুদ আল আলম' (৩৭২/৯৮৩)। এই ম্যাপটিও বিলুপ্ত হয়ে গেছে।

আল বিরুনীর বহুমুখী প্রতিভা ম্যাপ প্রস্তুতকরণেও নিয়োজিত হয়েছিল। তিনি তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ 'কিতাবুল তাফহীম'-এ পৃথিবীর ম্যাপ অংকন করেছিলেন এবং কিছু সংখ্যক ম্যাপ 'প্রাচীন জাতিসমূহের ইতিহাস' (আল আছার আল বাকিয়াহ) নামক গ্রন্থে সংযোজন করেছিলেন। এ ছাড়া তিনি ভূ-কেন্দ্রিক ও মহাকাশভিত্তিক ম্যাপ প্রস্তুত করতে গিয়ে ত্রি-মাত্রিক পদ্ধতিও অন্যান্য অভিক্ষেপণ পদ্ধতি ব্যবহার করেছিলেন।

মহান ভূগোলবিদ আল ইদরিসি (১১৫৪ খ্রিস্টাব্দ) তাঁর বিশাল জ্ঞানভাণ্ডর ও অংকনের দক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে সমতল স্থানে, গোলকে এবং রূপার পাতে ম্যাপ প্রস্তুত করেছিলেন। তাঁর অংকনকৃত কিছু ম্যাপ অদ্যাবধি তাঁর দক্ষতা, তৎকালীন দুনিয়া ও পশ্চিমা জগত সম্পর্কে তাঁর অসাধারণ জ্ঞানের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হিসেবে রয়ে

www.waytojannah.com

গেছে। তিনি তাঁর প্রস্তুতকৃত ম্যাপে ব্রিটেন (ছুলি), ফ্রান্স (আফ্রানসিয়াহ), নরওয়ে (ফেলুভিয়াহ), বাল্টিক সাগর এবং সাইবেরিয়া (গগ এবং ম্যাগগ) ইত্যাদি স্থান চিহ্নিত করেছিলেন। তাঁর অধিকাংশ কাজ সম্পন্ন হয়েছিল খ্রিস্ট পরবর্তী দ্বাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে সিসিলি পালেরমোতে তাঁর পৃষ্ঠপোষক রাজা দ্বিতীয় রজার-এর রাজদরবারে।

আল বলখী চিন্তাধারার অনুসরণে আরো যাঁরা ম্যাপ প্রস্তুতকরণে অবদান রেখেছিলেন তাঁদের মধ্যে কাযভিনি এবং আল ওয়ারদির নাম অন্তর্ভুক্ত। আবদুর রহমান আল সুফি (১০৪০ খ্রিস্টাব্দ) কায়রোতে দু'টি ভূ-কেন্দ্রিক গোলক তৈরী করেছিলেন এবং মণ্ডসিল-এর ইবনে হুলা (১২৭৫ খ্রিস্টাব্দ) তৈরী করেছিলেন ব্রোঞ্জ নির্মিত ভূ-গোলক। আর কাশগরি (১৩৩৩-৩৫) তাঁর 'দিওয়ান লুঘাতুল তুর্ক'৪ গ্রন্থের সংযোজনী হিসেবে পৃথিবীর মানচিত্র অংকন করেছিলেন।

ম্যাপ ও চার্ট প্রস্তুত করা এবং ব্যবহার করার সাথে নৌপথে চলাচলের একটি গভীর যোগাযোগ সব সময়ই ছিল। অনুমান করা হয়ে থাকে যে, মুসলমানদের মানচিত্র অংকন প্রচেষ্টা এবং তাদের ব্যবহৃত উপকরণের ভিত্তিতেই ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ শতাব্দীর 'কাতালান পোর্টেলানো চার্ট' ইত্যাদি প্রস্তুত করা হয়েছিল। পরিপূর্ণ রূপ লাভ করার পূর্ব পর্যন্ত সম্ভবত এভাবেই প্রাথমিক ধারার ঐতিহ্য তৈরী হয়েছিল।

আরো কিছুকাল পর মুসলমান ব্যবসায়ী ও নাবিকদের মাধ্যমে ভারত মহাসাগর, আরব সাগর এবং দক্ষিণ পূর্ব-এশিয়ার সাগরসমূহ সম্পর্কিত জ্ঞানের বিস্তৃতি ঘটে। এর ফলে নাবিকদের দ্বারা পুস্তক রচনা, যন্ত্রপাতির ব্যবহার এবং চার্ট প্রস্তুতকরণের কাজ এগিয়ে চলে। এই শ্রেণীর গ্রন্থের মধ্যে দু'টি অসাধারণ গ্রন্থ হলো আহমাদ ইবনে মজিদ রচিত 'নৌচলাচল সম্পর্কিত নীতিমালা' (কিতাবুল ফাওয়াইদ, ১৪৯০ খ্রিস্টাব্দ), সুলায়মান আল মাহরী রচিত 'উলুম আল বাহরিয়াহ' (সাগরসমূহ সম্পর্কিত জ্ঞান)। ইবনে মজিদ তাঁর '৩০ ন্যটিক্যাল' সম্পর্কিত বিবরণ এতে প্রকাশ করেন। এটি ছিল নৌচলাচলের সমস্যা সম্পর্কিত তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক বিষয়ের, বিশেষ করে ভারত মহাসাগর ও চীন সাগর সম্পর্কিত, নির্দেশিকা গ্রন্থ। এই গ্রন্থে সমুদ্রপথ, বন্দরসমূহ এবং কম্পাস সহ৫ বিভিন্ন যন্ত্রপাতি সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে। ১৪৯৮ সালে ইবনে মজিদই ভাস্কো দা গামাকে মালিন্দি (কেনিয়া) থেকে কালিকট (দক্ষিণ ভারতের মালাবার উপকূলে) পর্যন্ত যুগান্তকারী অভিযাত্রাকালে পথ দেখিয়ে এনেছিলেন।

ইবনে মজিদের এই ধারা এগিয়ে নিয়েছিলেন তাঁরই কনিষ্ঠ সমসাময়িক সুলায়মান বিন আহমাদ বিন সুলায়মান আল মাহরী। তিনি ভারত মহাসাগর ও এর অন্তর্গত দ্বীপসমূহ, ভারত মহাসাগরের উপর দিয়ে যাওয়া চলাচলের পথসমূহ এবং ন্যটিক্যাল সমস্যা সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন। আল মাহরী রচিত গ্রন্থ অনুবাদ

www.waytojannah.com

Contents

করেছিলেন বিখ্যাত তুর্কী এডমিরাল সিদি আলী। ১৫৫৪ খ্রিস্টাব্দে অনূদিত এই গ্রন্থের নাম ছিল (Mhuit) (সাগর)। অল্প কিছুকাল আগে ১৫২৩ খ্রিস্টাব্দে পিরি রইস সমুদ্রবিজ্ঞান সম্পর্কিত একখানা সংকলন রচনা করেন (এই গ্রন্থের নাম ছিল 'বাহরিয়াহ')। এতে ভূমধ্যসাগর ও তার তীরবর্তী সকল অংশের ম্যাপসহ বিস্তারিত তথ্য সন্নিবেশ করা হয়েছিল।

মুসলমান ভূগোলবিজ্ঞানীদের দ্বারা প্রস্তুতকৃত বেশ কিছু ম্যাপ ও গ্লোব (গোলক) হারিয়ে গেছে, তবে এখনো যেগুলোর অস্তিত্ব আছে, তা থেকে ভূগোলের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট মানচিত্রাংকন বিষয়ে তাদের ব্যাপক আগ্রহ এবং নৌবিদ্যায় তাদের অবদান সম্পর্কে যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। যুবরাজ ইউসুফ কামাল এবং তাঁর সহযোগী গবেষক কনরাদ মিলার ও জে. এইচ ক্রেমার এই মানচিত্র অংকনের বিষয়ে যথেষ্ট আলোকপাত করেছেন।

তথ্যপঞ্জি

১. পান্নিকার, India and Indian Ocean পৃ. ২২-২৩
২. মাকদিসি, আহসান আল তাকাসিম' (কনস্টানটিনোপল, পাণ্ডুলিপি) পৃ. ৮
৩. কে মিলার; 'Mappal Arabicae'।
৪. আহমাদ, Muslims Contributions to Geography, পৃ. ১৩০-৩১।
৫. Encyclo, Islam. খ-৪র্থ, পৃ. ৩৬৫, আরো দেখুন, জি. ফাররানদ রচিত Introduction a L'stronomic Natique (প্যারিস; ১৯২৮)
৬. ইউসুফ কামাল: Monumenta Cartographica etc. লেইডেন, ১৯৩৫, (দেখুন ম্যাপ ও টীকাসমূহ) এবং Encyclop. Islam, নতুন সংস্করণ 'Djughrafia'।

www.waytojannah.com

সপ্তম অধ্যায়

মুসলমানদের ভূগোল বিষয়ক রচনাবলীর উৎকর্ষতা

ইতোপূর্বে উপস্থাপিত ঐতিহাসিক পর্যালোচনায় এটা স্পষ্ট হয়েছে যে মুসলমানদের বিজ্ঞানাশ্রয়ী ভূগোল বিষয়ক রচনাবলী অতি উচ্চমানসম্পন্ন ছিল। ভূগোল বিষয়ক চিন্তাভাবনা, সমকালীন ঘটনা ও পরিস্থিতিকে ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠত্বের কারণ তাঁদের কিছু সংখ্যকের অবদান অন্য অনেককে ছাড়িয়ে গেছে। নিম্নে আল মাসউদী, আল মাকদিসির রচনাবলী এবং ইখওয়ানুস সাফা, আল বিরুনী, ইবনে বতুতা ও ইবনে খালদূনের চিন্তাধারায় ভৌগোলিক অবদান সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

আল মাসউদী ঃ আবুল হাসান আলী বিন হুসাইন

আল মাসউদী ব্যাপকভাবে সফর করে ইসলামী দুনিয়ার বহু এলাকা স্বচক্ষে দেখেছেন। হিজরী ৩৪৫/৯৫৬ খ্রিস্টাব্দে তিনি ফুসাত-এ মৃত্যুবরণ করেন। একজন পরিব্রাজক হিসেবে ব্যাপক অভিজ্ঞতার সাথে যুক্ত হয়েছিল তাঁর সময়ের আগের বিজ্ঞান, ইতিহাস ও ভূগোল-সাহিত্য সম্পর্কে তাঁর ব্যাপক অধ্যয়ন। তাঁর প্রদত্ত ভূগোল বিষয়ক বর্ণনা, মন্তব্য ও তুলনামূলক পর্যালোচনাসমূহ নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে মণ্ডিত ছিল। সারটন-এর মতে[১] তাঁর (মাসউদীর) রচনাবলী যে কোন সময়ের জন্য মূল্যবানরূপে বিবেচিত হবে। এই পণ্ডিত ব্যক্তি (সারটন) তাঁকে (মাসউদীকে) অভিহিত করেছেন সকল সময়ের শ্রেষ্ঠ পরিব্রাজক ও ভূগোলবিদ হিসেবে। তাঁর মতে মাসউদীর কৌতূহল ছিল চিরন্তনী প্রকৃতির এবং তাঁর রচিত প্রধান গ্রন্থটি প্রকৃতই বিশ্বকোষের[২] আঙ্গিকে ও বৈশিষ্ট্যে প্রণীত হয়েছে। এর লেখনী ছিল রূপকথার চাইতে সুদূরপ্রসারী এবং মধ্যযুগীয় ইউরোপের[৩] ভূগোলবিদগণের কাছে এক অপার বিস্ময়।

তিনি ভৌত ভূগোল, জৈব ভূগোল, মানবিক ভূগোল, মানব বসতির বিবরণ, আঞ্চলিক ও অর্থনৈতিক ভূগোল সম্পর্কে বুদ্ধিবৃত্তিক এবং পরিব্রাজকসুলভ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে সমান দক্ষতায় রচনাকার্য সম্পন্ন করেছেন। মানব সংস্কৃতি ও পরিবেশ সম্পর্কে তাঁর ছিল গভীর অন্তর্দৃষ্টি। আবহাওয়াবিদ্যা, ভূ-তত্ত্ব, সমুদ্রবিজ্ঞান এবং ভৌত ভূগোল

www.waytojannah.com

বিষয়ে তাঁর অবদান এমনকি আধুনিক ভূগোল বিজ্ঞানীদের মধ্যেও যথেষ্ট আগ্রহ সৃষ্টি করেছে।

আল মাসউদী মানব জীবনে প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রভাবের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। পানি, মাটি, উদ্ভিদায়ন, আঞ্চলিক ভূ-সংস্থান (Topography) ও জলবায়ুর প্রবল প্রভাবের কথা স্বীকার করেছেন। তবে তিনি পরিবেশগত নিয়তিবাদে বিশ্বাসী ছিলেন না। যাযাবর জীবন, পরিবেশ ও নাগরিক সম্প্রদায় সম্পর্কিত তাঁর গবেষণাবলী বিখ্যাত সমাজতাত্ত্বিক চিন্তাবিদ ইবনে খালদূনের দৃষ্টিতে অতি উঁচুমানের বলে বিবেচিত হয়েছে। তাঁর গভীর অন্তর্দৃষ্টিমূলক পর্যবেক্ষণসমূহ প্রকাশিত হয়েছে তাঁরই রচিত 'মারুজ আল যাহাব' এবং 'কিতাবুত তানবিহ' নামক বিখ্যাত দুটি গ্রন্থে। তিনি পশু ও উদ্ভিদের যার যার পরিবেশে নিজেদেরকে মানিয়ে নেয়ার বহু উদাহরণ উপস্থাপন করেছেন। সাগরসমূহের মধ্যে বিশেষ করে উত্তর সাগর, ভূমধ্যসাগর, আরব সাগর ও ভারত মহাসাগরের মধ্যে পারস্পরিক সংযোগ সম্পর্কিত তাঁর মতামত ছিল সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ।

বস্তুত মধ্যযুগের খুব অল্প সংখ্যক ভূগোলবিদ আল মাসউদীর উঁচুমানের ভৌগোলিক জ্ঞান ও চিন্তাভাবনাকে উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাঁর সুপরিচিত গ্রন্থাবলী থেকে তাঁর চিন্তাধারার ব্যাপকতা সম্পর্কে ধারণা করা যায়। আধুনিক ভূগোলবিজ্ঞানীগণের উচিত আল মাসউদীর জ্ঞানগর্ভ চিন্তাধারার সাথে পরিচিত হওয়া এবং সেগুলো আত্মস্থ করা।[৪]

আল মাকদিসিঃ আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ বিন আহমাদ

বস্তুত সমগ্র মধ্যযুগের মধ্যে আল মাকদিসি একজন স্মরণীয় ভূগোলবিদ। ৯৪৭-৪৮ খ্রিস্টাব্দে তিনি যেরুজালেমে জন্মগ্রহণ করেন। বর্ণনাত্মক ভূগোল ও মানচিত্রাংকন ভূগোল – এই উভয়বিধ ক্ষেত্রে তাঁর অবদান ছিল অতীব গুরুত্বপূর্ণ।

ভৌগোলিক জ্ঞানের অন্তর্নিহিত মর্যাদায় তিনি বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি এ বিষয়ের মৌলিক শিক্ষা প্রদান ও সকল পেশার ক্ষেত্রে উক্ত শিক্ষালব্ধ জ্ঞান প্রয়োগের উপর গুরুত্বারোপ করতেন। মানবিক ও পরিবেশগত সমস্যা সম্পর্কে তথ্য ও ব্যবহারিক জ্ঞান লাভের জন্য তিনি বিস্তর সফর করেছেন। তিনি তাঁর বিখ্যাত 'আহসান আত তাকাসিম ফি মারফাত আল আকালিম' গ্রন্থে এ সকল নীতিমালা স্পষ্টভাবে তুলে ধরেছেন এবং এ সকল নীতিমালার প্রতি এতই জোরালো সমর্থন প্রদান করেছেন যে, এ কারণে মানচিত্র অংকন বিদ্যা ভূগোল বিজ্ঞানের কাছে ঋণী হয়ে থাকবে। ভৌত ও সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যসমূহের চিত্রানুগ বর্ণনা দেয়ার জন্য তিনি মানচিত্রে[৪] চিহ্ন ব্যবহারের যে পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন তাকে প্রায় আধুনিক বলা যায়। তাঁর রচিত গ্রন্থের সাথে সংযোজিত তাঁরই অংকিত ম্যাপ সেভাবেই প্রস্তুত করা হয়েছে। আল মাকদিসি ভ্রমণ

www.waytojannah.com

ও অভিযানসমূহের মাধ্যমে সাগর সম্পর্কে বাস্তব জ্ঞান অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। আরব সাগর, লোহিত সাগর ও অন্যান্য সাগর সম্পর্কে[৬] তাঁর দেখা দেয়া তথ্য নৌপথে চলাচলকারীদের অত্যন্ত উপযোগী ছিল। তিনি ভৌত ও মানবিক অবস্থা এবং সামগ্রিক পরিবেশের[৭] সাথে জীবন বৈচিত্র্যের সম্পর্কের ভিত্তিতে দেশ ও অঞ্চলসমূহকে কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করেছেন। শহর ও নগর জীবন সম্পর্কে তাঁর গবেষণা আধুনিক ভূগোলবিদগণের প্রশংসা কুড়াবে। তাঁর নিজ শহর জেরুযালেমের বর্ণনা তাঁর অনুসৃত পদ্ধতির শ্রেষ্ঠ উদাহরণ।

আল মাকদিসি ভূ-গর্ভস্থ পানি, সেচ ব্যবস্থা, উন্নতমানের ফসল উৎপাদন এবং গাছের কলম লাগানোর মতো বিষয়ের প্রতিও আগ্রহ প্রদর্শন করেছেন। অর্থনৈতিক পণ্য এবং তাদের বন্টন ব্যবস্থা সম্পর্কে প্রদত্ত তাঁর মন্তব্য তৎকালীন অর্থনৈতিক ভূগোল সম্পর্কিত জ্ঞানকে সমৃদ্ধ করেছে। গুরুত্বপূর্ণ বন্দর ও মুসলিম দেশসমূহের ব্যবসায়-বাণিজ্য সম্পর্কে তিনি বর্ণনা করেছেন। এভাবে তিনি তাঁর মানবিক ভূগোলের তত্ত্বকে মজবুত ভিত্তি প্রদান করেন। আর এসবই ছিল দশম শতাব্দীর মুসলমান ভূগোল বিজ্ঞানীদের স্মরণীয় অবদান।

ইখওয়ানুস সাফা

ইখওয়ানুস সাফা চিন্তাধারার অনুসারী লেখকগণ ভূগোল বিষয়ক ধ্যান-ধারণার বিকাশ ও ব্যাখ্যা প্রদানের ক্ষেত্রে মূল্যবান অবদান রাখেন। মানবিক কর্মকাণ্ডে এ সকল ধ্যান- ধারণার প্রয়োগের ক্ষেত্রেও তাঁরা যে অবদান রেখেছেন তা ছিল খুবই উঁচুমানের। উদারমনা একদল লোক বিজ্ঞান ও দর্শনের চর্চা করার উদ্দেশ্যে ইখওয়ানুস সাফা ছদ্মনাম ধারণ করেন। তাঁদের এই সংঘের পূর্ণ নাম ছিল 'ইখওয়ান আস সাফা ওয়া খুল্লান আল ওয়াফা ওয়া আহলাল হামদ ওয়া আবনাল মাজদ'। ৯৮৩ খ্রিস্টাব্দে বসরায় গোপনে এই সংঘ প্রতিষ্ঠা করা হয়। বস্তুত আবূ হাইয়ান আল তাওহিদী (হিজরী ৪০০/১০০৯ খ্রিস্টাব্দ-এর কাছাকাছি সময়ে মৃত্যু), যিনি নিজেও ছিলেন একজন বিখ্যাত লেখক এবং সংঘের কয়েকজন বিশিষ্ট সদস্যের বন্ধু, তিনি প্রকাশ না করলে উত্তর কালের কারো পক্ষে এ ব্যাপারে তেমন কিছু জানা সম্ভব হতো না।[৮] হাইয়ান দলের মাত্র পাঁচজন সদস্যের নাম প্রকাশ করেছিলেন। যদিও মনে করা হয়ে থাকে যে সর্বমোট তের জনের নাম জানা গিয়েছিল।

ইখওয়ানুস সাফা বিভিন্ন বিষয়ের উপর ধারাবাহিকভাবে বেশ কিছু সংখ্যক প্রবন্ধ রচনা করেছিল। তবে তাদের এই প্রবন্ধাবলীর মধ্যে সবচাইতে বিখ্যাত ছিল বিশ্বকোষের আঙ্গিকে সংকলিত 'রাসাইল ইখওয়ানুস সাফা'। এই রচনাবলী ছিল মূলত কিছু সংখ্যক লেখকের যৌথ বুদ্ধিবৃত্তিক প্রয়াস, যে প্রয়াসের মাধ্যমে কমপক্ষে তিপ্পান্নটি প্রবন্ধ রচিত হয়েছিল। ধারণা করা হয়ে থাকে যে ইখওয়ানুস সাফার সকল

www.waytojannah.com

সদস্য মুসলমান ছিলেন এবং তাঁরা বিশেষ কোন মাযহাবভুক্ত ছিলেন না। যেহেতু ইখওয়ানুস সাফা ছিল একটি গোপন দল, সেহেতু নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি ও বিশ্বস্ত যোগাযোগের মাধ্যমেই কেবল সংঘের সদস্য হওয়া যেত। তাঁরা প্রায় সকল ভৌত বিজ্ঞানের উপর শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন এবং একটি ইউটোপিয়া বা কল্পরাজ্য প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখতেন। তাঁদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল জ্ঞানের প্রসার ঘটানো এবং 'দওলাত আহলুল খায়রি' (ভাল মানুষের রাষ্ট্র) প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত বৃহত্তর ইসলামী সম্প্রদায়কে একটি সচেতন সভায় পরিণত করা।

তাঁরা বিজ্ঞানকে তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন। যেমন গণিত, পদার্থবিজ্ঞান ও অধিবিদ্যা। ভূগোলকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল গণিত বিভাগে।

তাদের ভূগোল বিষয়ক রচনাবলীর মধ্যে ভৌত ভূগোল, জৈব ভূগোল এবং মানবিক ভূগোলসহ বেশ কয়েকটি ক্ষেত্র অন্তর্ভুক্ত ছিল। রাসাইল (প্রবন্ধাবলী) গ্রন্থে ভূগোল ও আবহাওয়াবিদ্যা সম্পর্কিত দুটি অধ্যায় সংযুক্ত ছিল, যাতে গ্রীক চিন্তাধারার যথেষ্ট প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। তাঁরা আবহাওয়া অঞ্চলের প্রচলিত ধারণা সম্পর্কেও বক্তব্য রেখেছেন। চন্দ্রগ্রহণ এবং জোয়ার ভাটার কারণ ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন। নিম্নতর স্তর থেকে উচ্চতর স্তরে জীবনের বিবর্তনের বিষয় নিয়েও তাঁরা নাড়াচাড়া করেছেন। তাঁরা সাতটি গ্রহের সব কটির গতি আবর্তন ও বিবর্তনকে স্বীকৃতি প্রদান করেছেন। মহাশূন্যের বিশালতা তাঁরা উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছিলেন। পৃথিবীকে তাঁরা গোলাকার মনে করতেন। অবশ্য তাঁরা বিশ্বে পৃথিবীর অবস্থান সম্পর্কে পিথাগোরাস ও ডিমোক্রিটাসের ধারণার সাথে তাঁদের নিজেদের ধারণাকে গুলিয়ে ফেলেছিলেন।

তাঁদের ভূ-তাত্ত্বিক অঙ্গ সংস্থান (Topography) সম্পর্কিত ধারণা অনুযায়ী তাঁরা বিশ্বাস করতেন যে, আবহাওয়া ও প্রাকৃতিক ভূমিক্ষয়জনিত কারণে ভূ-পৃষ্ঠের উপর প্রভাব পড়ে। পাহাড়-পর্বত সৃষ্টি হওয়ার কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তাঁরা বলেন যে, ভূ-অভ্যন্তরে স্তর বিন্যস্ত আকারে শিলার অবস্থান রয়েছে। পৃথিবীর আলোড়নের ফলে সেগুলো ভাঁজ হয়ে পাহাড়-পর্বতের সৃষ্টি হয়েছে। তাঁরা বিশ্বাস করতেন, পৃথিবীর অভ্যন্তরভাগ খুবই উত্তপ্ত অবস্থায় এবং গন্ধক মিশ্রিত তরল পদার্থ দ্বারা পরিপূর্ণ। তাঁদের মতে গুহায় জমাট বাঁধা বরফ এবং হিমবাহের বরফ গলে নদীর সৃষ্টি হয়েছে। বরফ গলা বৃদ্ধি পাওয়া ও অতিবৃষ্টির কারণে নদীতে বন্যা সৃষ্টি হয়ে থাকে বলে তাঁরা মনে করতেন। তাঁরা বায়ুমণ্ডলের বৈশিষ্ট্য, বায়ুর নিম্নচাপ, সঞ্চরণশীল প্রবাহ ইত্যাদি ধারণার প্রবক্তা ছিলেন। এ ছাড়া তাঁরা বায়ুপ্রবাহের উৎপত্তি ও গতিধারা সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।

বিবর্তন প্রক্রিয়ার ধারণাকে কেন্দ্র করে তাঁদের জৈব ভূগোলের ধারণা গড়ে উঠেছে। উদ্ভিদের উৎপত্তি এবং অঞ্চলভিত্তিক বন্টন বিষয়ে তাঁদের ছিল ব্যাপক

www.waytojannah.com

আগ্রহ। তাঁরা মনে করতেন যে, মাটি ও জলবায়ুর সাথে উদ্ভিদের জন্মের সম্পর্ক আছে।

ভূগোলের প্রতি আল বিরুনীর আগ্রহ

ভূগোলের প্রতি আল বিরুনীর অপরিসীম আগ্রহের ফলে তাঁর কিছু কিছু গুরুত্বপূর্ণ বৈজ্ঞানিক অবদান সৃষ্টি হয়েছে। তাঁর অধিকাংশ মূল্যবান গ্রন্থে কোন না কোনভাবে ভূগোল বিষয়ক জ্ঞানের প্রকাশ ঘটেছে যথেষ্ট গুরুত্বের সাথে। ভূগোলের মৌলিক উপাদানসমূহ করায়ত্ত করে আল বিরুনী যেভাবে বিষয়বস্তুর উপস্থাপন করেছেন তার বহু উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রয়েছে। তবে সম্ভবত ভূগোল সম্পর্কে তাঁর জ্ঞানের শ্রেষ্ঠতম প্রকাশ ঘটেছে তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ কিতাবুল হিন্দ-এর পাতায় পাতায়। এই বিখ্যাত গ্রন্থে আল বিরুনী ভারতের শুধুমাত্র প্রাকৃতিক অবস্থার বর্ণনাই প্রদান করেননি, পাশাপাশি সমাজব্যবস্থা, ধর্মীয় বিশ্বাস ও হিন্দুদের বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি সম্পর্কে যে বর্ণনা প্রদান করেছেন, সে বিষয়ে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত তাঁর সমকক্ষ কেউ ছিল না। তাঁর কাছে ভূগোল শুধু বর্ণনাত্মক বিষয় নয়, এটি পরিমাপমূলকও বটে।[৯]

আল বিরুনীর কিতাবুল হিন্দ (Al-Biruni's India)[১০] থেকে যথাসম্ভব বিন্যস্তাকারে নিম্নে কিছু সারসংক্ষেপ উপস্থাপন করা হলো।

ভৌত বা প্রাকৃতিক উপাদান

বসতিযোগ্য দুনিয়ার দক্ষিণ-পূর্ব অংশে অবস্থিত ভারত মহাসাগর সম্পর্কে আল বিরুনী বলেন,[১১] "এই সাগরের নামকরণ করা হয়েছে এর অন্তর্গত কিছু সংখ্যক দ্বীপ অথবা এর সীমানা চিহ্নিতকারী উপকূলীয় এলাকার ভিত্তিতে..... অতএব ভারতীয় উপমহাদেশ দ্বারা সীমানা চিহ্নিতকারী সাগরকে বলা হয় ভারত মহাসাগর।" ভারতীয় উপকূল শুরু হয়েছে মাকরানের রাজধানী তিয থেকে এবং দক্ষিণ-পূর্ব দিকে আল দাইবাল (দেবল)-এর দিকে অগ্রসর হয়েছে। এরপর তা কছ এবং সোমনাথ হয়ে ক্যামবে উপসাগর পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছে, পশ্চিম উপকূলে থানা পর্যন্ত বিস্তৃত হওয়ার পর রয়েছে বিশাল উপসাগর, যেখানে আছে সরণদ্বীপ (সরণদ্বীপ-সিংহল)। আল বিরুনী দক্ষিণ উপকূলের বারই (বারোদা), কানবায়াত (ক্যাবে), বিহরোজ (ব্রোচ), টানা (থানা), রামশের (রামসেশভরম); পানজায়াভার (তানজোর) এবং সেতুবন্ধ (আদম সেতু) ইত্যাদি সহ বেশ কিছু স্থানের নাম উল্লেখ করেছেন। তিনি ভারত মহাসাগরের যে সকল দ্বীপের নাম উল্লেখ করেছেন, সেগুলো হলোঃ "যাবাজ – যাকে হিন্দুরা সুবর্ণদ্বীপ অর্থাৎ স্বর্ণদ্বীপ নামে অভিহিত করতো। এই মহাসাগরের পশ্চিমাঞ্চলীয় দ্বীপগুলোর নাম যানজ (নেগ্রোজ), মধ্যাঞ্চলীয় দ্বীপগুলোর মধ্যে রয়েছে রাম দ্বীপপুঞ্জ এবং দিভা দ্বীপপুঞ্জ (মালদ্বীপ এবং লাকা দ্বীপ), তন্মধ্যে কুমাইর

www.waytojannah.com

Contents

(মাদাগাসকার) দ্বীপপুঞ্জও রয়েছে।" এ ছাড়া সিংহল সম্পর্কে বেশ কয়েকবার উল্লেখ করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে লেখক উল্লেখ করেছেন যে এই দ্বীপ রাক্ষসদের দুর্গ হিসেবে পরিচিত। একই সাথে তিনি রাবণের বিরুদ্ধে রামের যুদ্ধ এবং সীতার নির্বাসন সম্পর্কিত প্রচলিত কাহিনীরও উল্লেখ করেছেন। ভারতবর্ষের উত্তর সীমান্তের বর্ণনা দিতে গিয়ে কাশ্মীরের বিস্তারিত খুঁটিনাটি বিবরণ দেয়া হয়েছে এবং সিন্ধু নদের আঁকাবাঁকা গতিপথের বিবরণ দেয়া হয়েছে। আল বিরুনী সেখানকার উঁচু পর্বত, তাদের চুড়া ও অক্ষয় বরফপুঞ্জের কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, পশ্চিম দিকে রয়েছে সিন্ধু উপত্যকা পর্যন্ত বিস্তৃত আফগান উপজাতিসমূহ।[১২] এশিয়ার মধ্যভাগে ভারতের উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম দিকে যেভাবে সর্পিল গতিতে পর্বতমালা এগিয়ে গেছে, তার বিপুলতা ও বিস্তার সম্পর্কে আল বিরুনীর ধারণা ছিল প্রায় সঠিক। আবাসযোগ্য পৃথিবীতে অবস্থিত পর্বতাদির চুড়াসমূহ যে ব্যবধানে একের পর এক সাজানো আছে তার অবস্থান–নকশা দেখলে মনে হবে কোন প্রাণীর মেরুদণ্ডের হাড় পৃথিবীর মধ্য অক্ষাংশের উপর দিয়ে পূর্ব থেকে পশ্চিম দ্রাঘিমাংশ জুড়ে চীন, তিব্বত, তুরস্ক, কাবুল, বাদাখশান, বামিয়ান, ঘোর, খুরাসান, মেদিয়া, আজারবাইজান, রোম সাম্রাজ্য, ফ্রান্স এবং জালালিকা (গ্যালিসিয়ান) অতিক্রম করেছে।[১৩] ভারতবর্ষের উপর সীমান্তের পর্বতসমূহ যেগুলো হচ্ছে বরফাচ্ছাদিত হিমাবান্ত (হিমালয়) তার একটি প্রণালী মধ্য এশিয়ার দিকে গেছে এবং অপর অংশ গেছে ভারতের দিকে। ভারতবর্ষের উত্তর ও পূর্বদিকের পর্বতসমূহ প্রকৃতপক্ষে একই উৎস থেকে এবং একই পর্বতমালার অংশ। এগুলোর কিছু পূর্বদিকে সম্প্রসারিত হয়েছে, অতঃপর দক্ষিণ দিকে বাঁক নিয়ে বিশাল মহাসাগরে (ভারত মহাসাগর) গিয়ে মিশেছে। যে স্থানে এই পর্বতমালা সাগরে প্রবেশ করেছে তাকে বলা হয় 'রামের বাঁধ' (Dyke of Rama)[১৪] অবশ্য ঠাণ্ডা ও গরমের বিবেচনায় এ সকল পর্বত পরস্পরের চাইতে আলাদা।[১৫]

ভূবনাকোসা[১৬] থেকে উদ্ধৃত করে আল বিরুনী বলেন, হিমাবান্ত (হিমালয়) থেকে অবাসযোগ্য পৃথিবীর যে অংশ দক্ষিণ দিকে নেমে এসেছে তাকে বলা হয় ভারতবর্ষ। হিমালয়ের উত্তরে ঐতিহ্যবাহী মেরুপাহাড় অবস্থিত, পৃথিবীতে সবার উপরে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে, যার অহংকারকে কেউ ছুঁতে পারে না।

হিমালয়ের দক্ষিণকে ভারতের বিশাল সমভূমি হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। এই সমভূমির সম্ভাব্য উৎপত্তি সম্পর্কে আল বিরুনীর মতামত যথেষ্ট বিজ্ঞানসম্মত। তিনি বলেছেন, "ভারতের এরূপ একটি সমভূমি উপরোল্লিখিত ভারত মহাসাগরে এসে শেষ হয়েছে এবং অপর তিনটি দিক পাহাড় দ্বারা বেষ্টিত, যার নীচ দিয়ে প্রবাহিত হয় সাগরের পানি। কিন্তু আপনি যদি ভারতের মাটি স্বচক্ষে দেখে থাকেন এবং এর বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে মনোনিবেশ করে থাকেন, তাহলে দেখবেন–গোলাকার পাথরগুলোর

www.waytojannah.com

কথাই ধরুন, মাটির তলদেশ থেকে খুঁড়ে আনুন, যেখানে নদী খরস্রোতা পর্বতের নিকটবর্তী পাথরগুলোর আকার তুলনামূলকভাবে বেশ বড়; যেখানে নদীর স্রোতের বেগ কম এবং পাহাড় থেকে যত দূরে যাবেন–পাথরের আকার হবে তত ছোট। সাগরের কাছে নদীমুখে যেখানে স্রোতের বেগ স্তিমিত হয়ে পড়েছে, সেখানে পাওয়া যায় বালু আকারে চূর্ণবিচূর্ণ পাথর। এসব বিষয়কে বিবেচনায় আনলে আপনি ভাবতে অবাক হবেন যে পুরো ভারতবর্ষ এক সময় ছিল সাগর, যা এক সময় স্রোতের সাথে আসা পলি দ্বারা পর্যায়ক্রমে ভরাট হয়েছে।"[১৭]

ভারতের নদীগুলোর উৎপত্তি সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, এগুলো উত্তরের শীতল পাহাড় থেকে এবং পশ্চিমের পাহাড় থেকে এসেছে। আল বিরুনী ভারতের নদী সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা প্রদান করেছেন। এগুলোর উৎস এবং গতিপথ সম্পর্কে বর্ণনা করতে গিয়ে বিভিন্ন হিন্দুশাস্ত্রের বর্ণনা গ্রহণ করা হয়েছে।[১৮] তিনি এ সকল শাস্ত্রীয় গ্রন্থ থেকে নদীসমূহের নাম এবং যে সকল স্থানের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে তার তথ্যাবলী গ্রহণ করেছেন।

প্রথমত তিনি ভায়ু-পুরানাতে বর্ণিত বিভিন্ন পর্বতগ্রন্থি থেকে উদ্ভূত নদীর কথা উল্লেখ করেছেন। এ সকল নদীর মধ্যে আছে গোদাবরী, ভিমারাঠী (ভিমা), কৃষ্ণা (কিস্টনা), তুঙ্গাভদ্রা, কাবেরী সোনা (সোন), নর্মদা (নারবুদ্দা), তাপি (তাপ্তি) দুর্গা, নন্দা ইত্যাদি। এরপর তিনি আরো বেশ কিছু নদীর তালিকা উপস্থাপন করেছেন। যেমন, সারায়ু (সরজু), গোমতি, কানসিকি (কাসি), গানদাকি (গন্দক) এবং করতোয়া। সিন্ধু (Indus) নদ তুরস্কের উনাঙ পাহাড় থেকে সৃষ্টি হয়েছে। কাশ্মীর এবং গিলগিটের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। তিনি এই নদীর নাম ভেইহান্দ বলেও উল্লেখ করেছেন। বিয়াত্তা নদীকে এই নদীর পশ্চিম তীরে অবস্থিত ঝাওলাম (ঝিলাম) শহরের নামানুসারেও অভিহিত করা হয়ে থাকে। এই নদী প্রায় ৫০ মাইল উজানে জাহরাবার নামক স্থানে কান্দারাহা (চেনাব) নদীর সাথে মিলিত হয়েছে এবং মুলতানের পশ্চিম দিক দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। বিয়াহ (বিয়াস) নদী মুলতানের পূর্ব পাশ দিয়ে প্রবাহিত হয়ে পরে বিয়াত্তা ও কান্দারাহ নদীর সাথে একত্রিত হয়েছে। ভাতুর পাহাড়ের নগরকোট থেকে সৃষ্টি ইভারা রাভী নদী 'কায'-এর পাশ দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। এরপর তিনি পঞ্চম নদী পাঞ্জাবের শাতলাদার (সুতলেজ)-এর কথা উল্লেখ করেছেন।

তিনি বলেছেন যে অতঃপর এই পাঁচটি নদী মুলতানের নিম্নাঞ্চলে পঞ্চনদা (পঞ্চনদ-অর্থাৎ পাঁচটি নদীর মিলনস্থল) নামক স্থানে মিলিত হয়েছে এবং বিশাল জলভাণ্ডার সৃষ্টি করেছে। বন্যার সময়ে এই জলাধার স্ফীত হয়ে প্রায় ১০ ফারসাখ পর্যন্ত–অর্থাৎ প্রায় ৩৭ (১৯৭৩ সালের অস্বাভাবিক বন্যায় যেরূপ হয়েছিল) বিস্তৃতি

www.waytojannah.com

লাভ করে এবং এত উপরে উঠে যে তীরবর্তী সমতল এলাকার গাছের সর্বোচ্চ চূড়া পর্যন্ত স্পর্শ করে। তাই বন্যার পর গাছের সর্বোচ্চ শাখায় আবর্জনাসমূহ এমনভাবে আটকা পড়ে, যেন পাখিরা বাসা বেঁধেছে। তিনি আরো উল্লেখ করেছেন যে একত্রিত স্রোতধারা হিসেবে সিন্ধি নগর 'আরোর' অতিক্রম করার পর মুসলমানরা এই নদীর নামকরণ করেছে মিহরান। অতঃপর এই নদী সোজাসুজি প্রবাহিত হতে থাকে এবং ক্রমশ প্রশস্ত হতে থাকে, পানিও ক্রমশ স্বচ্ছতা লাভ করে। গতিপথে কিছু সংখ্যক দ্বীপ রেখে অবশেষে আল মনসুরাহ-তে এসে পৌঁছে। আল মনসুরাহ এমন একটি স্থান, যেখানে এই নদীর কিছু সংখ্যক শাখা এসে একত্রিত হয়েছে। অতঃপর এই নদী দুটি স্থানে এসে মহাসাগরে মিশেছেঃ একটি লোহারানি (করাচীর নিকটে) শহরের নিকটে এবং অপরটি পূর্বদিকে কছ প্রদেশের সিন্ধু-সাগারা (সিন্দ সাগর)[১৯] নামক স্থানে।

সোমনাথের পূর্বদিকে এক তীরের নাগালের মধ্য (অর্থাৎ তীর ছুঁড়লে যত দূরে গিয়ে পড়া সম্ভব) দিয়ে সারাসতি (সরস্বতি) নদী প্রবাহিত হচ্ছে। গঙ্গা নদী এবং এ নদী সম্পর্কে প্রচলিত বিভিন্ন প্রকার স্তুতির উল্লেখ করে আল বিরুনী হিন্দুদের ধর্মবিশ্বাস উদ্ধৃত করেছেন। তাদের মতে আদিতে এই নদী স্বর্গের মধ্যে প্রবাহিত হয়েছে। 'মাৎস্য পুরানা' থেকে উদ্ধৃত করে তিনি বলেন, "গঙ্গা পৃথিবীতে আসার পর সাতটি শাখায় বিভক্ত হয়েছে। তন্মধ্যে মধ্যবর্তী প্রধান স্রোতধারা গঙ্গা নামে পরিচিত।"[২০] যাউন (যমুনা) নদী কানোজ-এর পশ্চিম দিকের নিম্নাঞ্চলে গঙ্গার সাথে একত্রিত হয়েছে। উভয় নদীর একত্রিত স্রোতধারা গঙ্গাসাগারা নামক স্থানে মহাসাগরে মিলিত হয়েছে। অন্যত্র[২১] উল্লেখ আছে যে ইয়ামুনা (যমুনা) এবং গঙ্গার মিলনস্থলে আছে মহাবৃক্ষ 'প্রয়াগ'। এই বৃক্ষ 'ভাতা' প্রজাতির।

সারাসতি ও গঙ্গামুখের মধ্যবর্তী স্থানে নর্মদা নদীর মুখ অবস্থিত বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এই নদী পূর্বদিকের পাহাড় থেকে নেমে এসে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে চলে গেছে এবং সোমনাথের প্রায় ৬০ ইয়োযানা (প্রায় ১২০ মাইল[২২] পূর্বে বাহরোয (ব্রোচ) শহরের নিকটে সাগরের সাথে মিলিত হয়েছে।

জলবায়ু এবং ঋতু

ঋতু[২৩] প্রসঙ্গে আল বিরুনী বলেছেন যে, অশিক্ষিত লোকেরা একটি বছরকে দু'ভাগে ভাগ করত। কারণ তাদের স্থূল অনুভূতি দ্বারা দুটি অয়ন তথা উত্তরায়ন ও দক্ষিণায়ন পর্যবেক্ষণ করতো। এ ছাড়া নিরক্ষ বৃত্ত থেকে ক্রমশ সরে আসার পরিমাপ এবং সূর্য ও চন্দ্রগ্রহণের হিসেবেও বছরকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়। এই বিভাজন বেশীর ভাগ কম জানা লোকদের জন্য পূর্বোক্ত পদ্ধতির তুলনায় অধিকতর বিজ্ঞানসম্মত। কারণ লেখকের মতে শেষোক্ত পদ্ধতি হিসাবের উপর নির্ভরশীল। প্রতি

www.waytojannah.com

অর্ধবর্ষকে বলা হতো 'কুলা'। উত্তরায়নকে বলা হতো উত্তরা-কুলা এবং দক্ষিণায়নকে বলা হতো দাকশা-কুলা। এই দুটি বিভাজনকে 'গ্রহণের' হিসেবে আবার মোট চারটি ভাগে ভাগ করা হতো। সূর্য যে সময় পর্যন্ত প্রতিটি ভাগের উপর অবস্থান করতো তাকে বলা হতো ঋতু–অর্থাৎ বসন্ত, গ্রীষ্ম, শরৎ এবং শীত। অবশ্য আল বিরুনী এ সাথে আরো তথ্য যোগ করেছেন। তা হলো হিন্দুরা বছরকে চার ভাগে ভাগ না করে ছয় ভাগে ভাগ করেছে। এগুলোকে তারা বলে ঋতু। প্রতিটি ঋতু দুটি সৌর মাস নিয়ে গঠিত। সোমনাথ অঞ্চলের লোকেরা একটি বছরকে তিন ভাগে ভাগ করতো। প্রতি ভাগে থাকতো চার মাস। প্রথমাংশ বর্ষাকাল (বৃষ্টির ঋতু) শুরু হতো আশাধা (আষাঢ় অর্থাৎ জুন-জুলাই) মাস দিয়ে, দ্বিতীয়াংশ মিতাকালা (শীত) এবং তৃতীয়াংশ ছিল উষ্ণকালা (গ্রীষ্মকাল)। মাসসমূহের নাম উল্লেখ করা হয়েছে নিম্নরূপঃ চৈত্র, বৈশাখ, জৈষ্ঠ, আশাধা, স্রাভনা, ভাদ্রপদ, আসতাউজা, কার্তিকা, মার্গশীর্ষ, পৌষা, মাঘ, ফাল্গুন।

আল বিরুনী ভারতবর্ষে[২৪] বারিপাতের বৈচিত্র্য এবং মৌসুমী বায়ুর খামখেয়ালী বৈশিষ্ট্যের বর্ণনা প্রদান করেছেন। ভারতবর্ষে গ্রীষ্মমণ্ডলীয় বৃষ্টি হয়ে থাকে। এ সময়কে বলা হয় বর্ষাকাল। এ সময়ে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। বৃষ্টির আধিক্য এবং সময়ের পরিসর ক্রমশ দীর্ঘ হয়। ভারতের উত্তরাঞ্চলীয় প্রদেশসমূহে এবং পাহাড়সমূহের পারস্পরিক ব্যবধানের ভিত্তিতে বৃষ্টিপাত কম-বেশী হয়।[২৫] মুলতানের লোকেরা আমাকে (আল বিরুনীকে) বলেছে যে, তাদের কোন বর্ষাকাল নাই। কিন্তু পার্বত্যাঞ্চলের নিকটবর্তী উত্তরাঞ্চলের প্রদেশগুলোতে বর্ষাকাল আছে। ভাতাল এবং ইন্দ্রাভেদী এলাকায় (এনটারভেদী–গঙ্গা ও যমুনার নিম্নদোয়াব অঞ্চলের পুরনো নাম, মোটামুটিভাবে এতওয়াহ থেকে এলাহাবাদ পর্যন্ত) বর্ষা শুরু হয় আশাধা (জুন-জুলাই) মাসে এবং চার মাস ধরে এত বেশী বৃষ্টি হয় যেন পানির পাত্র উপুড় করে ঢেলে দেয়া হচ্ছে। আরো উত্তরে কাশ্মীর পাহাড়ের আশেপাশে দুনপুর ও বারশাওয়ার-এর মধ্যবর্তী স্থানে জুদারী পাহাড়ের চুড়া পর্যন্ত শ্রাবণ মাস থেকে শুরু হয়ে পরবর্তী আড়াই মাস যাবত প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। কিন্তু চুড়ার অপর পার্শ্বে কোন বৃষ্টিই হয় না। কারণ উত্তরের মেঘ এত বেশী ভারী থাকে যে তারা বেশী উপরে উঠতে পারে না। মেঘগুলো যখন পাহাড়ী এলাকায় পৌঁছে পাহাড়ের গায়ে আঘাত করে তখন মেঘগুলো যেন আঙ্গুর অথবা জলপাইয়ের মতো হয়ে যায়, আর টুপ টুপ করে বৃষ্টির আকারে ঝরে পড়ে, মেঘ কখনো পাহাড় চুড়ারও পাশে যেতে পারে না। তাই বলা হয়ে থাকে কাশ্মীরে কোন বর্ষাকাল নাই, তবে মাঘ (জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী) থেকে শুরু হয়ে পরবর্তী আড়াই মাস ধরে তুষারপাত হতে থাকে। চৈত্র মাসের (মার্চ-এপ্রিল) শেষার্ধ অল্প কয়েকদিনের জন্য ধারাবাহিকভাবে বৃষ্টিপাত হয়, বরফ গলে গিয়ে মাটিকে ধুয়ে সাফ করে দেয়। তবে

www.waytojannah.com

এই নিয়মের কখনো কখনো ব্যতিক্রমও হয়, তবে ভারতের সব প্রদেশেই আবহাওয়ার কোন না কোন বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায়।

পশুর বিবরণ

দেশের পশু সম্পর্কিত বিবরণ খুবই সংক্ষিপ্তভাবে দেয়া হয়েছে। এ সম্পর্কিত তথ্যাবলী ও আলংকারিক বর্ণনাগুলো কৌতূহলজনকভাবে এসেছে মূল বিষয়ের বর্ণনার সাথে মিশ্রিতভাবে, আবার কখনো বা অপ্রাসঙ্গিকভাবে।[২৬] সর্বপ্রথম তিনি শরভা নামের পশুর কথা বর্ণনা করেছেন। এরা কুনকান (কনকান) সমতলের 'দানাক' (Danak) নামক স্থানে বাস করে। এই জীবটি গণ্ডারের (রাইনোসরস) চাইতে বড় এবং অন্যান্য প্রাণীর নিকট ভীতিকর। গণ্ডার সম্পর্কে বলা হয়েছে যে ভারতে বিশেষ করে গঙ্গা নদীর তীরবর্তী এলাকায় প্রচুর পরিমাণে গণ্ডার পাওয়া যায়। এই প্রাণীটির বিস্তারিত বর্ণনা প্রদান করা হয়েছে, সে সাথে লেখক আরো বর্ণনা করেছেন যে তিনি নিজে প্রত্যক্ষ করেছেন কিভাবে একটি শক্তিশালী গণ্ডার হাতীর মুখোমুখি হয়ে হাতীকে আক্রমণ করে। জন্তুটি তার শিং দ্বারা হাতীর সামনের পায়ে জখম করে দেয় এবং হাতিটি মুখ থুবড়ে পড়ে।

এরপর আল বিরুনী উল্লেখ করেছেন যে নীল নদের মতো ভারতের নদীগুলোতেও কুমীর আছে। নদীসমূহের গতিপথ ও আকার এবং মহাসাগরের অবস্থান সম্পর্কে আল জাহিয[২৭] এর অজ্ঞতাপ্রসূত ধারণা ছিল যে মিহরান (সিন্ধু) নদী নীল নদের শাখা। বস্তুত তিনি (আল বিরুনী) সে সুরেই উক্ত মন্তব্য করেছিলেন। ভারতের নদীগুলোতে কুমীর প্রজাতির আরো কিছু বিস্ময়কর প্রাণীর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন মাকারা নামের এক ধরনের আজব মাছ, চামড়ার ব্যাগের অনুরূপ এক ধরনের প্রাণী জাহাজের পিছনে পিছনে চলে এবং সাঁতার কেটে খেলা করে, এর নাম বুরলু (শুশুক)। দক্ষিণ ভারতের নদীগুলোতে এক ধরনের প্রাণী আছে, যাদেরকে বিভিন্ন নামে অভিহিত করা হয়। যেমন–গ্রাহা, জালতানতু এবং টেনডুয়া নামে অভিহিত করা হয়।

যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং পরিভ্রমণ

একাদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে ভারত উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থার সুযোগ থেকে বঞ্চিত ছিল। চলাচলের পথ এবং তাদের ব্যবহার প্রধানত নিয়ন্ত্রিত হতো ভৌগোলিক (মানচিত্র, জলবায়ু এবং উদ্ভিদায়ন ইত্যাদি) ও সামরিক প্রয়োজন অথবা ধর্মীয় সফরের কাজে। আল বিরুনী যখন ভারতে আগমন করেন তখন সুলতান মাহমুদের সামরিক অভিযানের মাধ্যমে মুসলমানদের আগমন শুরু হতে চলেছে। এই অভিযানসমূহ মূলত পরিচালিত হয়েছিল ভূ-রাজনৈতিক বিবেচনায়। সুতরাং ইতোমধ্যে ব্যবহৃত চলাচলের পথসমূহের পাশাপাশি অনেক নতুন ভ্রমণ পথ চালু হয়। এ ক্ষেত্রে গন্তব্যের দূরত্ব

www.waytojannah.com

নিরূপণ করা একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার ছিল। আল বিরুনী 'ফারসাখ'-এর হিসেবে দূরত্ব সম্পর্কিত বর্ণনা প্রদান করেছেন। তাঁর প্রদত্ত বিবরণের সাথে হিন্দুদের 'ইউজানা' এবং আরবদের 'মাইল'-এর তুলনামূলক পর্যালোচনা করে সাচাউ এ সকল পদ্ধতির মধ্যে সম্পর্ক নির্ণয় করেছেন। তাঁর মতে এক 'ফারসাখ' প্রায় তিনি মাইলের সমান।

দূরত্ব পরিমাপ করার হিন্দু পদ্ধতিকে আল বিরুনী সঠিক বলে মনে করেননি। তিনি পরামর্শ দিয়েছেন যে যথেষ্ট উদ্যোগ ও সতর্কতা গ্রহণ করলে হিন্দু লেখকদের এই ভুল সংশোধন করা যায়। আবার এ বিষয়ে খোলা মনে মতামত দিতে গিয়ে তিনি বলেছেন যে, "যাই হোক, আমরা এ বিষয়ে যা জানি তা চেপে রাখতে পারি না, আর আমরা যা জানি না–পাঠকদের অনুরোধ করবো, কোন ভুল হলে যেন ক্ষমা করে দেয়।"

ষোলটি চলাচলের পথের কথা বর্ণনা করা হয়েছে যেগুলো সম্পর্কে তিনি মুলতানের সামরিক ও বেসামরিক কর্মকর্তাদের কাছ থেকে জানতে পেরেছেন। যারা এর কিছু কিছু রাস্তায় বিপুল সৈন্যসামন্তসহ কানোজ এবং সোমনাথে এসেছিলেন। এ ছাড়া কিছু কিছু তথ্য সম্ভবত হিন্দু ও মুসলমান ব্যবসায়ী, নাবিক ধর্মীয় সফরের যাত্রী ও সাধারণ ভ্রমণকারীদের নিকট থেকেও পেয়েছিলেন। এসব যাত্রাপথের শুরু হয়েছে কানোজ, মাহুরা (মুত্রা), আনহিলওয়ারা (পাট্টান), মালওয়ার ধার, বারি (পূর্ব কানোজ-এর অস্থায়ী হিন্দু' রাজধানী) এবং বাযানা থেকে।

বাণিজ্য ও শহরসমূহ

আল বিরুনী বেশ কিছু সংখ্যক শহর ও নগরের নাম উল্লেখ করেছেন। বর্ণনাকালে তাদের ধর্মীয় গুরুত্ব, জ্ঞান অর্জনের কেন্দ্র হিসেবে খ্যাতি ইত্যাদির উল্লেখ করেছেন। অনেক ক্ষেত্রে যোগাযোগের কেন্দ্র হিসেবে এবং বাণিজ্যিক লেন-দেনের স্থান হিসেবে এ সকল শহর ও নগরের ভূমিকা সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন। তবে ব্যবসায় ও বাণিজ্যিক কার্যক্রম এবং পণ্যদ্রব্যের আনা-নেয়া সম্পর্কে পদ্ধতিগত কোন আলোচনা দেখা যায় না। শুধু আলোচনার ফাঁকে এখানে সেখানে তিনি কিছু বন্দর যেমন-ভারতের বাইরে রফতানীর জন্য বহির্গমন এবং পূর্ব আফ্রিকা অথবা পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ এবং চীনের দিকে বহির্গমনের পথ হিসেবে সোমনাথ ও লোহারানীর গুরুত্ব প্রসঙ্গে কিছু কথা বলেছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ তিনি বলেছেন যে, সোমনাথ ছিল সমুদ্রগামী মানুষের জন্য পোতাশ্রয় এবং যানজ (পূর্ব আফ্রিকা)-এর সুফালাহ চীনের মধ্যবর্তী এখানে সেখানে যাতায়াতের স্টেশনস্বরূপ।[২৮] আল বিরুনী ভারতের সাথে সিংহলের ক্লোভ (clove)-এর ব্যবসার কথা উল্লেখ করেছেন এবং বলেছেন যে ভারতীয়রা ক্লোভকে লবঙ্গ নামে অভিহিত করে। কারণ এটি লঙ্গা (লংকা-সিংহল) থেকে আমদানী করা হয়। সকল

www.waytojannah.com

নাবিক একবাক্যে বলেছে, যে সকল জাহাজ এ দেশে (লংকায়) আসে। তারা নৌকার সাহায্যে পশ্চিমা প্রাচীন দেনার (Denars), বিভিন্ন প্রকারের পণ্য, ভারতীয় ডুরে কাপড়, লবণ ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় বাণিজ্যিক পণ্য খালাস করে। এ সকল মালামাল তীরে চামড়াখণ্ড বিছিয়ে তার উপর জমা করা হয় এবং প্রতিটি স্তূপের উপর মালিকের নাম লেখা থাকে। এরপর ব্যবসায়ী তার জাহাজে ফিরে যায়। পরদিন তারা দেখতে পায় সে দেশীয়রা পণ্যের মূল্য বাবদ তাদের নিকট কম-বেশী যা আছে লবঙ্গ দ্বারা চামড়া খণ্ডগুলো পূর্ণ করে দেয়।[২৯]

এ থেকে প্রতিবেশী দেশগুলোর সাথে ভারতের ব্যবসায়- বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বিনিময়ের পদ্ধতি সম্পর্কে ধারণা করা যায়। তিনি সেখানে মুক্তা উৎপাদনকারী সামুদ্রিক প্রাণীর ধ্বংসোন্মুখ অভয়াশ্রমের কথাও উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন যে সরনদ্বীপ উপসাগরে এককালে মুক্তা ব্যাংক ছিল। কিন্তু তাঁর ভারতে অবস্থানকালেই তা পরিত্যক্ত হয়ে যায় এবং এরপর সুফালাহ মুক্তা[৩০] তার স্থান দখল করে নেয়।

বেনারসকে বলা হয়েছে হিন্দুদের প্রধান জ্ঞানকেন্দ্র। মুসলিম বিজয়ের কালে বহু পণ্ডিত সেখান থেকে পালিয়ে যান। তিনি বলেন, বেনারস ধর্মীয় কেন্দ্র, হিন্দু আইনের ব্যাখ্যা প্রদানের জন্যও তীর্থস্থান হিসেবে মর্যাদা লাভ করেছে। এর উপর দিয়ে নিম্ন গাঙ্গেয় এলাকা, বিহার, উত্তর বঙ্গ ও আসামের দিকে গুরুত্বপূর্ণ পথসমূহ অতিক্রম করেছে।

কানোজকে বলা হয়েছে ভারতের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান হিসেবে। এর স্পষ্ট কারণ হচ্ছে সুলতান মাহমুদের সর্বাত্মক অভিযানের প্রেক্ষাপটে ভারতীয় রাজশক্তির কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে কানোজের ভূমিকা। পণ্ডিত বলভদ্রের মতে এর ভৌগোলিক অবস্থান হচ্ছে ২৬ ডিগ্রি ৩৫ অক্ষাংশ। আল বিরুনী উল্লেখ করেছেন যে যাউন (যমুনা) নদী কানোজের পশ্চিমে নিম্নভূমিতে গঙ্গার সাথে মিলিত হয়েছে। সারা দেশে এই বিখ্যাত শহরকে আর্যাবর্ত নামে অভিহিত করা হতো (মধ্যাদেশা বা দেশের মধ্যবর্তী স্থান নামেও অভিহিত করা হতো)। তিনি আরো বলেন, "ভৌগোলিক দৃষ্টিকোণ থেকেও এই শহর মধ্যবর্তী স্থানে বা কেন্দ্রে অবস্থিত। কারণ এটি উষ্ণ ও ঠাণ্ডা প্রদেশগুলোর মধ্যবর্তী স্থানে এবং এমন কি ভারতের পূর্ব এবং পশ্চিম সীমান্তেরও মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত। এটি রাজনৈতিক কেন্দ্রও বটে, কেননা আগের দিনে এটা ছিল তাদের (হিন্দু) বিখ্যাত বীর ও রাজাদের বাসস্থান।"[৩১] তিনি লিখেছেন যে, যেহেতু রাজধানী গঙ্গার পূর্ব তীরে বারি নগরীতে স্থানান্তরিত হওয়ায় (নিশ্চয়ই প্রতিরক্ষার অধিকতর সুবিধার্থে) বর্তমান সময়ে এই শহরটি প্রায় পতিত এবং ধ্বংসের শেষ প্রান্তে পৌঁছেছে। এটা ছিল বিভিন্ন দিকে গমনেচ্ছু বহু পথযাত্রীর সংযোগস্থল। কানোজ এক সময় বাংলার পাল রাজাদের কেন্দ্রভূমি, যারা মঙ্গির (মুঙ্গের) থেকে বাংলা শাসন করতো।

www.waytojannah.com

কানোজ থেকে প্রায় ২৮ ফারসাখ[৩২] দূরে যাউন (যমুনা) নদীর পূর্ব তীরে অবস্থিত মাহুরা (মুত্তরা) শহরকে বাসুদেব- এর শহর বলে উল্লেখ করা হয়েছে। বহু সংখ্যক ব্রাহ্মণ অধ্যুষিত এই পবিত্র শহর বিশেষ মর্যাদা অর্জন করেছিল, কারণ নিকটবর্তী নন্দাগোলা নামক স্থানে বাসুদেব জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং সেখানেই বড় হয়েছিলেন।

মুলস্থানাঃ আল মামুরা (মুলতান) সে সময়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ শহর ছিল। পাঞ্জাবের পাঁচটি নদী মুলতানের নিম্নভূমিতে পঞ্চানদা (পঞ্চনদ) নামক স্থানে একত্রিত হয়েছে। ২৯ ডিগ্রি ৪০" অক্ষাংশে এটি অবস্থিত। এখানে আল বিরুনী কিছু দিন অবস্থান করেছিলেন। মৌসুমী বায়ুপ্রবাহের কালে খুবই সামান্য পরিমাণে বৃষ্টি হতো বিধায় তিনি বলেছেন যে সেখানে কোন বর্ষাকাল ছিল না। মুসলিম বিজয়ের পূর্বে এই শহরকেও পবিত্র শহর বলে গণ্য করা হতো। সেখানে ছিল পবিত্র মন্দির ও পুকুর। তিনি উল্লেখ করেছেন যে, হিন্দুরা এখনো সেখানে সূর্যদেবের সম্মানে সমবাপুরব্রতা নামে পূজা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে থাকে।

মুসলমানদের প্রথম ভারতে আগমন প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন যে, "ইবনুল কাসিম সিজিস্তানের দিক থেকে সিন্ধুতে প্রবেশ করেছিলেন এবং বাহমানওয়া ও মুলস্থানার শহরসমূহ জয় করেন। তিনি প্রথমোক্ত শহরের নামকরণ করেছিলেন আল মানসুরাহ এবং শেষোক্ত শহরের নামকরণ করেছিলেন আল মামুরা। তিনি ভারতে প্রবেশ করেছিলেন সোজা পথে এবং কনোজ পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছিলেন। তিনি অগ্রসর হয়েছিলেন গান্ধারা দেশসমূহের উপর দিয়ে। অতঃপর ফিরে গিয়েছিলেন কাশ্মীর সীমান্ত দিয়ে কখনো স্বহস্তে তলোয়ার নিয়ে যুদ্ধ করে, কখনো বা চুক্তি সম্পাদনের মাধ্যমে লক্ষ্য হাসিল করে। যারা মুসলমান হতে চেয়েছিল তারা ছাড়া বাদবাকী জনসাধারণকে তাদের প্রাচীন বিশ্বাস নিয়ে থাকতে দিয়েছিলেন। তবে সার্বিক পরিস্থিতি তাদের অন্তরে গভীর ঘৃণার বীজ বপন করেছিলো।[৩৩]

আল বিরুনী কাশ্মীরের একজন অধিবাসী উৎপলাকে এভাবে উদ্ধৃত করেছেন, "প্রথমত মুলতানকে বলা হতো কাস্যপাপুরা, অতঃপর হামসাপুরা, তারপর বাগপুরা এবং মুলস্থানা। অর্থাৎ মূল জায়গা, মূল মানে গোড়া, উৎস বা আদি এবং তানা (স্থানা) অর্থ স্থান।"[৩৪]

লাহুর (লাহোর)-কে বলা হয়েছে ৩৪ ডিগ্রি ১০" অক্ষাংশে অবস্থিত শক্তিশালী দুর্গের শহর। লাহোর থেকে কাশ্মীরের রাজধানীর দূরত্ব বলা হয়েছে ৫৬ মাইল (অবশ্যই প্রকৃত দূরত্বের চাইতে কম) এবং এর অর্ধেক পথ সমতল, বাকী পথ উঁচু-নীচু অসমতল।[৩৫]

লোহারানী (বর্তমান করাচীর নিকটে) শহর ছিল সিন্ধু নদের মুখে, যার আরেক শাখা আরো পূর্বদিকে কছ প্রদেশের সিন্ধু-সাগরা নামক স্থানে এসে সাগরে মিশেছে।

www.waytojannah.com

Contents

ক্যানন মাসুডিকাস (আল কানুন আর মাসউদী)[৩৬] গ্রন্থে এই শহরকে ২৪ ডিগ্রি ৪০° অক্ষাংশে অবস্থিত বলে উল্লেখ করা হয়েছে। পুরশাওয়ার (পেশওয়ার) শহরকে বলা হয়েছে ৩৪ ডিগ্রি ৪৪° অক্ষাংশে অবস্থিত গান্ধারার একটি উল্লেখযোগ্য শহর হিসেবে, সেখানে বৌদ্ধ মন্দির ছিল।

সোমনাথকে বলা হয়েছে সমুদ্রপথে যোগাযোগের কেন্দ্রস্থল এবং জলদস্যুদের আশ্রয়স্থল। "তাদের সম্পর্কে এরূপ বলা হতো এ জন্য যে তারা সাগরে চলাচলকারী বিরা জাহাজে আরোহণ করে ডাকাতি করতো। সোমনাথ থেকে পূর্বদিকে এক তীরের দূরত্বে সারাসতি (সরস্বতী) নদী সাগরে এসে পড়েছে।" অনুমান করা হয় যে সে সময়ে সোমনাথ ব্যবসায়- বাণিজ্য ও পূর্ব আফ্রিকা, সিংহল ও চীনের দিকে যাত্রাপত্রের কেন্দ্র হিসেবে একটি ব্যস্ততম বন্দর ছিল। হিন্দুদের নিকট খুবই পবিত্র স্থান এবং এখানকার মন্দির ছিল বিপুল পরিমান সম্পদের অতুলনীয় ভাণ্ডার। আর এই স্থানের প্রতি সুলতান মাহমুদের দৃষ্টি আকর্ষিত হওয়ার সবচাইতে জোরালো কারণ। আল বিরুনী এই মন্দির ধ্বংস হওয়ার সন উল্লেখ করেছেন ৪১৬ হিজরী। তিনি উল্লেখ করেছেন সেখানে মহাদেবের লিঙ্গ স্থাপিত ছিল। সোমা অর্থ চাঁদ এবং নাথ অর্থ প্রভু। সুতরাং সোমনাথ অর্থ চাঁদের প্রভু।[৩৭] সোমনাথ প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে আল বিরুনী জোয়ার ও ভাটা সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা প্রদান করেছেন।

উজাইনঃ উয়াইন (উজ্জয়ন) শহর ছিল মালওয়া-তে; এর অক্ষাংশ বলা হয়েছে ২৪ ডিগ্রি, তবে ব্রহ্মগুপ্তের মতে ১৬ $\frac{১}{৪}$ °। জ্যোতির্বিজ্ঞানী ও ভূগোলবিদগণের নিকট এর গুরুত্ব অনেক বেশী, কারণ হিন্দু পণ্ডিতগণের মতে এটি ০ ডিগ্রি (শূন্য ডিগ্রি) দ্রাঘিমাংশে অবস্থিত। আল বিরুনী মুসলমান জ্যোতির্বিজ্ঞানী ও ভূগোল বিজ্ঞানীদের একটি সাধারণ ভুলের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন, যাঁরা মনে করতেন যে উজ্জয়ন সমুদ্র উপকূলবর্তী স্থানে অবস্থিত। তিনি বলেন, বাস্তবে এই শহর সাগর থেকে একশত ইওজানা দূরে অবস্থিত। তিনি বলেন হিন্দু শাস্ত্র অনুসারে মধ্য রেখা লংকা (শ্রীলংকা-সিংহল) থেকে সোজাসুজি মেরু (ভারতের বাইরে হিমালয় অঞ্চল) এবং ভারতের উজ্জয়ন, মুলতান জেলার রোহিতাকা দুর্গ, তানেশার (থানেশ্বর) সমভূমি এলাকার করুকশেত্রা, মথুরা (মুতরা) ইত্যাদি[৩৮] স্থানের উপর দিয়ে অতিক্রম করেছে। যোগাযোগের দিক থেকে উজ্জয়ন একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র ছিল।

কাশ্মীরঃ বিভিন্ন ভৌগোলিক প্রেক্ষাপটে বেশ কয়েকবার কাশ্মীরের উল্লেখ পাওয়া গেছে। এটি একটি উঁচু পার্বত্য এলাকা এবং হিন্দু বিজ্ঞানীদের কাছে তীর্থস্থানতুল্য দক্ষিণের মুসলিম প্রধান অঞ্চল থেকে পালিয়ে আসা লোকদের জন্য আশ্রয়স্থল। আল বিরুনীর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা থেকে সেখানকার ভৌত ও মানবিক ভূগোল এবং তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক বিষয়ে জানা যায়। এ সকল বর্ণনার মধ্যে রয়েছে এর পার্বত

www.waytojannah.com

প্রকৃতি, সরু অথচ গভীর নদী উপত্যকার ঘন বসতি ইত্যাদি তথ্য। তাঁর নিজের ভাষায় বিষয়গুলো সুন্দরভাবে প্রস্ফুটিত হয়েছে, "কাশ্মীরের অধিবাসীরা প্রধানত পদযাত্রী, আরোহণ করার মতো সেখানে কোন জন্তু অথবা হাতী নেই। তাদের মধ্যে যারা অভিজাত শ্রেণীর তারা মানুষের কাঁধে বয়ে নেয়া পালকিতে চড়ে চলাচল করে। স্থানীয় ভাষায় একে বলা হয় 'কাত'। তারা তাদের দেশের প্রাকৃতিক শক্তি সম্পর্কে বিশেষভাবে উদ্বিগ্ন থাকে। এ কারণে তারা তাদের দেশের প্রবেশপথসমূহ এবং সে দেশগামী রাস্তাসমূহে জোরালো ও সতর্ক নজর রাখে। ফলে তাদের সাথে ব্যবসায়িক যোগাযোগ গড়ে উঠা খুব কঠিন।.... কাশ্মীরের সুপরিচিত প্রবেশপথ হলো সিন্ধু নদ এবং জাইলাম (ঝিলাম)-এর মধ্যবর্তী স্থানে বারবাহান শহর দিয়ে।

অতঃপর নদীর উপর সেতু..... তারপর পাঁচ দিনে আপনি পৌঁছবেন যেখানে গিরিখাত শুরু হয়েছে এবং যেখান থেকে জাউলাম এসেছে.... [৩৯] গিরিখাত অতিক্রম করে আপনি প্রবেশ করবেন সমভূমি এলাকায়, আরো দু'দিন চলার পর বারামুলা হয়ে পৌঁছবেন কাশ্মীরের রাজধানী আদদিস্তানে। কাশ্মীরের প্রধান শহর চার ফারসাখ (প্রায় ১২ মাইল) বিস্তৃত, জাইলাম নদীর উভয় তীরে এই শহরটি নির্মিত হয়েছে। সেতু ও ফেরীবোটের সাথে উভয় তীরের সাথে সংযোগ রক্ষা করা হয়। জাইলাম নদীর উৎপত্তি হয়েছে হারামাকোটি পর্বত থেকে, যেখানে কখনো বরফ গলে না বা একেবারে নিঃশেষ হয়ে যায় না। তার পিছনে রয়েছে মহাচীন বা বিশাল চীন অঞ্চল, জাইলাম নদী পার্বত্য এলাকা ছেড়ে আসার পর এবং দু'দিনের সফর পর্যন্ত প্রবাহিত হওয়ার পর আদদিস্তান (শ্রীনগর) অতিক্রম করে। আদদিস্তানের উপর দিয়ে চার ফারসাখ প্রবাহিত হওয়ার পর তিন ফারসাখ বিশিষ্ট একটি জলাভূমিতে প্রবেশ করে। লোকেরা জলাভূমির তীরে গাছপালা লাগায় এবং এর কোন কোন অংশ পুনরুদ্ধার করে।[৪০]

কাশ্মীরে প্রবল বৃষ্টিপাত হয়ে থাকে এবং তা শ্রাবণ মাসে শুরু হয়ে আড়াই মাস পর্যন্ত থাকে। ফলে নদী থাকে কানায় কানায় পূর্ণ এবং তীরবর্তী গাছগুলো যেন ঝিলাম নদীতে ভাসতে থাকে।

নাইপাল (নেপাল) এবং ভূটানঃ নেপালের প্রত্যন্ত ও বিচ্ছিন্ন পার্বত্য এলাকার কিছু কিছু ভৌগোলিক বৈচিত্র্য সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত অথচ মজার বর্ণনাও তিনি দিয়েছেন। আল বিরুনীর ভাষায় "তিলওয়াত (তিরহুত)-এর বিপরীত দিকে দেশের (ভারতের) বাম দিকে (উত্তর) রয়েছে নাইপাল। ঐ এলাকা সফরকারী একলোক তাঁকে বলেছে যে, তানওয়াত থেকে তিনি পূর্ব দিকে গেলেন–তারপর বাম দিকে (উত্তরে)। তিনি নাইপালের দিকে ২০ ফারসাখ অগ্রসর হলেন, যার বেশীর ভাগ ঊর্ধ্বমুখী এলাকা। নাইপাল থেকে তিনি ত্রিশ দিনে আসলেন ভোটেশ্বর (আল বিরুনী সম্ভবত ভুটানের কথা বলেছেন) দূরত্ব প্রায় ৮০ ফারসাখ, যার বেশীর ভাগ পথ প্রথমত ঊর্ধ্বমুখী অতঃপর নিম্নমুখী। তিনি বেশ কয়েকটি এমন সেতু অতিক্রম করেছেন–যেগুলো

www.waytojannah.com

Contents

কাঠের বেশ কিছু তক্তাকে বেতের রশি দ্বারা বেঁধে গিরিখাতের মধ্যবর্তী বড় বড় পাথরখণ্ডের সাথে যুক্ত করা হয়েছে। অতঃপর উভয় তীরে মজবুতভাবে নির্মিত পাথরের চাতালের সাথে ভাল করে বেঁধে দেয়া হয়েছে। লোকেরা এ সকল সেতুর উপর দিয়ে কাঁধে বয়ে মালামাল পারাপার করে। সেতুর প্রায় ১০০ গজ নীচে প্রবহমান পানি এত জোরে পাথরে ধাক্কা দেয়, যেন পাথর গুঁড়িয়ে যাবে, পানিতে সাদা ফেনা তৈরী হয়।

সেতুর অপর পাড়ে গিয়ে মালামাল ছাগলের পিঠে তোলা হয়..... ভোটেশ্বর হচ্ছে তিব্বতের প্রথম সীমান্ত। সেখানে ভাষার সাথে সাথে পোশাক এবং মানুষের নৃতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যও পরিবর্তিত হয়েছে। সেখান থেকে পর্বতের সর্বোচ্চ চুড়ার দূরত্ব ২০ ফারসাখ। এই পাহাড়ের চুড়া থেকে ভারতকে মনে হয় কালো কুয়াশার মতো। এই চুড়ার নীচে অন্যান্য পাহাড়কে মনে হয় ছোট ছোট টিলা, চীন ও তিব্বতকে দেখা যায় লালাভ। মাত্র এক ফারসাখ নিচেই রয়েছে তিব্বত ও চীন।"

সারকথা

আগেই বলা হয়েছে যে আল বিরুনী 'কিতাবুল হিন্দ'-কে মূলত ভূগোল গ্রন্থ হিসেবে রচনা করেন নি। তাঁর এই গ্রন্থ এ কারণে অনন্য স্থান অধিকার করেছে যে তিনি একজন ভারতীয়ের মতো বিভিন্ন বিষয়ের উপর (ধর্ম, দর্শন, সাহিত্য, প্রথা, আইন, জ্যোতিশ শাস্ত্র, জ্যোতির্বিজ্ঞান, ইতিহাস এবং ভূগোল) আলোচনা করেছেন। নিশ্চয়ই একজন বিদেশীর পক্ষে এটা সহজ কাজ ছিল না। তবে তিনি ছিলেন একজন জ্ঞানী এবং তথ্যাভিজ্ঞ ব্যক্তি। এ প্রসঙ্গে আল বিরুনীর সরল স্বীকারোক্তি প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন যে, "আমি লক্ষ করেছি এ কাজ খুবই কঠিন, যদিও আমি কাজটি বিশেষভাবে পছন্দ করতাম। আমার সময়ে আমি ছিলাম নিতান্তই একা।"[৪১] অধিকন্তু তাঁর সমগ্র প্রচেষ্টা ছিল বিজ্ঞানসম্মত এবং ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক সহ যে কোন প্রকার কুসংস্কার থেকে মুক্ত। আল বিরুনীর এই প্রচেষ্টা মুসলিম সাহিত্যে অনন্য, কেননা তিনি পৌত্তলিক চিন্তাজগতকে আন্তরিকভাবে বুঝতে চেয়েছিলেন, তিনি তাদেরকে আক্রমণ করা বা নিন্দা করার উদ্দেশ্যে অগ্রসর হননি। তিনি আগাগোড়া আগ্রহ দেখিয়েছেন নিজেকে নিরপেক্ষ এবং ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখতে। এমনকি প্রতিপক্ষের প্রকাশ্য অনীহা সত্ত্বেও তিনি তাঁর চিন্তায় অটল ছিলেন।

ভৌগোলিক দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি ছিলেন এমন একজন লেখক, যিনি খনিজ বিদ্যা, বিশ্বতত্ত্ব (Cosmography) এবং ভৌগোলিক বিষয়ের উপরও কলম ধরেছিলেন। ভারতবর্ষ সম্পর্কে লিখতে গিয়ে তিনি তাঁর গ্রন্থের বেশ কয়েকটি অধ্যায়ে[৪২] ভূগোল, বিশ্বতত্ত্ব এবং জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্পর্কে সবিস্তারে লিখেছেন। এগুলো ছাড়াও দেশের ভূগোলের প্রসঙ্গ যেমন প্রাকৃতিক বিষয়াবলী, ব্যবসায়-বাণিজ্য, শহর ও

www.waytojannah.com

নগর, চলাচলের পথ এবং যোগাযোগ ব্যবস্থা ইত্যাদি বিষয় বারবার এসেছে। পূর্ববর্তী কয়েকটি অনুচ্ছেদে এ সকল বিষয়কে একত্রিত করে পদ্ধতিগতভাবে উপস্থাপনের চেষ্টা করা হয়েছে।

ভারতের ভৌগোলিক বিষয়াবলীর উপর আল বিরুনীর লেখা খুবই উঁচুমানের। ভূতত্ত্ব, আবহাওয়া ও জলবায়ু সম্পর্কিত বিষয়ে আল বিরুনীর মন্তব্যগুলো খুবই যুক্তিসঙ্গত, অন্তর্ভেদী ও চিন্তা উদ্রেককারী। জ্যোতির্বিজ্ঞান ও বিশ্বতত্ত্ব সম্পর্কে তিনি হিন্দুশাস্ত্রের বেশ কিছু তত্ত্ব পরীক্ষা করেন এবং বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে কঠোর ভাষায় সমালোচনা করেছেন। তাঁর এই সমালোচনা কখনো কখনো অতিরঞ্জিত বলেও মনে হতে পারে। তবে তাঁর সংগৃহীত তথ্যাবলীর ব্যাপকতা এবং প্রাসঙ্গিক তথ্যাবলীকে সুবিন্যস্তকরণের পদ্ধতি সত্যিই অসাধারণ। সর্বোপরি আল বিরুনী পৃথিবীর আবাসযোগ্য অঞ্চল সম্পর্কে তাঁর পূর্বসূরীদের চাইতে উন্নততর ধারণা উপস্থাপন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তিনি আফ্রিকা মহাদেশের দক্ষিণমুখী সম্প্রসারণ এবং দক্ষিণ দিকের সাগরে নাব্যতার আধিক্যে বিশ্বাস করতেন। তিনি সাগরে জোয়ারের প্রকৃতি স্পষ্টভাবে বুঝতে সক্ষম হয়েছিলেন। তিনি ব্যাখ্যা করেছেন জোয়ার-ভাটা সময়ানুসারে কিভাবে বাড়ে এবং কমে এবং এই বিষয়টি চন্দ্রকলার হ্রাসবৃদ্ধির সাথে সম্পর্কিত করেও ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি আরো বলেছেন যে, সাগরতীরের কাছাকাছি এলাকায় যারা বসবাস করে তারা এসব বিষয় ভালভাবে জানে। এ প্রসঙ্গে তিনি সোমনাথের উদাহরণ উপস্থাপন করেছেন। তাঁর মতে শিক্ষিত হিন্দুরা চাঁদের উদয় ও অস্তের সময় এবং মাসিকভাবে চন্দ্রকলার হ্রাসবৃদ্ধির নিরিখে জোয়ার-ভাটার সময় নিরূপণ করতে পারে। কিন্তু আল বিরুনীর মতে তারা এর বস্তুগত কারণ জানতো না। গণিত ও জ্যোতির্বিজ্ঞানের দিক থেকে তিনি প্রতিপাদ্য স্থান, পৃথিবীর গোলাকৃতি হওয়া ও এর গতি সম্পর্কে আলোচনা করেছেন এবং অসংখ্য জায়গার অবস্থান চিহ্নিত করেছেন। এ ছাড়া তিনি বিভিন্ন স্থানের (অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমাংশের) ভৌগোলিক আন্তঃসম্পর্ক নিয়েও আলোচনা করেছেন। নিশ্চিতভাবে তিনি ছিলেন মধ্যযুগের একজন অতুলনীয় ভূগোলবিদ এবং সমগ্র দুনিয়ার বিজ্ঞানীদের মধ্যে তাঁর স্থান অতীব মর্যাদাপূর্ণ।

ইবনে বতুতাঃ আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ

ভ্রমণ-পরিক্রমণ এবং ভূগোল বিজ্ঞান মুসলমান ভূগোল বিজ্ঞানীদের সাথে হাত ধরাধরি করে অগ্রসর হয়েছে। ইবনে বতুতা ছিলেন তেমনি একজন ব্যক্তিত্ব। তিনি শামসুদ্দীন নামেও পরিচিত ছিলেন। সারটন তাঁকে মধ্যযুগের একজন শ্রেষ্ঠ পরিব্রাজক[৪৩] হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন মার্কোপোলোও তাঁর এই বিবেচনা থেকে বাদ যাননি। বস্তুত ভেনিসের অধিবাসী মার্কোপোলো যখন তাঁর ঘটনাপঞ্জি লিপিবদ্ধকরণ সমাপ্ত করেছেন, সে সময়ে তাঁর চাইতেও শ্রেষ্ঠতর একজন পরিব্রাজক

www.waytojannah.com

Contents

জন্মগ্রহণ করেছিলেন, যিনি একই সাথে একজন পণ্ডিত ব্যক্তিও ছিলেন। ইনিই ছিলেন শামসুদ্দীন ইবনে বতুতা। হিজরী ৭০৩/ খ্রিস্টাব্দ ১৩০৪ তানজিয়ারে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সে সময়ে জানা পৃথিবীর শেষ প্রান্ত পর্যন্ত অর্থাৎ আফ্রিকা থেকে চীন পর্যন্ত সফর করেন।

ফেজ-এ ফিরে আসার পর তিনি সুলতান আবূ ইনান-এর একজন অনুচর হিসেবে সুলতানের নিকট তাঁর বিখ্যাত সফর ও বিস্ময়কর অভিজ্ঞতা বর্ণনা প্রদান করেন। ইবনে জুযাই তাঁকে একজন বিশ্বস্ত ভ্রমণকারী এবং একজন বিশ্ব ভ্রমণকারী হিসেবে বর্ণনা করেছেন। ইবনে খালদূন রচিত বিখ্যাত মুকাদ্দিমা (Prolegomena)-এর মাধ্যমে ইবনে বতুতার বর্ণনা ও তাঁর সফরের খবর এখনো জনপ্রিয় এবং সুপরিচিত। সফর শেষে তিনি ফেজ-এর তৎকালীন শাসকের দরবারস্থিত অপর এক পরিব্রাজকের সাথে সাক্ষাৎ করেন। আবদুল্লাহ এনান মন্তব্য করেছেন যে, মার্কোপোলো প্রধানত মধ্য এশিয়ার বিশাল অঞ্চল সফর করেছিলেন একজন বিদেশী হিসেবে, এটা ছিল অপরিচিত জগতকে জানার চেষ্টা। কিন্তু ইবনে বতুতা মুসলিম দেশসমূহের উপর দিয়ে আন্দালুসিয়া থেকে চীন পর্যন্ত গিয়েছিলেন। তাঁর পর্যবেক্ষণ ছিল যথার্থতার দিক থেকে তুলনামূলকভাবে বেশী গ্রহণযোগ্য এবং আবিষ্কারকের মতো নির্ভরযোগ্য। তাঁর এ সকল বিবরণ এশীয় ইতিহাস ও ভূগোল রচনার ক্ষেত্রে সবচাইতে মূল্যবান দলীল। এই সকল বিবরণ দেয়া হয়েছে আকর্ষণীয় শিরোনামেঃ তুহফাতুল নুযযার ফি ঘ্রাইব আল 'আমর ওয়া আযাইব আল আফসার (বিভিন্ন দেশের আজব জিনিস এবং বিস্ময়কর সফর সম্পর্কে জানার জন্য মূল্যবান বই)।

ভৌগোলিক বিষয়ে ইবনে বতুতা বেশ কিছু ভাসাভাসা মন্তব্য করেছেন। তাঁর সময়ে যে সকল এলাকা সম্পর্কে তেমন স্পষ্টভাবে কিছু জানা যায় না, সে এলাকাগুলো হচ্ছেঃ দক্ষিণ রাশিয়া, বঙ্গোপসাগর ও আরব সাগরের দ্বীপসমূহ, এশিয়ার দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চল এবং উত্তর চীন। কিছু কিছু আধুনিক গবেষকের মতে এ সকল বিবরণে বাস্তবতার সাথে মিল নেই।

ইবনে খালদূনঃ আবদুর রহমান

মধ্যযুগ ও আধুনিক যুগের সন্ধিক্ষণে বিখ্যাত গ্রন্থ 'চিরন্তন ইতিহাস' (কিতাবুল বার)-এর প্রণেতা, পৃথিবীর ইতিহাসে অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিন্তাবিদ এবং মুসলমানদের মধ্যে একজন নিগূঢ়তম জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন ইবনে খালদূন। একজন ইতিহাসবিদ ও সমাজবিজ্ঞানী হওয়া সত্ত্বেও খ্যাতির এক বিরাট অংশ এসেছে তাঁর মানবিক ভূগোল সম্পর্কিত ধারণার ফলশ্রুতিতে। তাঁর খ্যাতির ভিত্তিপ্রস্তর হচ্ছে জ্ঞানসমৃদ্ধ মুকাদ্দিমাহ (Prolegomena), যা ছিল তাঁর প্রণীত বিশ্ব ইতিহাসের[৪৪] ভূমিকাস্বরূপ। তাঁর নিজের জীবনীগ্রন্থও অন্যতম বৃহদাকারের মুসলিম সাহিত্যগ্রন্থ।

www.waytojannah.com

ইবনে খালদূন ২৭ মে ১৩৩২ খ্রিস্টাব্দে তিউনিসের এক অতি সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করার পর তিনি গ্রানাডা এবং ফেজ-এ কিছুকাল গবেষক হিসেবে অতিবাহিত করেন। সুলতান আবূ ইনান-এর রাজদরবারে তিনি একজন সভাসদ ছিলেন এবং ইবনে বতুতার সাথে সাক্ষাত করেন। ১৩৮২ খ্রিস্টাব্দে পঞ্চাশ বছর বয়স্ক এই পণ্ডিত ব্যক্তি উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকার জন্মভূমি ত্যাগ করেন–যেখানে তিনি আর কখনো ফিরেন নি। তাঁর জীবনের বাকী বেশীর ভাগ সময় কেটেছে কায়রোতে। ১৪০৬ খ্রিস্টাব্দের ১৭ মার্চ তিনি ইনতিকাল করেন।

তাঁর বহু বিশ্রুত গ্রন্থ মুকাদ্দিমায় সাধারণভাবে মানব সভ্যতা, তাদের পরিবেশ, বেদুইনদের সভ্যতা, বিভিন্ন দেশ ও জাতি, হস্তশিল্প ও কারখানা, মুনাফা, বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয় এবং বহু ঐতিহাসিক ঘটনা সম্পর্কে একটি বিশাল অধ্যায় রচনা করেছেন। মরুভূমির যাযাবর জীবন, শ্রমশীল জনসাধারণ এবং নগর সম্প্রদায়ের মধ্যে সামাজিক দ্বন্দ্ব সম্পর্কিত আলোচনার মাধ্যমে তিনি মানব সমাজের অগ্রগতির প্রতিচিত্র স্পষ্টভাবে তুলে ধরেছেন।

মুকাদ্দিমার বিষয়বস্তু অত্যন্ত যৌক্তিকভাবে বিন্যস্ত করা হয়েছে। আলোচনা শুরু করা হয়েছে মানুষের ভৌত পরিবেশ ও তার প্রভাব সম্পর্কিত বিষয় নিয়ে। এরপরই এসেছে আদিম সামাজিক সংগঠন নিয়ে আলোচনা। তিনি নগরজীবনকে মানুষের সভ্যতা ও সংঘবদ্ধ জীবনের সবচাইতে উন্নত রূপ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। চারুশিল্প ও বাণিজ্যের বিকাশ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে এবং দেখানো হয়েছে কেন ইতিহাসকে অনুধাবন করার জন্য বিজ্ঞান শিক্ষা অপরিহার্য।[৪৫] ইবনে খালদূন যে পৃথিবী নিয়ে ভেবেছেন তার কেন্দ্র হচ্ছে মানুষ। রোজেনথাল মন্তব্য করেছেন যে, ইবনে খালদূনের রচনাবলী মানবজাতির জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ বিজয়।[৪৬] ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ইউরোপীয় চিন্তাবিদগণ তুর্কী চিন্তাবিদদের সাথে যৌথভাবে ইবনে খালদূনকে অধ্যয়নের প্রচেষ্টা শুরু করেন, আর এভাবেই আধুনিক সমাজবিজ্ঞান এবং মানবিক ভূগোলের প্রাথমিক বিকাশ শুরু হয়।

তথ্য সূত্র

১. সারটন, খণ্ড-১ পৃ. ৬২২
২. প্রাগুক্ত।
৩. বারনাল, খণ্ড-১, পৃ. ২৭৭
৪. দেখুন, আল মাসউদী Millenary Commemoration Volume, আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়। ১৯৬০
৫. আল-মাকদিসি, পৃ. ১২
৬. আলভী, পৃ. ৭৮; তু. আল মাকদিসি, পৃ. ১৩

www.waytojannah.com

Contents

৭. আল মাকদিসি-পৃ. ১৩৭-১৮৬
৮. দেখুন, History of Muslim Philosophy, খণ্ড-১, পৃ. ২৯১-৩০৩
৯. J.D. Bernal, Science in History, খণ্ড-১, পৃ. ২৭৭
১০. Al-Biruni's India অনুবাদ Edward Sachau- এর কয়েকটি অধ্যায়। আরো দেখুন, লেখকের Al-Biruni's Geography মত India 'আল বিরুনী শতবার্ষিকী আন্তর্জাতিক সেমিনার, করাচী, ডিসেম্বর ১৯৭৬-এ পঠিত।
১১. আল বিরুনী, খ-১, পৃ. ১৯৭
১২. আল বিরুনী, খ-১. পৃ. ২০৮
১৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৭
১৪. এখানে আল বিরুনী স্পষ্টত আরাকান অঞ্চলের সাথে আদম সেতুর (বেশ কিছু বালুময় দ্বীপের ধারাবাহিক অবস্থান) নিকটবর্তী ভারত উপদ্বীপের দক্ষিণ প্রান্তকে তালগোল পাকিয়ে ফেলেছিলেন।
১৫. আল বিরুনী, খ-১, পৃ. ২৫৮
১৬. প্রাচীন হিন্দু ভূগোল গ্রন্থ।
১৭. আল বিরুনী, খ-১, পৃ. ১৯৮
১৮. আর বিরুনী, খ-১, অধ্যায়-২৫
১৯. আল বিরুনী, খ-১, পৃ. ২৬২
২০. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬১
২১. আল বিরুনী, খ-২, পৃ. ১৭০
২২. আল বিরুনীর মতে এক ইয়োজানা ৮ আরবী মাইলের সমান বা ৩২০০০ গজ, এবং ১ ক্রোশ-২/১ ইয়োজানা (খ-১, পৃ. ১৬৭)
২৩. আল বিরুনী, খ-১, পৃ. ৩৫৭
২৪. আল বিরুনী, খ-১, পৃ. ২১১
২৫. একটি গভীর ও ঘনিষ্ঠ পর্যবেক্ষণ। বস্তুত উত্তরে মৌসুমী বায়ুপ্রবাহ শুরু হওয়ার কাল থেকে বৃষ্টিপাত কমতে থাকে। এটা বোঝা যায় হিমালয় থেকে পশ্চিমমুখী অগ্রসর হলে। পাহাড়ী অঞ্চলে বৃষ্টির প্রতিচ্ছেদ সম্পর্কিত তথ্যের উল্লেখ থেকে বোঝা যায় যে আল বিরুনী বৃষ্টি ছাড়া বা rain shadow-এর প্রতিক্রিয়া অনুধাবন করেছিলেন।
২৬. আল বিরুনী, খ-১, পৃ. ২০৩-৬
২৭. খ্রিস্ট পরবর্তী নবম শতকের মধ্যভাগে বসরার একজন নেতৃস্থানীয় বুদ্ধিজীবী ও যুক্তিবাদী।
২৮. আল বিরুনী, খ-২, পৃ. ১০৪
২৯. আল বিরুনী, খ-১, পৃ. ৩০৯

www.waytojannah.com

৩০. প্রাগুক্ত, পৃ. ২১১
৩১. আল বিরুনী, খ-১, পৃ. ১৯৮
৩২. এক ফারসাখ প্রায় তিন মাইল।
৩৩. আল বিরুনী, খ-১, পৃ. ২১
৩৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৮
৩৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৭
৩৬. Sachau, Annotations, পৃ. ৩১৭
৩৭. Sachau, Al-Biruni's India, খ-২, পৃ. ১০৩
৩৮. আল বিরুনী, খ-২, পৃ. ২০৬-৭
৩৯. ঝিলাম থেকে কাশ্মীর হয়ে আধুনিক রাওয়ালপিন্ডি-ইসলামাবাদ সড়ক বলা যায়।
৪০. আল বিরুনী, খ-২, পৃ. ২০৬-৭
৪১. আল বিরুনী, খ-১, পৃ. ২৪
৪২. ১৮ থেকে ৩১ অধ্যায়
৪৩. সারটন, খ-৩, পৃ. ১৬১৪
৪৪. ইবনে খালদূন (মুকাদ্দিমাহ), An Introduction to History (আরবী থেকে Franz Rosenthal কর্তৃক অনূদিত) তিন খণ্ড, ২য় সংস্করণ, লন্ডনঃ Routledge and Kegan Paul, ১৯৬৭)
৪৫. মুকাদ্দিমাহ, Preface, পৃ. L4IX-LXX
৪৬. প্রাগুক্ত, পৃ. LXXX VII

www.waytojannah.com

অষ্টম অধ্যায়

মুসলিম ভূগোল এবং পাশ্চাত্য জগত

পাশ্চাত্যে এরূপ একটি মত প্রচলিত আছে যে সেখানে ধীরে ধীরে ভূগোল বিষয়ক চিন্তাধারার বিকাশ ঘটেছে, যদিও অনেকটা আন্তঃ মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে এই চিন্তাধারা ছিল বাইরের যে কোন প্রভাব থেকে অপর একটি ধারণামতে মধ্যযুগীয় ইউরোপে ভূগোল বিষয়ক চিন্তাভাবনা ও রচনাবলী মুসলমান ভূগোলবিদদের অর্জিত সাফল্য দ্বারা আংশিকভাবে প্রভাবিত হয়েছিল। এই মত বা ধারণাকে কিছুটা উদার এবং ভূগোল শাস্ত্রে মুসলিম অবদানের প্রভাবকে কিছুটা হলেও মেনে নেয়া হয়েছে বলে মনে হতে পারে। কিন্তু এই বক্তব্যও সম্পূর্ণ সত্য প্রকাশিত হয়নি।

এ ব্যাপারে ইতিহাসের বাস্তবানুগ পর্যালোচনা থেকে একটি ভিন্ন চিত্র পরিস্ফুট হয়ে উঠে। পাশ্চাত্যে মধ্যযুগীয় ভূগোল সাহিত্যের সমগ্র চেহারা পরীক্ষা করে এর খামখেয়ালী বৈশিষ্ট্য এবং অহরহ কল্পকাহিনীর মিশ্রণ লক্ষ্য করা যায়, যা ছিল বস্তুতপক্ষে অন্ধকার যুগের উত্তরাধিকার। আইবেরীয় উপদ্বীপ, ভূমধ্যসাগরের অপর পাড়ে এবং এশিয়া মাইনরে ইসলামী সভ্যতা প্রতিষ্ঠা লাভের পর মুসলিম দর্শন ও বিজ্ঞান অজ্ঞতা এবং কুসংস্কারের বাধাসমূহ ভাঙ্গতে শুরু করে। শুরু হয় মানুষের চিন্তাজগতে দর্শন, বিজ্ঞান, জ্যোতির্বিজ্ঞান, গণিত, চিকিৎসাবিজ্ঞান, ভূগোল এবং সৃষ্টিতত্ত্বের ব্যাপক সম্ভার নিয়ে নতুন নতুন ধারণার আবির্ভাব। সাধু-সন্ন্যাসী, নবীন গবেষক, অনুবাদক, পরিব্রাজক ও ইহুদী অভিবাসীদের মাধ্যমে জ্ঞানচর্চার উল্লেখযোগ্য সূচনা হয়।

অধ্যাপক বারনাল-এর মতে, তখন মানুষের অগ্রসর চিন্তাভাবনার অবসান ঘটেছিল, এমনকি প্রাচীন নগররাষ্ট্রসমূহের চূড়ান্ত পতনেরও আগে এই পরিসমাপ্তি ঘটে। রোমে বিজ্ঞান চর্চার সুযোগ ছিল খুবই সামান্য, পশ্চিম ইউরোপের বারবারীয় রাজত্বসমূহে তো অস্তিত্বই ছিল না। গ্রীসের ঐতিহ্য যেখান থেকে এসেছিল সেখানেই অর্থাৎ আবার প্রাচ্যে ফিরে গেল। সিরিয়া,পারস্য, ভারত এমনকি সুদূর চীনে বিজ্ঞানের

www.waytojannah.com

ক্ষেত্রে নতুন প্রাণচাঞ্চল্য দেখা গেল এবং উজ্জ্বল সম্ভাবনাময় এক নতুন জীবনধারা তথা ইসলামের পতাকাতলে একত্রিত হলো। এটা ছিল সেই উৎস যা থেকে বিজ্ঞান ও কারিগরি বিদ্যা মধ্যযুগীয় ইউরোপে প্রবেশ করেছিল। আর এখান থেকেই অর্থাৎ এই প্রাথমিক পর্বের পরেই, আধুনিক বিজ্ঞানের আবির্ভাব। ডেমপিয়ার (Dampier)[১] বলেন, ইউরোপ আরবদের নিকট থেকে প্রচুর গ্রহণ করেছে, তাদের এই শেখার প্রক্রিয়া ৮০০ থেকে ১১০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে সর্বোচ্চ পর্যায়ে ছিল।

দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ইউরোপে বিজ্ঞানের চর্চা হতো আরবী ভাষায়, আরবী থেকে এমন কি গ্রীক থেকে অনূদিত বিজ্ঞান সাহিত্যেরও উঁচুমানের কদর ছিল। এ সময়ে আরবীভাষী জাতিসমূহ ও তাদের সাথে বসবাসকারী ইহুদীদের মধ্যে বিজ্ঞানের ব্যাপারে প্রকৃত আগ্রহ ছিল। মুসলিম দেশসমূহের সংস্পর্শে এসে মধ্যযুগের ইউরোপ তাদের ইতোপূর্বেকার অজ্ঞতাপ্রসূত দৃষ্টিভঙ্গি পরিহার করে অধিকতর যুক্তিবাদী মানসিক অভ্যাস গড়ে তুলতে সক্ষম হলো।

আরব চিন্তাধারা গ্রীক উৎস থেকে প্রাপ্ত জ্ঞানের ধারাকে সক্রিয় রাখে এবং আমাদের জ্ঞান-প্রকৃতিতে উল্লেখযোগ্য ও মৌলিক অবদান রাখে।[২] এ সময়ে ইসলামী সংস্কৃতি পুরনো সংস্কৃতির ট্রান্সমিটার হিসেবে এবং বিজ্ঞানের নতুন অগ্রগতির ক্ষেত্রে উদ্দীপক হিসেবে ভূমিকা পালন করে। বিজ্ঞান বিষয়ক ইসলামী রচনাবলী পাঠ করলে যে কেউ এর যৌক্তিক উপস্থাপনা দেখে অভিভূত হবেন, যা আধুনিক বিজ্ঞানেরও অনিবার্য অনুসঙ্গ। যা হোক, ইসলামী বিজ্ঞানের অবদান দৃশ্যমান। যদিও যারা এ সকল বিজ্ঞানকে লালন-পালন করেছে, সে সকল দেশ আজ এর ফলভোগ থেকে বঞ্চিত।

জ্ঞান-বিজ্ঞানের এই হস্তান্তর প্রণালীর মাধ্যমে আন্দালুসিয়া (স্পেন) থেকে সিসিলি, সিরিয়া এবং এশিয়া মাইনরে ছড়িয়ে পড়ে। চিন্তার এই স্রোতধারা অবশেষে ফ্রান্স, পশ্চিম ইউরোপ, ইংল্যান্ড, ইতালী, মধ্য ইউরোপ এবং দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপ অভিমুখে যাত্রা শুরু করে।

এটা ঠিক নয় যে আলকিন্দি, ইবনে সীনা, আল গাযালী, আল ফারাবী এবং ইবনে রুশদ্-এর দর্শনই কেবল ইউরোপের মনোজগতে প্রভাব সৃষ্টি করেছিল। নবম ও দশম শতাব্দীর পরে মুসলিম জ্যোতির্বিজ্ঞানী, গণিতবিদ, সৃষ্টিতত্ত্ববিদ ভূগোল বিজ্ঞানীদের চিন্তাধারা এবং বিশ্বের অন্যান্য জ্ঞানভাণ্ডার থেকে আহৃত জ্ঞান পাশ্চাত্যের জ্ঞানানুশীলনের সাথে অত্যন্ত ব্যাপ্রভাবে একীভূত হয়েছিল। জ্ঞানকে আত্মস্থ করা ও চর্চার মাধ্যমে জ্ঞানের সকল ক্ষেত্রে ইসলামের প্রাধান্যকে প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে কয়েকটি প্রজন্মের মধ্যেই মুসলমানদের অনুকরণে তারা বিদ্যালয়, শিক্ষাকেন্দ্র ও সেমিনারীসমূহ প্রতিষ্ঠা করে। ত্রয়োদশ এবং চতুর্দশ শতাব্দীতে মন্টপেল্লিয়ার

www.waytojannah.com

(Montpelliar), টউলাউস (Toulouse) প্যারিস, অক্সফোর্ড, সেলারনো (Salarno) নেপলস, পদুয়া (Padua) এবং কোলন (Koln)-এ তথাকথিত বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ গড়ে উঠে। চ্যানেলের অপর পাড়ে রজার বেকন (১২১৪–৯২ খ্রিস্টাব্দ) রবার্ট গ্রসেটেস্ট, হেইলস (Hales) ডানস স্কটাস, ওলখাম-এর উইলিয়াম, লিংকনএর বিশপসহ অক্সফোর্ডের বিখ্যাত গ্রুপ৩ তাদের অগ্রগামী আলোকবর্তিকা নিয়ে অগ্রসর হন। আরবীয় প্রভাবে গভীরভাবে প্রভাবান্বিত এই দল দর্শন থেকে শুরু করে গণিত ও ভূগোল সহ জ্ঞানের সর্বক্ষেত্রে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন। রজার বেকনের ভূগোল চিন্তা ছিল স্পষ্টরূপে আরবদের দ্বারা অনুপ্রাণিত। অগ্রসর চিন্তার কারণে তাঁকে যাদুকর হিসেবে অভিহিত করা হয় এবং শাস্তি দেয়া হয়। আরো কয়েক জনকেও কারারুদ্ধ করা হয় এবং তাদের পুস্তক নিষিদ্ধ করা হয়। এ্যারিস্টটলের কিছুসংখ্যক গ্রন্থ আরবী ভাষায় অনূদিত হয়েছিল কিন্তু সেগুলোকে অপবিত্র বিবেচনা করা হতো। নবম পোপ গ্রেগরী ১২৩১ খ্রিস্টাব্দে এ্যারিস্টটলের উপর পড়াশোনার বিরুদ্ধে ডিক্রি জারি করেন। এ দ্বারা মুসলিম উৎস থেকে জ্ঞানের ব্যাপক প্রসারের কথা স্পষ্টরূপে জানা যায়।

মুসলমানরা পাশ্চাত্যে পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণ পদ্ধতির সূচনা করে। এটা সকলেই স্বীকার করেন যে নরমেণ্ডির রাজা উইলিয়ামের শাসনামলে যে সকল আরব ইহুদী ইংল্যান্ডে আশ্রয় গ্রহণ করেছিল তারা অক্সফোর্ড স্কুলের প্রাথমিক অগ্রগতিরত সাহায্য করেছিলেন। সেখানে সাধারণভাবে আরবদের বিজ্ঞান চিন্তাকে আগ্রহের সাথে গ্রহণ করা হয়েছিল, ভূগোল বিষয়ক চিন্তা ও জ্ঞান ছিল তার গুরুত্বপূর্ণ অংশ। সুতরাং মধ্যযুগীয় ইউরোপে এবং পরবর্তীকালে আধুনিক বিশ্বে আরব সভ্যতার গুরুত্বপূর্ণ অবদান ছিল বিজ্ঞান, যদিও এর ফসল পরিপক্কতা অর্জন করে ধীরগতিতে।[৪]

দুইশত বছর ব্যাপী আটটি ক্রুসেড (প্রথম ক্রুসেড ১০৯৫ খ্রিস্টাব্দ) কতগুলো সাধারণ ও অনিবার্য পরিণতি ডেকে আনে। এ সময় প্রাচ্যের মুসলমানদের উপর খ্রিস্টানদের কয়েকটি প্রজন্ম ব্যাপী আগ্রাসন চলে, যা না হলে এ সকল তীর্থযাত্রী এবং সৈনিকেরা কখনো ঘর ছেড়ে বের হতো না। এর ফলে আরব সভ্যতা, সম্ভবত সে সময়ে দুনিয়ার সবচাইতে উন্নত সভ্যতার সাথে তাদের পরিচয় ঘটে। এক দিকে তারা অসংখ্য উন্নত জীবনোপকরণ ব্যবহার করা এবং মুসলমান শত্রুদের কাছ থেকে সুরুচিপূর্ণ সাংস্কৃতিক আচরণ সম্পর্কে শিক্ষালাভ করে। অপরদিকে তারা সাংস্কৃতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক ক্ষেত্রে এমন আরো কিছু বিষয় গ্রহণ করে, যা ইউরোপে সামাজিক, বাণিজ্যিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন করে।

বস্তুত পশ্চাদপদ ও অগ্রসর সম্প্রদায়সমূহের মধ্যে সব সময়েই ধারাবাহিকভাবে ব্যাপক যোগাযোগ ছিল। আধুনিক ঐতিহাসিকগণ উদারভাবে স্বীকার করেছেন যে

www.waytojannah.com

বিজ্ঞান ও কারিগরি ক্ষেত্রে আরবরা যারা গ্রীক, ভারতীয় এবং চৈনিক বিজ্ঞান ও দর্শনকে জয় করেছিল, উন্নত করেছিল, তাদের সেই অবদান হস্তান্তরের মাধ্যমেই ইউরোপীয় চিন্তাজগতে রেনেসাঁর ক্ষেত্রে প্রধান উপাদান হিসেবে ভূমিকা পালন করেছিল। এটা নতুন বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের আগ্রহী ছাত্রদের চিন্তাজগতকে শুধুমাত্র সম্প্রসারিতই করেনি, অধিকন্তু উদীয়মান মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আচার-আচরণকেও সিক্ত করেছিল।

সব ক'টি সেমিনারী এবং নতুন বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচী মুসলমান জ্ঞান-বিজ্ঞান দ্বারা প্রবলভাবে প্রভাবিত ছিল এবং অবশ্যম্ভাবীরূপে গণিত, জ্যোতির্বিজ্ঞান এবং সৃষ্টিতত্ত্ব (ভূগোলের সাথে ঘনিষ্ঠরূপে সম্পর্কিত) ইত্যাদি বিষয় অন্তর্ভুক্ত থাকতো। কিছুসংখ্যক বিখ্যাত বিজ্ঞান গ্রন্থ যেমন আল কিন্দির জ্যোতির্বিজ্ঞান ও আবহাওয়া বিজ্ঞান বিষয়ক রচনাবলী ল্যাটিন ভাষায় অনুবাদ করা হয়। সেইন্ট থমাস নেপলস যে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা গ্রহণ করেন, সে বিশ্ববিদ্যালয়টি আরব চিন্তাধারা কর্তৃক বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত ছিল। এখানে অনুসৃত পাঠ্যক্রম বোলগনা, পদুয়া এবং প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রচারিত হয়।

প্রকৃতপক্ষে সমগ্র মধ্যযুগব্যাপী পাশ্চাত্যে মুসলমান উৎস থেকে প্রাপ্ত জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন উপাদান এমনকি বিষয়াবলী পর্যন্ত কোনরূপ স্বীকৃতি ছাড়াই ব্যবহার করা হয়েছে। এরূপ করতে গিয়ে তারা আরব নামসমূহ এমনিভাবে পরিবর্তন করেছে যে, সেগুলো শুনতেও অদ্ভুত মনে হয়েছে। খ্রিস্টান ইউরোপের সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গি এরূপ ছিল যে, তারা জ্ঞান ও প্রজ্ঞার জন্মদানকারী। ইসলাম এবং গ্রীক এই উভয় সভ্যতা সম্পর্কে তারা কুসংস্কারাচ্ছন্ন বিরূপ মনোভাব পোষণ করতো। অথচ হেরোডোটাস-এর পরে মুসলমানরা ছাড়া আর কেউ পাশ্চাত্যে ঐতিহাসিক চেতনার বিকাশ এবং বিজ্ঞান চিন্তার চর্চায় অবদান রাখেনি। এভাবে ইউরোপে মুসলিম বিজ্ঞান-চিন্তার এই হস্তান্তর প্রক্রিয়া সেখানে সংঘটিত রেনেসাঁর ক্ষেত্রে শক্তিশালী উপাদান হিসেবে কাজ করে, যার ফলে পরবর্তী মাত্র কয়েকটি প্রজন্মের মাধ্যমে রেনেসাঁর কুঁড়ি পরিপূর্ণরূপে প্রস্ফুটিত হয়। বার হেব্রাকাস, রেমন্ড মারটিন, সেইন্ট থমাস, পিটার অব আইলি, নিকোলাস অব অট্রিকোর্ট, গিলাউম অব অকাম এঁদের মধ্যে আল গাযালীর প্রভাব স্পষ্টভাবে দৃষ্ট হয়। পাশ্চাত্যের নিকট মুসলিম দর্শন হস্তান্তরের[৫] ক্ষেত্রে ইসলামে প্রকৃতি দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা বকর যাকারিয়া আল রাযীর রচনাবলীর ল্যাটিন ভাষায় অনুবাদ প্রকাশিত হওয়া ছিল গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। অনুরূপভাবে আল ফারাবীর বেশ কিছু সংখ্যক রচনা পাশ্চাত্যে বেশ সুপরিচিত ছিল। কোন উৎস উল্লেখ না করে দান্তে তাঁর বিখ্যাত 'ডিভাইন কমেডি' (Divine Comedy) রচনা করেছিলেন, যা ছিল লাইলাতুল ইসরা এবং মিরাজ [রাসূল (সা)-এর মি'রাজ গমন]-এর চিত্রের পুনরাংকন মাত্র। দান্তে জাহান্নামের যে লেখচিত্র অংকন করেছিলেন তা ছিল ইবনে আরাবী কর্তৃক অংকিত

www.waytojannah.com

Contents

লেখচিত্রের প্রতিরূপ মাত্র। এর বেশ কিছু দিন পর গোঁড়ামী আর বর্বর মানসিকতা নিয়ে এমন একজন উঁচু পর্যায়ের খ্রিস্টান যাজকের আবির্ভাব হলো যিনি এমনকি হিটলারকেও ছাড়িয়ে গেলেন। তিনি তাঁর বিরুদ্ধ পক্ষের কাছ থেকে কোনরূপ জ্ঞানের কথা গ্রহণ করতে অনীহা প্রকাশ করলেন। কার্ডিনাল জিমেনেয (Cardinal Ximenez) যিনি ছিলেন রানী ইসাবেলার পাপ স্বীকার গ্রহণকারী পুরোহিত (Confessor), স্পেনের হাজার হাজার মুসলমানের নির্যাতনকারী ও হত্যাকারী, তিনি তাঁর হাতের নাগালে পাওয়া আরবী ভাষায় প্রণীত ৮০,০০০-এরও বেশী পাণ্ডুলিপি গ্রানাডার চত্বরে পুড়িয়ে বিনষ্ট করেছিলেন।[৬] নব জাগরণে উন্মুখ ইউরোপ যদি সেগুলো পেত, তাহলে উন্নতি ও অগ্রগতির সেই গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে কীরূপ প্রেরণাদায়ক ভূমিকা রাখতো।

সমগ্র মধ্যযুগে মুসলিম দেশসমূহে ভূগোল বিজ্ঞান কিভাবে সাধারণ বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক অগ্রগতির সাথে অপরিহার্য উপাদান হিসবে ভূমিকা পালন করেছে, সে সম্পর্কে পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে।

বস্তুত ত্রয়োদশ শতাব্দীতে মঙ্গোলদের আগ্রাসন ও লুণ্ঠন ছিল ইসলামী সভ্যতার উপর চরম আঘাত। এ সময়ে তাদের সকল অগ্রগতি ও উন্নয়ন ধ্বংস হয়ে যায়। কিন্তু বাগদাদ পর্যুদস্ত ও ধ্বংস হয়ে যাওয়ার (১২৫৮ খ্রিস্টাব্দ) মাত্র এক শতাব্দীর মধ্যে হাজার হাজার মঙ্গোল ইসলাম গ্রহণ করে। ফলে তার মুসলমান রাজপুরুষেরা, পারস্যের ইলখানগণ, এমনকি মধ্য এশিয়ার মুসলিম শাসকেরাও বিজ্ঞান এবং সংস্কৃতির সেবায় অসাধারণ অবদান রাখেন। এ সময়ে জ্ঞানের উৎকর্ষ ও গভীরতা, জ্ঞানী ব্যক্তিদের বুদ্ধিবৃত্তিক কার্যক্রম এবং ভূগোল বিষয়ক রচনাবলীর মান উচ্চতম শিখরে আরোহণ করে।

প্রাচ্যের তিমুরী, তুর্কী, কাজার ও মোঘল শাসকেরা যে সম্পদ, ক্ষমতা ও মর্যাদা তাদের সময়ে ভোগ করতো, ইউরোপে তাদের সমতুল্য তখন কেউ ছিল না। এ সময়ে যথেষ্ট পরিমাণে ভৌগোলিক তথ্য সংবলিত ইতিহাস ও সাহিত্য বিষয়ক রচনা সৃষ্টি হয়েছিল, যা ঘটনাক্রমে প্রাথমিক যুগের কিছু কিছু ইউরোপীয় অভিযান বিষয়ক বর্ণনার সাথে তুলনীয় (ষষ্ঠ অধ্যায় দ্রষ্টব্য)। প্রকৃতপক্ষে ত্রয়োদশ থেকে পঞ্চদশ শতাব্দী পর্যন্ত পুরো সময় জুড়ে চলেছিল মুসলিম সংস্কৃতির ধারাবাহিক অগ্রগতি। এ সময়ে ধারাবাহিকভাবে অত্যন্ত উঁচুমানের ভূগোল বিষয়ক রচনাবলীর আবির্ভাব হতে থাকে এবং তা ইউরোপের হাতে পৌঁছতে থাকে। অল্প কিছু কাল আগে, এমন কি বিখ্যাত পরিব্রাজক মার্কো পলো তাঁর ভূগোল বিষয়ক বর্ণনায় কিছু কিছু নামের ফারসী রূপ ব্যবহার করেছিলেন এবং তিনি ভারত মহাসাগরীয় এলাকায় নৌ-চলাচলের কিছু মুসলিম চার্টও দেখেছিলেন।

www.waytojannah.com

যখনই পাশ্চাত্য জগত কোন বিষয়ে গভীর জ্ঞান অথবা নতুন কোন জ্ঞানের প্রয়োজন অনুভব করেছে, তখনি তারা অনিবার্যরূপে আরব উৎসের কাছে হাত পেতেছে। তাই দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ইউরোপের প্রধানতম জ্ঞান চর্চামূলক তৎপরতা বলতে ছিল আরবী ভাষা থেকে অনুবাদ করা। ভূগোল বিষয়ক রচনাবলীসহ বিপুল পরিমাণ বিজ্ঞান সাহিত্য এ সময়ে আরবী থেকে ল্যাটিন ভাষায় অনুবাদ করা হয়। এ সকল অনুবাদক ছিলেন সারা ইউরোপের বিভিন্ন অংশ জুড়ে।

উদাহরণ হিসেবে বলা যায় ওয়ালসার অব ম্যালভার্ন (Walchar of Malvern), এডেলার্ড অব বাথ (Adelard of Bath), রবার্ট অব চেস্টার (Robert of Chester) এবং মিকায়েল স্কট (Michael of Scot) ছিলেন ইংরেজ; হারমান (Harmann) ছিলেন ডালমাটিয়ার বাসিন্দা; রুডলফ অব ব্রাজেস (Rudlof of Bruges) এবং হেনরি বেইট (Henry Bate) ছিলেন ফ্লান্ডারস-এর বাসিন্দা। আরমেন গাউড, জ্যাকব আনতোলি, মোজেজ ইবন তিব্বন, জ্যাকব বেন মাহির ছিলেন ফরাসী; প্ল্যাটো অব তিভোলী, জেরার্ড অব ক্রেমোনা, এরিসটিপ্লাস অব ক্যাটোনিয়া, সেলিভ অব পদুয়া এবং জন অব ব্রেসচিয়া ছিলেন ইতালির বাসিন্দা। এ ছাড়াও বেশ কয়েকজন ছিলেন স্পেনের অধিবাসী। তাঁদের মধ্যে ছিলেন জন অব সেভিল, হাঘ অব সানতালা এবং মার্ক অব টলেডো। আরবী ভাষা থেকে ল্যাটিন, আরবী থেকে হিব্রু এবং ল্যাটিন এবং আবার তা থেকে হিব্রু ভাষায় বিপুল পরিমাণে অনুবাদ কর্ম সম্পাদন করা হয়।

জ্ঞানের এমন কোন শাখা ছিল না, বিজ্ঞান অথবা ভূগোল যা'ই হোক না কেন–যা তখন অনুবাদকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেনি। এমনকি এটা অত্যন্ত স্বাভাবিক যে সুনির্দিষ্টভাবে কোন ভূগোল গ্রন্থ অনূদিত না হলেও সংশ্লিষ্ট গ্রন্থের ভাববস্তু হিসেবে অন্য কোন গ্রন্থের সাথে হুবহু সংযোজন করা হয়েছিল। এখানে সেরূপ গ্রন্থের বিস্তারিত তালিকা অথবা তাদের অনুবাদকের নামোল্লেখ করার আবশ্যকতা আছে বলে মনে হয় না। পাশ্চাত্যের শ্রেষ্ঠতম জ্ঞানকেন্দ্র টলেডো (১০৮৫ খ্রিস্টাব্দ) নগরীর পতনের পর খ্রিস্ট জগতের জন্য জ্ঞানের দরজা খুলে যায়। যুদ্ধের ডামাডোল শান্ত হয়ে আসার পর আগ্রহী শিক্ষার্থীরা ইউরোপ থেকে আরবীয় জ্ঞানকূপের (Artes Arabum) দিকে যেতে শুরু করলো। ইহুদী, খ্রিস্টান এবং মোযারাবগণ সম্মিলিতভাবে জ্ঞানের অভূতপূর্ব মিলনের মাধ্যমে পাশ্চাত্যের জন্য বিজ্ঞানসম্মত সমন্বয় গড়ে তোলে। দ্বাদশ শতাব্দীর উত্তর প্রজন্ম হিসেবে টলেডোতে যে বৈজ্ঞানিক ও অনুবাদ কার্যক্রম চলেছিল তা প্রকৃতপক্ষে তিন শতাব্দী পূর্বে বাগদাদে আব্বাসীয় যুগের বায়তুল হিকমা'র (অনুবাদ ব্যুরো)–কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।[৭]

স্পেনের রাজা আলফনসো আরবীয় বিজ্ঞানের ব্যাপারে বিশেষভাবে আগ্রহী ছিলেন। তিনি টলেডোর আর্চ বিশপের পরিচালনায় ও আর্চডিকন ডমিনিকো গানডিসলারী-এর তত্ত্বাবধানে একটি অনুবাদ স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। হিব্রু পণ্ডিত

www.waytojannah.com

জোহানেস বেন ডেভিড ছিলেন এ কাজে সক্রিয় সহায়তাকারী। ফলে বিশ বছরে বিপুল সংখ্যক বিজ্ঞান ও দর্শন বিষয়ক গ্রন্থ অনূদিত হয়। জেরার্ড অব ক্রেমোনো ছিলেন একজন অসাধারণ অনুবাদক। স্পেনে তাঁর দীর্ঘ অবস্থানকালে তিনি প্রায় সাতাশিখানা গ্রন্থ অনুবাদ করেন। তাঁকে বলা যেতে পারে ইউরোপে আরববাদের জনক। ১১৭৫ খ্রিস্টাব্দে জেরার্ড টলেডোতে প্রথমবারের মতো আলমাজেস্ট-এর পূর্ণাঙ্গ অনুবাদকাজ সম্পন্ন করেন। আরবী ভাষা থেকে এই অনুবাদের মাধ্যমে প্রথমবারের মতো আলমাজেস্ট পাশ্চাত্যের নিকট হস্তান্তরিত হয়। এ ছাড়াও তিনি বানূ মূসার গ্রন্থাবলী, আল-খাওয়ারিযমী, আল ফারঘানী, আল নাইরিযি, ছাবিত বিন কুররা, আল খাওয়ারিযমীর উপর আল বিরুনীর মন্তব্য এবং জাবির ইবন আফলাহ ও যারকালী প্রণীত ছকসমূহের অনুবাদ করেন।

বহু ইউরোপীয় পণ্ডিত উত্তর স্পেনের তারাগোনা, লিওন, সেগোভিয়া, পামপ্লোনাসহ বিভিন্ন শহরে বসবাস শুরু করেন। স্পেনীয়-আরবী শিক্ষা গ্রহণ করার প্রবণতা সমগ্র পাশ্চাত্যে ছড়িয়ে পড়লো এবং টলেডো থেকে উদ্ভূত জ্ঞানের তোরণপথ পিরেনীজ পর্বতমালার মধ্য দিয়ে ফ্রান্সের প্রভাঁস প্রদেশ এবং আলপাইন গিরিপথ হয়ে লরেইন, জার্মানী এবং মধ্য ইউরোপ এমনকি চ্যানেল অতিক্রম করে ইংল্যান্ডে প্রবেশ করে।৮ এর আগে কনস্টানচিনো আফ্রিকানো মুসলিম আফ্রিকা ও প্রাচ্যে ত্রিশ বছর ধরে সফর করেন। অতঃপর তিনি দক্ষিণ ইতালির সেলারনোর নিকটবর্তী মন্তে ক্যাসিনোতে অবস্থিত বেনেডিকটাইন গির্জায় অবস্থান গ্রহণ করেন। এখানে থেকে তিনি বহু আরবী গ্রন্থ অনুবাদ করেন। সিসিলি ছিল খ্রিস্টান ও আরব সংস্কৃতির আরেকটি মিলনকেন্দ্র। এই শান্তিপূর্ণ বিনিময়কালে সাহারা মরুভূমির ওপাড়ে আফ্রিকা সম্পর্কিত নতুন নতুন জ্ঞানে সমৃদ্ধ ভূগোল সাহিত্যাবলী সৃষ্টি হয় এবং এ সময়েই যুগান্তর সৃষ্টিকারী মহান ভূগোলবিদ আল ইদরিসির আবির্ভাব ঘটে। ভূগোল বিষয়ক জ্ঞানসহ এ সকল বুদ্ধিবৃত্তিক বিনিময়ের পরিমাণ ছিল উল্লেখযোগ্য। আর এর ফলে ইউরোপের ভূগোল-দর্শন ও রেনেসাঁর ক্ষেত্রে সুদূরপ্রসারী ও গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব সৃষ্টি হয়। বস্তুতপক্ষে অনুবাদের এই ধারা এমন কি ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত চলতে থাকে। পরবর্তীকালের এই অনুবাদ গ্রন্থসমূহ ইউরোপের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে, বিশেষ করে ফ্রান্স ও ইতালির বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে ব্যবহৃত হয়।

দ্বাদশ শতাব্দীতে ইউরোপের ভূগোল বিষয়ক অধিকাংশ গ্রন্থ ছিল ল্যাটিন ভাষায় এবং খ্রিস্টান তীর্থ সফরের বিবরণমূলক রচনা। উরজবুর্গ ছিলেন দ্বাদশ শতাব্দীর শেষের দিকের একজন জার্মান তীর্থযাত্রী, জোয়ানেস ফোকাস ছিলেন একজন সৈনিক, যিনি পরবর্তীকালে সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করেন। তিনি এন্টিয়ক থেকে জেরুযালেম পর্যন্ত বিভিন্ন নগরী ও দুর্গের বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন। রিডহার্ড কোয়ের ডিলায়ন ছিলেন একজন ক্রুসেডার রাজা। সিগার্ড ছিলেন নরওয়ের রাজা। তিনি পরে একজন গোঁড়া

www.waytojannah.com

ক্রুসেডারে পরিণত হন। তিনি প্যালেস্টাইন পর্যন্ত দীর্ঘপথে উল্লেখযোগ্য সফর করেন এবং ১১০৭ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১১১১ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে ফিরে আসেন। বাহ্যিকভাবে এটি ছিল উত্তর সাগর হয়ে ভূমধ্যসাগর ও এজিয়ান সাগরের উপর দিয়ে একটি যোদ্ধাদলের অগ্রযাত্রার বিবরণ। স্থলপথে ইউরোপ হয়ে নিজ দেশে ফিরে আসার আগে তিনি স্পেনের বিভিন্ন এলাকায় মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। সিসিলি দ্বিতীয় রজারের সুসংস্কৃত রাজদরবারে হাযির হন। তাঁর রচিত গ্রন্থে কিছু কিছু ভৌগোলিক উপাদান এবং প্রাচ্যের সাথে তাঁর বিভিন্নমুখী যোগাযোগের প্রচুর নিদর্শন পাওয়া যায়।

পেডরো আলফনসো দক্ষিণ দিককে উপরের দিকে প্রদর্শন করে পৃথিবীর স্কেচ ম্যাপ তৈরী করেছিলেন, যাতে স্পষ্টভাবে মুসলিম নমুনার অনুসরণ দেখা যায়। এই ম্যাপে সাতটি জলবায়ু অঞ্চলের হুবহু অনুকরণ করা হয়েছে। ১১১০ খ্রিস্টাব্দে হেনরী মেঈনী (Henry Mayenee) একটি প্রবন্ধ সংকলন প্রকাশ করেন, যাতে একটি ম্যাপ সংযুক্ত ছিল। ১১১৯ খ্রিস্টাব্দে গুইডো (Guido) ভৌগোলিক বিশ্বকোষ রচনা করেন। তিনি সম্ভবত একজন ইতালীয় ভূগোলবিদ ছিলেন। ল্যামবার্ট অব সেইন্ট ওমের (Lambert of Saint Omer) একখানা বিশ্বকোষ রচনা করেন, যাতে তিনি পৃথিবী গোলাকার হওয়া সম্পর্কিত তাঁর বিশ্বাস অত্যন্ত জোরালোভাবে উপস্থাপন করেন। তিনি তাঁর পাণ্ডুলিপিতে ম্যাপ সংযুক্ত করেছিলেন। হারমান দ্য ডালমাটিয়ান (Harmann the Dalmatian) সৃষ্টিতত্ত্ব সম্পর্কিত তথ্যাবলী লিপিবদ্ধ করেন এবং বার্নার্ড সিলভেস্টার তাঁর বিখ্যাত দ্য মুন্ডি (De Mundi) রচনা করেন।

উপরে বর্ণিত প্রায় সকল লেখক এবং তাঁদের সমসাময়িক অন্যান্য লেখক ছক ও নকশাদির সাহায্যে ভৌগোলিক বিষয়াদির বর্ণনা করেছেন। তবে এর সবগুলোই ছিল ধর্মীয় রঙে রঞ্জিত এবং ল্যাটিন ঐতিহ্যে অনুসৃত। ত্রয়োদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে ভিন্ন ধরনের পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। তা হলো ঐ সময়ে অনুবাদ সাহিত্যের মাধ্যমে যে সকল আরবীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান ইউরোপে পৌঁছেছিল, তার পূর্ণ প্রভাব স্পষ্ট হয়ে উঠে। তখন পণ্ডিতগণ যে এ ব্যাপারে সচেতন ছিলেন শুধুমাত্র তাই নয়, তাঁরা এর প্রয়োজনীয়তাও অনুভব করতে শুরু করেছেন। মুসলমানদের ভৌগোলিক জ্ঞান ও তথ্যাবলী তখন ল্যাটিন জগতে এবং মধ্যযুগের ইউরোপে নতুন চিন্তাধারার প্রধান উদ্দীপক হিসেবে ভূমিকা রাখতে শুরু করেছে।

ফলে পাশ্চাত্যে নিশ্চিতরূপে ভূগোল বিষয়ক চিন্তাভাবনা ও লেখালেখির ক্ষেত্রে নতুন একটি পর্যায়ের উদ্ভব হয়। ভিনসেন্ট বিউভেইস, এলবার্ট দ্য গ্রেট, রজার বেকনসহ আরো অনেকে আরবদের ভূগোল-চিন্তা এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য ক্ষেত্রের জ্ঞান বিজ্ঞান দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। ইংরেজ জ্যোতির্বিজ্ঞানী ও গণিতবিদ জোনস স্যাক্রোবসকো (জন অব হলিউড) ১২৩৩ খ্রিস্টাব্দে তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ স্ফায়ারা মুণ্ডি (Sphaera mundi) রচনা করেন। তাঁর এই গ্রন্থ বিশেষভাবে আল ফারঘানী এবং

www.waytojannah.com

Contents

আল বাত্তানীর উপর ভিত্তি করে রচিত হয়েছিল। পাশ্চাত্যে এই গ্রন্থ এতই জনপ্রিয় হয়ে উঠে যে বেশ কয়েকটি ভাষায় এর অনুবাদ প্রকাশিত হয় এবং সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত তা ব্যবহৃত হতে থাকে। উইলিয়াম দ্য ইংলিশম্যান (William the Englishman) ১২৩১ খ্রিস্টাব্দে প্রধানত আল যারকালী এবং আল বিতরুজীর ব্যাখ্যা গ্রন্থ উপস্থাপন করেন। ফরাসী ডমিনিক্যান (ডমিনিক পন্থী সাধু) পণ্ডিত ভিনসেন্ট বিউভেইস একখানা বিশ্বকোষ সংকলন করেন। তিনি ১২৬৪ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর এই বিশ্বকোষ ছিল এক বিস্ময়কর দলিল। এই গ্রন্থের ভৌগোলিক ও ভূতাত্ত্বিক তথ্যাবলী সংগ্রহ করা হয়েছে আরব উৎস থেকে। এলবার্ট দ্য গ্রেট ছিলেন আরেকজন খ্যাতনামা ডমিনিক্যান চিন্তাবিদ এবং বহু গ্রন্থের প্রণেতা। তিনি ১২৮০ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন। তিনি গ্রীক বা আরবী ভাষা জানতেন না, তবে ল্যাটিন মাধ্যমে প্রচুর জ্ঞান অর্জন করতে সক্ষম হন। তিনি মুসলিম চিন্তাধারা সম্পর্কে গভীরভাবে অধ্যয়ন করেন এবং তাদের ভূগোল বিষয়ক চিন্তাভাবনা দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হন। রজার বেকন রচিত অপাস মাজুস (Opus Majus) ছিল আরব উৎস থেকে সংগৃহীত ভৌগোলিক তথ্যাবলী দ্বারা পরিপূর্ণ। ১২৪৬ খ্রিস্টাব্দের দিকে গসসোইন অব মেটজ (Gossuin of Metz) বা ওয়ালটারস কর্তৃক রচিত গ্রন্থ mage du monde গ্রন্থখানি ব্যাপকভাবে মুসলিম জ্ঞান-বিজ্ঞানের তথ্যাবলী দ্বারা সজ্জিত। ১২১৭ থেকে ১২৬০ অথবা ১২৪৭ (সিরকা)-এর মধ্যে একজন অজ্ঞাতনামা লেখক প্রাচীন নরওয়েজিয়ান ভাষায় ভূগোল বিষয়ে বিশ্বকোষের আঙ্গিকে কোনাংগস স্কুজস্‌জা (Konangs skuggsja) শিরোনামে প্রবন্ধাবলী রচনা করেন। ঐ লেখক ছিলেন একজন সাধারণ ধর্মযাজক অথবা রাজদরবারের যাজক। তাঁর গ্রন্থের বেশীর ভাগ উপাদান আরব অঞ্চল থেকে ফিরে আসা ক্রুসেডার এবং তীর্থযাত্রীদের বিবরণের উপর ভিত্তি করে সন্নিবেশিত। এই বিবরণের মধ্যে স্পষ্টভাবে ভূগোল এবং বিশেষ করে ভৌত ভূগোল বিষয়ক চেতনা লক্ষ্য করা যায়। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, পৃথিবী গোলাকার। এই গ্রন্থে আরবদের প্রভাব স্পষ্টভাবে লক্ষ্য করা যায়। ইংরেজ পরিব্রাজক স্যার জন মেনডিভিলের সফর বিবরণী অত্যধিক কল্যাণশ্রয়ী হলেও এতে ভৌগোলিক উপাদান লক্ষ্য করা যায়। এই গ্রন্থকে আরবদের মধ্যে প্রচলিত ভৌগোলিক জ্ঞানের পুনরাবৃত্তি বলে প্রতীয়মান হয়।

ভারতে উপনীত হওয়া এবং দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে অবস্থিত কাল্পনিক স্বর্গের অনুসন্ধানের উদ্দেশ্যে কলম্বাস কর্তৃক আটলান্টিক অতিক্রম করার পূর্ব পর্যন্ত শত শত বছর যাবত আরব এবং আফ্রিকান উপকূল থেকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত ভারত মহাসাগরে ব্যবহৃত সকল নৌপথ আরব নাবিকদের সাধারণ গতিপথে পরিণত হয়েছিল। এ সকল সাগরে ছোটখাটো উপকূলীয় পোত ছাড়াও কমপক্ষে এক হাজার লোক বহনকারী বড় বড় জাহাজ চলাচল করত। আল মাসউদী দশম শতাব্দীর শেষের

www.waytojannah.com

দিকে সমুদ্রপথে চলাচলকারী বর্তমান কালের বড় বড় শিপিং কোম্পানীগুলোর অনুরূপ কিছু কিছু কোম্পানীর নাম উল্লেখ করেছেন।

স্বল্প কিছু উদ্যোগের মাধ্যমে অযোরস এবং ক্যানারী দ্বীপপুঞ্জ সম্পর্কে জানা শোনার বাইরে (দেখুন ইবনে সাঈদ এবং ইদরিসি) আটলান্টিক মহাসাগরে মুসলমানদের তেমন উল্লেখযোগ্য অভিযান লক্ষ্য করা যায়নি। পৃথিবী গোলাকার হওয়া সম্পর্কিত ধারণার ফলে (আমেরিকার অস্তিত্ব সম্পর্কে না জানা সত্ত্বেও) মুসলমান নাবিকরা বাহরে মুহিত বা জুলমাতের অজানা বিশাল সাগরে (আটলান্টিক মহাসাগর) পাড়ি দেয়ার ঝুঁকি নেয়া প্রয়োজন মনে করেনি। কারণ চেনাজানা অঞ্চলে সহজেই ভারত মহাসাগর হয়ে পৌঁছা সম্ভব। পশ্চিম ইউরোপীয়দের কাছে ভারতের সাথে যোগাযোগ করা, দূরপ্রাচ্য ও চীনের সাথে বাণিজ্যে শরীক হওয়া ছিল গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। প্রাচ্যের সম্পদ এবং সমৃদ্ধি পঞ্চদশ শতাব্দীর ইউরোপীয় নাবিকদের লালিত স্বপ্নকে সব সময় প্রজ্বলিত করে রাখত। তারপরও টলেমী কর্তৃক পৃথিবীর পরিধি সম্পর্কে অবমূল্যায়ন এবং স্বর্গের সন্ধান করার প্রচলিত সাধারণ প্রবৃত্তি তাদেরকে পশ্চিম দিকে নৌ-অভিযানের ব্যাপারে উৎসাহিত করে থাকতে পারে। পৃথিবী গোলাকার হওয়ার ধারণা তাদের এই আকাঙ্ক্ষাকে আরো অনুপ্রাণিত করে।

তবে মধ্যযুগে মানচিত্রাংকনের ক্ষেত্রে অর্জিত সাফল্য প্রকৃতপক্ষে মানচিত্র প্রস্তুতকারকদের (mappac mundi) দক্ষতার কারণে অর্জিত হয়নি। বরং এটা ছিল নাবিকদের দ্বারা পর্যায়ক্রমে প্রস্তুতকৃত চার্টসমূহের (portolani) পরিণত রূপ। এদের উৎপত্তি কিভাবে হয়েছে সে বিষয়টি অস্পষ্ট, তবে এ সকল চার্টের উপস্থিতি ছিল তাদের প্রয়োজনের সঙ্গী। স্পষ্টরূপে পরস্পর ভিন্ন এলাকার মধ্যে ব্যাপক নৌ-তৎপরতার ফলে এরূপ চার্ট এবং ম্যাপের প্রয়োজন অনুভূত হয়। আরব জগতে এগুলোর উৎপত্তি নিঃসন্দেহে বিশাল বিস্তৃত ভারত মহাসাগর ও দূরপ্রাচ্যে তাদের ব্যাপক নৌ-অভিযানের সাথে সম্পৃক্ত। কারণ এ সময়ে বহু পেশাদার জাহাজ চালক এবং 'সাগরের সিং' (Lion of the Sea) নামে পরিচিত বিভিন্ন ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব হয় (যেমন মুহাম্মদ বিন শাযান, সাহল বিন আবান এবং লাইস বিন কাহলান ইত্যাদি)। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ দিকে বিখ্যাত নাবিক আহমদ ইবনে মজিদ এঁদের নাম উল্লেখ করেছেন। এমনকি দশম শতাব্দীর শেষ দিকে আল মাকদিসি ভারত মহাসাগরের চেনাজানা প্রায় সকল এলাকায় ব্যাপক নৌ-ভ্রমণের বিবরণ দিতে গিয়ে লিখেছেন যে, "আমাকে নিয়ে যাওয়া হলো একদল লোকের মাঝে, যাঁরা ছিলেন জাহাজের চালক, নাবিক, গণিতবিদ, দালাল এবং ব্যবসায়ী, যাঁরা তাঁদের জীবন কাটিয়েছেন এ সকল সাগরে। সাগর, বন্দর এবং তীরবর্তী এলাকাসমূহ সম্পর্কে তাঁদের

www.waytojannah.com

রয়েছে স্পষ্ট ও পূর্ণ জ্ঞান। এর (সাগরের বিভিন্ন স্থানের) অবস্থান, ভৌত বৈচিত্র্য এবং সীমাবদ্ধতা সহ বিভিন্ন বিষয়ে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে আমি তাঁদের উত্ত্যক্ত করে তোলতাম। আমি তাদের নিকট চার্ট এবং নির্দেশিকাবলী দেখেছি, যেগুলো তাঁরা নিয়মিতভাবে পর্যালোচনা করতেন এবং আস্থার সাথে অনুসরণ করতেন। আমার পক্ষে সম্ভব সর্বোত্তম তথ্যাবলী যথেষ্ট পরিমাণে সংগ্রহ এবং সেগুলো গভীর মনোযোগ ও সতর্কতার সাথে বিচার বিশ্লেষণের পর – যা আমি পরে পূর্বকথিত চার্টসমূহের সাথে তুলনা করে দেখেছি....." [৯]

এরূপ চার্টের নিয়মিত ব্যবহার সম্পর্কে মার্কো পলোর পর্যবেক্ষণ থেকেও নিশ্চিত হওয়া যায়। তিনি বলেছেন যে, সিংহলীয় উপকূল এবং এর চারপাশের সাগর সম্পর্কে তিনি এ সকল সাগরের নাগরিকদের ব্যবহৃত চার্টসমূহ থেকে জানতে পেরেছিলেন। র‍্যামন লুলও তাঁর সাথে কম্পাস এবং চার্ট থাকার কথা উল্লেখ করেছেন। অবশ্য এরূপ চার্টের অনেকগুলো কপি থাকার কথা নয় এবং গোপনীয়তা রক্ষার বিষয়টি এক্ষেত্রে কার্যকর থাকতে পারে। তবে এগুলোর ব্যাপক ব্যবহার সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হওয়া যায়। অদ্যাবধি এ সকল চার্টের কোন কপি আবিষ্কৃত হয়নি। আশা করা যায় ভবিষ্যতে এগুলো আবিষ্কৃত হবে এবং এগুলোর নমুনা দিনের আলো দেখতে পাবে। আরব নাবিকেরা এমনকি আবিষ্কারের যুগেরও বহু আগে নিয়মিতভাবে তাদের চার্ট এবং যন্ত্রপাতি ব্যবহার করতো। ১৬১৫ খ্রিস্টাব্দে স্যার থমাস রো বলেছিলেন যে তিনি মাদাগাস্কারে একজন মুয়াল্লিম ইব্রাহিমের সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন, যিনি তাঁর কার্ড সংশোধন করে দিয়েছিলেন। একজন ইউরোপীয় ঐতিহাসিক[১০] সঠিকভাবেই মন্তব্য করেছেন যে, "ঐ সময়ে আরবরা (পঞ্চদশ শতাব্দীতে) কম্পাসের ব্যবহার জানতো এবং তাদের নিকট এরূপ সামুদ্রিক চার্ট ও ম্যাপ ছিল যে, তাতে বিভিন্ন দেশের অবস্থান অত্যন্ত নির্ভুলভাবে চিহ্নিত করা হয়েছিল, তারা কোয়াড্রেন্ট ছাড়া চলতো না, যার সাহায্যে তারা সূর্যের উচ্চতা এবং বিভিন্ন স্থানের অক্ষাংশ নিরূপণ করতো। সংক্ষেপে বলতে গেলে এই শিল্পে তাদের দক্ষতা এতই নিপুণ ছিল যে নৌ-চালনা বিদ্যায় পর্তুগীজ নাবিকদের তুলনায় তারা খুব সামান্যই পিছিয়ে ছিল।"

ইউরোপীয় পোর্টোলানী (Portolani) চার্ট সম্পর্কে সর্বপ্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় ১২৭০ খ্রিস্টাব্দের ক্রুসেডের সময়। কথিত আছে যে, ইংল্যান্ডে প্রথম সমুদ্রযাত্রা সম্পর্কিত চার্ট দেখা যায় ১৪৮৯ খ্রিস্টাব্দে। এটা সকলেই স্বীকার করেন যে, এই চার্টগুলো ছিল দীর্ঘ বিবর্তনের ফল। 'কার্টে পিসান' (Carte Pisan-১৩০০ খ্রিস্টাব্দ) হচ্ছে তার প্রাচীনতম নমুনা। তথাকথিত মেডিসিয়ান এটলাস ১২৫১ খ্রিস্টাব্দে তৈরী হয়েছিল। পোর্টোলানী চার্টসমূহ প্রথম তৈরী হয়েছিল উত্তর ইতালির বর্ধিষ্ণু নগরসমূহে, কাতালান উপকূল এবং মেজরকা দ্বীপে তা চরম উৎকর্ষে পৌঁছে। ১৩৭৫ খ্রিস্টাব্দের কাতালান এটলাস হচ্ছে তার শ্রেষ্ঠ উদাহরণ। কিন্তু প্রাচীনতম হিসেবে

www.waytojannah.com

Contents

পরিচিত 'চার্টে পিসান'-যাকে বলা যায় মানচিত্রাংকনের প্রাথমিক প্রচেষ্টা, সেটিও যেন তার চাইতে প্রাচীন কোন চার্ট বা ধারানুক্রমে প্রণীত কোন চার্টের অনুকরণ। ফ্রান্সের চতুর্থ চার্লসের জন্য প্রস্তুতকৃত ১৩৭৫ খ্রিস্টাব্দের কাতালান ম্যাপমণ্ডে (The Catalan Mappmonde) ছিল মার্কো পলোর মধ্যযুগীয় ভূগোলের যথাসম্ভব পূর্ণাঙ্গ রূপায়ণ। এতে প্রথমবারের মতো চীন এবং ভারতীয় উপদ্বীপের প্রায় সঠিক অবস্থান দেখানো হয়েছে। কিন্তু পেসচেল (Peschel)-এর মতে আল বিরুনী[১২] তার আগেই এরূপ চার্ট প্রস্তুত করেছিলেন। ম্যাপের কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য থেকে বোঝা যায় যে পলোর দেয়া তথ্যাবলী অনুসরণ করা হয়েছে। কিন্তু কিছু স্থানের নাম ও এলাকা যেমন দিল্লী, বিওগি (দেওগির), ক্যামবেটাম (ক্যামবায়াত-ক্যামবে), বারোচে (বারুচ), নেরুয়ালা (আনহিলওয়ারা), চীনের কিছু অংশ, তুর্কীস্তান এবং সাইবেরিয়া ইত্যাদি স্থান মূল ভেনিসীয় ম্যাপে নেই। ইউরোপীয় পোর্টোলানী এবং এ ব্যাপারে আরবদের প্রাথমিক উদ্যোগের মধ্যে স্পষ্ট সম্পর্ক নিরূপণ করা খুব একটা সহজ কাজ হবে বলে মনে হয় না (এর কোনটিরই সম্ভবত এখন আর অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যাবে না)। তবে পাশ্চাত্যের নমুনাগুলো যে পুরোপুরি তাদের নিজস্ব নয়-এ ব্যাপারে আশা করি এতক্ষণ যথেষ্ট বলা হয়েছে। এতে অবশ্যই মুসলমানদের বহুল ব্যবহৃত নমুনার এবং তাদের ভূগোল বিষয়ক গ্রন্থাবলীতে বর্ণিত তথ্যাবলীর কিছু না কিছু প্রভাব ছিল। কাতালান চার্টের প্রথম প্রস্তুতকারকের নাম অজ্ঞাত। তবে এতে মেজরকা দ্বীপের শক্তিশালী প্রভাব লক্ষ্য করা যায়, যারা ছিল আংশিক আরব এবং আংশিক ইহুদী।

মধ্যযুগের ইউরোপীয় মানচিত্রাংকন প্রচেষ্টাকে পোর্টোলানী চার্ট এবং পর্তুগালের নাবিক প্রিন্স হেনরীর নৌ-অভিযান সম্পর্কিত অভিজ্ঞতার সাথে সমন্বয়ের প্রচেষ্টা হিসেবেও চিহ্নিত করা হয়ে থাকে। ১৪১৫ খ্রিস্টাব্দের দিকে উত্তর আফ্রিকার সিওটার কাছে মুসলমানদের বিরুদ্ধে হেনরীর প্রথম ক্রুসেডের সময় তার মুসলমান শত্রুদের বিস্তৃত জ্ঞানজগত সম্পর্কে জানার আগ্রহ সৃষ্টি হয়। বস্তুতপক্ষে হেনরী এবং তার উত্তরসুরিদের দ্বারা পরিচালিত পর্তুগীজ নৌ-অভিযানসমূহ আরব ও ইহুদী জ্যোতির্বিজ্ঞান ১৪১৯ খ্রিস্টাব্দের আযোরস আবিষ্কার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়। তিনি সিওটায় তাদের নিকট থেকে আফ্রিকার অভ্যন্তরভাগ এবং পশ্চিম উপকূলে সুদূর গায়েনা পর্যন্ত প্রচলিত ব্যবসায়-বাণিজ্য সম্পর্কিত মূল্যবান তথ্যাবলী সংগ্রহ করতে সমর্থ হন।[১৩] যুদ্ধের পর দেশে ফিরে আসার পর পর্তুগালের শাসক হিসেবে তিনি সাধারণভাবে জ্ঞানার্জন এবং বিশেষ করে ভূগোল ও নৌবিদ্যার পৃষ্ঠপোষকে পরিণত হন। তিনি মানচিত্রাংকন এবং জ্যোতির্বিজ্ঞানের পাঠদান ও এ সম্পর্কিত যন্ত্রপাতি ব্যবহারের ক্ষেত্রে পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করেন। তিনি নিজে গোঁড়া ধার্মিক হওয়া সত্ত্বেও তাঁর জন্য এমন কিছু শিক্ষক নিয়োজিত করেছিলেন, এমনকি সে কারণে সৃষ্ট

www.waytojannah.com

রাজনৈতিক সমস্যাকেও তিনি উপেক্ষা করেছিলেন। তাঁর কিছু সংখ্যক গণিতবিদ ছিলেন আরব। এভাবে বিভিন্নমুখী সমন্বয়ের প্রভাব হেনরীর পরে পঞ্চদশ শতাব্দীর ম্যাপসমূহেও লক্ষ্য করা যায় এবং পরবর্তীকালেও তা অব্যাহত থাকে। মুসলিম উৎস থেকে তাঁর সংগৃহীত তথ্যের এরূপ মিশ্রণের মাধ্যমে ভূগোল বিষয়ক তথ্যাবলীর ক্ষেত্রে প্রচুর অনুপ্রবেশ ঘটে। ফলে ইউরোপের ম্যাপ প্রস্তুতকারকগণ বিভ্রান্ত হয়ে পড়েন এবং এরূপ ম্যাপের উল্লেখযোগ্য উদাহরণ হলো ফ্রা মাউরা ম্যাপ, ১৪৫৯ (Fra Maura)। এই ম্যাপে সঠিকতার মাত্রা কিছুসংখ্যক কাতালান ম্যাপের চাইতেও কম ছিল। যেমন আফ্রিকা অংশে অর্থাৎ আবিসিনিয়ার ক্ষেত্রে তিনি মার্কোপলোর তথ্য এবং আরবীয় ধারণার সংযোগ ঘটান এবং এগুলোর পরস্পর পাশাপাশি অবস্থান রচনা করেন। আরো তিনটি উদাহরণ যেমন এ্যাস্ট (Este), ওয়াল স্পারজার এবং জেনোয়েস (Genoese) ম্যাপ। এগুলো আনুমানিক একই সময়ে প্রস্তুত করা হয়েছিল। এই তিনটি ম্যাপেই নির্ভুলভাবে জোরালো আরব প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। এ্যাস্ট ম্যাপ সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে একজন আধুনিক ভূগোলবিদ বলেছেন, এতে একদিকে আরব প্রভাব অত্যন্ত স্পষ্টভাবে লক্ষ্য করা যায়, অপরদিকে এতে সরাসরি কোন ক্লাসিক্যাল প্রভাব প্রমাণ করা যায় না। সুতরাং এই ম্যাপ টলেমী থেকে কোন ধারণা গ্রহণ করে নাই। এ সম্ভাবনাও খুব কম যে এর প্রণেতা দক্ষিণের মহাদেশ থেকে তথা এই মতের উৎপত্তিস্থল ক্রেটস থেকে গ্রহণ করেছেন। বরং এই ধারণা গ্রহণ করা হয়েছে আরবদের নিকট থেকে অথবা আবুল ফিদা অথবা আইসিডোর-এর মতো খ্রিস্টান সৃষ্টিতত্ত্ববিদের (Cosmographer) নিকট থেকে, যারা এই ধারণাকে পুনঃজীবন দান করেছিলেন। মধ্যযুগীয় খ্রিস্টান ঐতিহ্য রেসটার জন (Prester John) এবং পৃথিবী কেন্দ্রিক স্বর্গের রূপকথা দ্বারা প্রতারিত হয়েছিল। এটা নিঃসন্দেহে আরবদের প্রভাব। আলোচ্য ম্যাপে আফ্রিকার দক্ষিণাংশের যেরূপ বর্ণনা দেয়া হয়েছে তার সাথে একাদশ শতাব্দীর লেখক আল বিরুনী কর্তৃক প্রদত্ত মহাসাগরের দক্ষিণ উপকূলীয় এলাকার বর্ণনার তুলনা করলে মিল খুঁজে পাওয়া যাবে। ফ্রা মাউরা ম্যাপেও কিছু আরবী নাম দেখা যায় যেমন আবাসিয়া (হাবশা–হাবশাহ) এবং সেলান (Ceylon)। অনুরূপভাবে মার্টিন বেইহাম কর্তৃক প্রস্তুতকৃত গ্লোবে (১৪৮২) দেখা যায় মোয়াবার ('মা' আবার-করমন্ডল উপকূল) এর নাম।

ছদ্ম পণ্ডিতেরা আরব উৎস থেকে প্রাপ্ত জ্ঞানের যে কোন উপাদান প্রত্যাখ্যান করার চেতনা লালন করতো। অর্থোডক্স চার্চের মতের পরিপন্থী এবং অচল টলেমীয় জ্ঞানের বিপরীত হওয়ার কারণে তারা এমন কি মার্কো পলো সহ যে কোন খ্রিস্টান ভ্রমণ সাহিত্যকেও প্রত্যাখ্যান করতো। এই চেতনা এতই প্রবল ছিল যে এমন কি

www.waytojannah.com

আবিষ্কারের যুগের (Age of Discovery) পরেও বহু ইউরোপীয় মধ্যযুগের শুরুর দিকের অনেক প্রমাণিত সত্যকেও প্রত্যাখ্যান করতো। এরূপ তথ্য প্রচুর থাকা সত্ত্বেও অংকিত মানচিত্রে সেগুলো পূর্ণরূপে দেখানো হয়নি। আবার আলোচনা অংশে সে সকল তথ্য অন্তর্ভুক্ত করা হলেও যথোপযুক্ত স্বীকৃতি প্রদান করা হয়নি। ফলে এ সকল বিষয় মধ্যযুগের ইউরোপীয় ভূগোলের ইতিহাস সত্য কি সত্য নয় – এ সম্পর্কিত সন্দেহকে আরো বিস্তৃত করতে সাহায্য করেছে। এ অবস্থা বলতে গেলে ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত চলতে থাকে। ইউল-এর মতে, "একটি অস্বাভাবিক বিশৃঙ্খল অবস্থা যা গ্রহণযোগ্য কোন সত্যের কাছাকাছি পৌঁছতে পারে না।" মারকেটর (Mercator –১৫৯৭), ম্যাগিনি (১৫৯৭) ইত্যাদি ম্যাপে এর প্রমাণ খুঁজে পাওয়া যায়। এমনকি স্যানসনের (১৬৫৯) ম্যাপে পলো এবং মধ্যযুগের আরো কিছু সংখ্যক পরিব্রাজকের দেয়া তথ্যাবলী বেশ সতর্কতার সাথে গ্রহণ করা হয়। কিন্তু তারপরও এ ম্যাপ সম্পর্কে সন্দেহের নতুন উপাদান যুক্ত হয় যখন দেখা যায় যে, এতে ১৫২৬ খ্রিস্টাব্দে রোম থেকে প্রকাশিত ইদরিসির ম্যাপের বেশ কিছু উপাদান নেয়া হয়েছে।

কেউ কেউ মনে করেন যে, গাণিতিক জ্যোতির্বিজ্ঞান এবং মানচিত্রাংকনের ক্ষেত্রে মধ্যযুগের শেষ ভাগে এবং রেনেসাঁর কালে ইউরোপীয় ভূগোল আংশিকভাবে মুসলিম ভূগোল দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। কিন্তু সাধারণভাবে ইসলামী ভূগোল সাহিত্য মধ্যযুগীয় ইউরোপের চিন্তাজগতে কোন ছাপ রাখতে পারেনি। কারণ এ সকল ভূগোলবিদ কর্তৃক প্রণীত গ্রন্থাবলীর জন্য কোন ল্যাটিন অনুবাদক পাওয়া যায়নি। কিন্তু পূর্ববর্তী আলোচনা থেকে এটা খুবই স্পষ্ট হয়েছে যে মুসলিম দেশসমূহ এবং খ্রিস্টান ইউরোপের সাথে বহুমুখী যোগাযোগ হয়েছিল। এর প্রতিফলন দেখা গেছে ব্যবসায়-বাণিজ্যের তৎপরতায়, সামাজিক আচরণ ও সাংস্কৃতিক মনোভাবের বিনিময় এবং ব্যাপক বুদ্ধিবৃত্তিক তৎপরতার ফলে ইউরোপে নতুন ধ্যান-ধারণার আগমন ঘটে। সুতরাং ইউরোপে সে সময়ের আলোকিত মন বর্ণনাত্মক ও আঞ্চলিক ভূগোলের ক্ষেত্রে মুসলমানদের অবদান সম্পর্কে অনবহিত থাকতে পারে না। এরপর আসলো ক্রুসেড, ফলে আরব ব্যবসায়ীদের সীমিত উদ্যোগ এত বিশাল বাণিজ্যিক সম্পর্কে পরিণত হলো যে, তা টলেমীর ভূগোলের সীমানা অতিক্রম করলো। ক্রুসেড চলাকালে এবং পরে পূর্ব ও পশ্চিমের সাথে স্থাপিত যোগাযোগের ফলে সমগ্র ইউরোপ লাভবান হয়। ক্রুসেডের পরে সাধারণভাবে মানুষের জীবন ধারণের মান বেড়ে যায় এবং তাদের মনের জগতের পরিধিও বিস্তৃত হয়। প্রাচ্যের সম্পদরাজি, তাদের সোনা, সিল্ক, মণিমুক্তা, বিভিন্ন প্রকারের মসলা এবং শিল্পকর্ম সমগ্র খ্রিস্টান দুনিয়ায় সমাদর লাভ করে। 'পৃথিবীর চুড়া' (World summit) সম্পর্কিত ধারণাটি এসেছে হিন্দুদের 'আরিন' (Arin) থেকে। এটা ছিল সমগ্র আরবীয় পদ্ধতির একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। এ সকল উৎস থেকে বিকশিত হয়ে রজার বেকনের হাতে এসে তা (Opus Majus) এবং পরবর্তীকালে কার্ডিনাল

www.waytojannah.com

Contents

পিয়েরে দ্যা এইলী-এর ভাষায় 'ইমেজ ডু মন্ডে' (Image du Monde) নামে প্রকাশিত হয়। আর এ সকল ধারণা থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে কলম্বাস তাঁর পৃষ্ঠপোষক স্পেনের রানী ইসাবেলাকে 'পৃথিবীর আরেকটি চুড়া'র অস্তিত্ব (Over against the mouth of the Orinoco) সম্পর্কে লিখেছিলেন।

মঙ্গোলিয়ার তৃণভূমি থেকে তাতারদের লক্ষণীয় উত্থানের পর পোপকে একটি ধারণা প্রায় আচ্ছন্ন করে ফেলে যে এই ধর্মহীন যাযাবর জাতিকে খ্রিস্ট ধর্মমতে ধর্মান্তরিত করতে হবে এবং ইসলামকে নিশ্চিহ্ন করার কাজে তাদের শক্তি ও উদ্যোগকে ব্যবহার করতে হবে। সুতরাং যাজকীয় দূত দলকে যেমন ১২৪৫ খ্রিস্টাব্দে সাধু জন ডি প্ল্যানো কারপিনিকে এবং ১২৩৫ খ্রিস্টাব্দে সাধু উইলিয়াম ডি রুব্রোকিসকে এবং মঙ্গোল খানদের রাজদরবারে প্রেরণ করা হয়। এরপর শুরু হয় মার্কো পলোর বিখ্যাত সফরসমূহ (১২৭১) এবং ১৩১৮ খ্রিস্টাব্দে সাধু অডোরিকের প্রাচ্য সফর। উপরোল্লিখিত সাধুদের মধ্যে প্রাথমিক পর্যায়ের সাধুগণ তাঁদের ধর্মীয় মিশনের ব্যাপারেই বিশেষভাবে আগ্রহী ছিলেন এবং ভৌগোলিক তথ্যাবলীর ব্যাপারে তাঁদের আগ্রহ ছিল সামান্য। যদিও ইউরোপীয় সাহিত্যে তাঁদের কিছু কিছু পর্যবেক্ষণের উদ্ধৃতি পাওয়া যায়। প্রকৃতপক্ষে অডোরিক ভূগোল সম্পর্কিত জ্ঞানের জগতে কোন কিছুই সংযোজন করেননি। পলো পৃথিবী সম্পর্কিত জ্ঞানভাণ্ডারে নতুন তথ্য সংযোজনের ক্ষেত্রে বিশাল অবদান রাখেন। কিন্তু এত কিছুর পরও ইউরোপীয় মন-মানসিকতা তখনো ধর্মীয় কুসংস্কারে এতই আচ্ছন্ন ছিল যে এর ফলে ভূগোলসহ বিজ্ঞানের সকল শাখা এবং মানবীয় জ্ঞানের সকল উৎস সেই অন্ধকারে আচ্ছাদিত হয়ে থাকে। দুটি উপাদান ইউরোপীয় মন-মানসিকতার উপর গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব রাখতো। তাদের মধ্যে একটি হলো, খ্রিস্টান পাদ্রীদের ভূয়া ভৌগোলিক ধারণা এবং অপরটি হলো ক্লাসিক্যাল ভূগোলবিদদের অসংখ্য বাতিল মতবাদ যেমন স্টারবো এবং টলেমীর মতবাদ। যে সকল তথ্য তাদের বদ্ধমূল ধারণার বিরুদ্ধে যেত সেগুলো প্রমাণিত সত্য হলেও সহজে গ্রহণযোগ্য হতো না। বরং কখনো কখনো প্রবল বিরোধিতা, এমনকি উপহাসের সম্মুখীন হতে হয়েছে। সুতরাং এভাবে পৃথিবী সম্পর্কে আরবীয় জ্ঞানের কিছু কিছু বিষয় প্রত্যাখ্যাতও হয়েছে। কিন্তু এত বাধা-বিপত্তির মধ্যেও ইউরোপের কিছু ভূগোল বিষয়ক এবং আধা ভূগোল বিষয়ক রচনাবলীতে আরব উৎসের সন্ধান পাওয়া যায়।

বাইবেলভিত্তিক সংক্ষিপ্ত জ্ঞানকোষ স্পেকুলাম (Speculum)-এর লেখক বিখ্যাত ডমিনিক্যান সাধু ভিনসেন্ট অব বিউভাইস (খ্রিস্টাব্দ ১২৫০) নীল নদের উপত্যকার বিভিন্ন নগরীর বর্ণনা দিতে গিয়ে অন্যান্য লেখকের পাশাপাশি ইবনে সীনার উদ্ধৃতিও উপস্থাপন করেছেন। সাধু এলবার্ট দ্য গ্রেট, যাঁর লেখায় সাধারণত পৃথিবী সম্পর্কে বিভিন্ন গোঁড়া মতবাদ থেকে সরে আসার আলামত পাওয়া যায়– তিনি তাঁর আফ্রিকার অভ্যন্তরভাগ এবং উষ্ণমণ্ডল বহির্ভূত অঞ্চল সম্পর্কে বেশ কিছু তথ্য আরব উৎস থেকে

www.waytojannah.com

Contents

গ্রহণ করেছিলেন। এরপর আসে দি ইংলিশম্যান, স্যার জন ম্যানডিভিল (খ্রিস্টাব্দ ১৩৫৬)-এর কল্পিত ভ্রমণের কথা। এই ভ্রমণ বিবরণীগুলোকে খাঁটি কল্পকাহিনী, রূপকথা ও পৌরাণিক কাহিনী হিসেবেই বিবেচনা করা হয়, যেগুলো সংগ্রহ করা হয়েছে অন্যের লেখা থেকে[১৫] অথবা নিছক জনশ্রুতি থেকে। ম্যানডিভিল লেইজ এলাকায় চিকিৎসা পেশায় নিয়োজিত ছিলেন এবং ১৩৭২ খ্রিস্টাব্দে সেখানেই মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর রচিত উক্ত গ্রন্থ বহু ইউরোপীয় ভাষায় অনূদিত হয়েছে। এতে দেখা যায় সলিনাম, প্লিনিং এবং অডিরিকের প্রচলিত পৌরাণিক কাহিনীর পুনরুজ্জীবন ঘটানো হয়েছে, যার সাথে খুব কৌশলে আরবীয় উৎস থেকে প্রাপ্ত জ্ঞানের সংমিশ্রণ ঘটানো হয়েছে। চতুর্দশ এবং পঞ্চদশ শতাব্দীতে এই বই বিপুল জনপ্রিয়তা লাভ করে। এতে পৃথিবী সম্পর্কে ইউরোপীয়দের সাধারণ ধারণা উপস্থাপন করা হয়েছে। আরবীয় উৎস থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে পৃথিবীর পরিধি বলা হয়েছে ২০৪২৫ মাইল। বিষুব রেখা ছাড়িয়ে তার ব্যক্তিগত সফরের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে লেখক ঘোষণা করেছেন যে পৃথিবীর পরিধি ২০৪২৫ মাইল, যা আসলে আরব উৎসের অনুকরণ।

বিষুব রেখা ছাড়িয়ে তার ব্যক্তিগত সফরের ভিত্তিতে লেখক এন্টার্কটিক তারকার পরিবর্তে আর্কটিক-এর ভিত্তিতে পর্যবেক্ষণের পর মন্তব্য করেছেন যে, দক্ষিণে এবং পূর্বে অবশ্যই আবাসযোগ্য ভূমি আছে। আসলে এটা ছিল তখনকার সময়ের প্রচলিত বিশ্বাসের প্রতিফলন। এই বর্ণনা আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর আলোকপাত করে। তা হলো পৃথিবীর আবাসযোগ্য ভূমির অস্তিত্ব সম্পর্কে পাশ্চাত্যের এই ধারণা এবং মুসলিম দেশসমূহেও একই রকম ধারণার পারস্পরিক সঙ্গতি। উপরোক্ত উদাহরণ থেকে পৃথিবী এবং ভূগোল সম্পর্কে মুসলিম জ্ঞানের (যেমন মাসউদী), আল বিরুনী, ইদরিসি এবং আরো অনেকে) প্রভাব প্রসঙ্গে একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হতে পারে। প্রকৃতপক্ষে তাদের ঐতিহ্যসিক্ত মন-মানকিতার প্রভাবেই এরূপ লেখনীর সৃষ্টি হয়েছে এবং পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণের ভিত্তিতে জ্ঞানের যে আলাদা জগত আছে সে ব্যাপারে কৌতূহলী মনের খোরাক যুগিয়েছে। কার্ডিনাল পিয়েরে দ্য ইলী কর্তৃক ট্র্যাকটেটাস ইমাজিন মুনডি (Tractatus Imagin Mundi) শীর্ষক গ্রন্থখানি প্রণীত হয়েছে রজার বেকনের ১৪০ বছর পরে। গ্রন্থখানিকে একই সাথে সমকালীন অনুসন্ধান ও ভ্রমণ বিবরণীর বিস্মরণও বলা যায়। এ ব্যাপারে তিনি যথার্থই বলেছেন যে, "স্বল্প কিছু সংখ্যক আরবী উদ্ধৃতির কথা বাদ দিলে সমগ্র গ্রন্থখানি আসলে হাজার বছর আগে ইবনে সীনা ও ইবনে রুশদের ল্যাটিন ভাষায় অনূদিত গ্রন্থের ভিত্তিতে রচিত হয়েছে।"[১৬] সুতরাং দেখা যায় যে ভূগোলের ক্ষেত্রে সংঘটিত রেনেসাঁ প্রথম থেকেই আঁকাবাঁকা পথ অনুসরণ করেছিল।

www.waytojannah.com

ইউরোপীয় ভূগোলবিদগণ আফ্রিকার বিভিন্ন অংশের তথ্যাবলী উপস্থাপনকালে যেমন সাহারা ও সুদান (ঘানা, গিনি উপকূলের অংশ বিশেষ, সেনেগাল ও নাইজার) সম্পর্কে মুসলিম উৎস থেকে প্রাপ্ত তথ্য ব্যবহার করেছিলেন। মুসলমানদের তথ্যগুলো ছিল এ সকল দেশের সাথে তাদের উন্নতমানের ব্যবসায় ও বাণিজ্যিক লেনদেনের ভিত্তিতে। উত্তর আফ্রিকার মুসলমানগণ ঐ সকল এলাকার সম্পদরাজি সম্পর্কে জানতো। আর তাদের মাধ্যমে এ সকল তথ্য দক্ষিণ ইউরোপের ভূমধ্যসাগরীয় দেশসমূহে পৌঁছে। পাশ্চাত্যের লোকেরা তাদের মাধ্যমে আফ্রিকার পশ্চিম উপকূলের খনিজ সম্পদ এবং এখানকার ব্যবসায়-বাণিজ্য সম্পর্কে অবগত হয়। বস্তুত মুসলমানরাই এশিয়া ও উত্তর আফ্রিকার আধুনিক ভূগোলের ভিত্তি স্থাপন করে।[১৭]

পরবর্তীকালে উত্তমাশা অন্তরীপকে ঘিরে পর্তুগীজদের নৌ-তৎপরতার এক বিস্ফোরণ ঘটে। এ সকল অভিযানের কারণগুলো হচ্ছে, আবিসিনিয়ার প্রেস্টার জনের ধর্মীয় আহ্বানের (শত্রুকে চূড়ান্তভাবে পরাজিত করার জন্য ক্রুসেডারদের উদগ্র আকাঙ্ক্ষা) সাথে একাত্ম হওয়ার ধর্মীয় প্রেরণা, ব্যবসায়-বাণিজ্যের মাধ্যমে তাৎক্ষণিক মুনাফা অর্জন করা এবং গিনি উপকূলের সোনা আহরণের উদ্দেশ্যে দূরপ্রাচ্যের সাগরসমূহে পৌঁছা, যে সম্পর্কে তারা মুসলিম বর্ণনাসমূহ থেকেই অবগত হয়েছিল।

শারীরবিদ্যা ও ভৌত ভূগোলের ক্ষেত্রে আরবদের প্রচেষ্টাসমূহ ছিল খুবই উন্নতমানের। তারা ভূমিক্ষয়, ভূমিকম্প, পর্বত সম্পর্কিত বিদ্যা এবং এমনকি মহাদেশীয় বায়ুপ্রবাহ সম্পর্কেও উৎসাহব্যঞ্জকভাবে আলোকপাত করেছেন। ইখওয়ানুস সাফা রচনাবলীর লেখকবৃন্দ, ইবনে সীনা এবং আল বিরুনী সাধারণত এ সকল বিষয়ে আলোকপাত করেছেন। সম্ভবত ইউরোপ এ সকল অগ্রসর চিন্তাভাবনা সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে অনবহিত ছিল না। যেমন সেয়ারশেল-এর জনৈক আলফ্রেড ইবনে সীনার গ্রন্থ অনুবাদের মাধ্যমে পর্বত, নদী ও উপত্যকার উৎপত্তি, সাধারণভাবে এগুলোর ভূমিকা এবং নীল নদের জলোচ্ছ্বাস নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত বিষয়াদি উপস্থাপন করেছিলেন। এ সকল জ্ঞান অন্যান্য লেখক ছাড়াও তুদেলার বেনজামিন এবং লিও আফ্রিকানাস-এর লেখনীর মাধ্যমেও ইউরোপে পৌঁছে। সামগ্রিকভাবে পাশ্চাত্য জগত বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অজ্ঞানতার অন্ধকারে নিমজ্জিত থাকাকালেও আরবদের ভূগোল সম্পর্কিত জ্ঞান সম্পদ শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে বিভিন্ন পথে ইউরোপে পৌঁছতে থাকে।

ধীরে ধীরে মুসলমানদের বেশীর ভাগ ভূগোল সম্পর্কিত মৌলিক ও চলতি ধারণাসমূহ পাশ্চাত্যে প্রবেশ করে। এ সকল ধারণার মধ্যে ছিল পৃথিবীর আকার, এর আবর্তনশীলতা, সাগর ও মহাসাগরসমূহ, ভূ-তাত্ত্বিক প্রক্রিয়াসমূহ, জলবায়ু, উদ্ভিদ ও প্রাণীকুলের অঞ্চলভিত্তিক বন্টন, আফ্রিকা, দূরপ্রাচ্য ও মধ্য এশিয়ার নতুন নতুন এলাকা

www.waytojannah.com

সম্পর্কিত জ্ঞান, মানচিত্র অংকন কৌশল এবং যন্ত্রপাতির ব্যবহার। এ সকল জ্ঞানকে বিভিন্ন মাত্রায় অঙ্গীভূত করে ইউরোপের প্রধান প্রধান ভূগোল সাহিত্যের বিকাশ ঘটে। আর এভাবে তথাকথিত ম্যাপ দ্য মুণ্ডে (Mappe de munde)-এর পটভূমি রচিত হয় এবং কলাম্বিয়ান যুগের সূচনাপথে অগ্রসরমান পরবর্তী প্রজন্মের কিছু কিছু ম্যাপ যেমন স্লেটার ম্যাপ (Pslater map খ্রিস্টাব্দ ১২০০), হেয়ার ফার্ড ম্যাপ (Here ferd map-১৪৫০), এ্যাস্ট ওয়ার্ল্ড ম্যাপ (Este world map-খ্রিস্টাব্দ ১৪৫০), ফ্রা মাউরার আফ্রিকা (Fra Maura's Africa-১৪৫৯) এবং ইমেজ দ্য মন্ডে Image du Monde-১৪৮০)-এর ডায়াগ্রাম।

যদিও বাস্তবতা থেকে যথেষ্ট পরিমাণে দূরে সরে আসা এ সকল ম্যাপে দেখা গেছে প্রচলিত সংস্কার এবং গির্জার ছায়া, তারপরও এ সকল ম্যাপে আরবদের দ্বারা প্রস্তুতকৃত মানচিত্রের ছাপ এবং তাদের ভৌগোলিক তথ্যাবলীর স্পষ্ট উপস্থিতি লক্ষ্য করা গেছে।

আরব ভূগোল বিজ্ঞানীগণ যে চেতনা নিয়ে লিখেছেন, বর্ণনা করেছেন এবং বিশ্লেষণ করেছেন তার সাথে মিশেছিল জ্ঞান ও সত্যের পুঙ্খানুপুঙ্খ স্বীকৃতি। যে কোন যুগের চিন্তাবিদের মতো তাঁরাও আরব এবং ক্লাসিক্যাল এই উভয় ধারার পূর্বসূরীদের রেখে যাওয়া জ্ঞানের গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। কিন্তু তাঁরা ছিলেন দূরদৃষ্টিসম্পন্ন এবং মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী। তাঁদের এই দৃষ্টিভঙ্গির সাথে মিশ্রিত হয়েছিল আধুনিক পরীক্ষণভিত্তিক বিজ্ঞানের ঠিক আগের যুগের উপযোগী সমালোচক মনোভঙ্গি। তাঁরা শুধুমাত্র তাঁদের আশপাশের দুনিয়ার বিষয়াবলীই বর্ণনা করেননি, পাশাপাশি তাঁরা পরিবেশের উপর প্রভাব সৃষ্টিকারী ভৌত ও সাংস্কৃতিক উপাদানসমূহকে ব্যাখ্যা করার প্রয়াস নিয়েছিলেন।

এশিয়া ও আফ্রিকা সম্পর্কিত নতুন জ্ঞানাবলীকে তাঁরা তাঁদের লেখনীসমূহে অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন এবং সেগুলো নিকট ও দূরে সর্বত্র ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। তাঁদের সংগৃহীত তথ্যাবলী এবং ধারণকৃত বিশ্বাসসমূহ অনিবার্যরূপে মুসলিম দেশসমূহ ছাড়া অনারব ইউরোপীয় দেশসমূহেও গৃহীত হয়েছিল। নকলকারী ও অনুকরণকারীরা কারো স্বীকৃতি না দিয়ে নির্বিচারে গ্রহণ করেছে, এমনকি তারা অলীক ও কল্পকাহিনী মিশ্রিত করে তাদের ব্যক্তিগত খাহেশ মেটানোর চেষ্টা করেছে। তারপরও রেনেসাঁ-পূর্বযুগের জ্ঞান তার নিজের অজান্তে অথচ অবিচলভাবে বেড়ে উঠতে থাকে।

সার্বিকভাবে বলতে গেলে দ্বাদশ, ত্রয়োদশ, চতুর্দশ এবং পঞ্চদশ শতাব্দী ছিল পরিবর্তন ও আপসের কাল। এ সময় ছিল আত্মীকরণ এবং পরস্পর মিশে যাওয়ার সময়। কারণ এ সময়েই পরস্পর বিরোধী মুসলিম ও খ্রিস্টান সংস্কৃতি একে অপরের খুব কাছে এসেছিল। যার ফলে সৃষ্টি হয়েছিল নতুন ইউরোপের ভিত্তিমূল। আর এই

www.waytojannah.com

ভিত্তিমূলে আছে গ্রীক-আরব-ল্যাটিন ভাষায় জ্ঞানের আদান-প্রদান, পঞ্চদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে মুদ্রণ শিল্পের আবির্ভাবের পর বহু গ্রীক-আরব বিজ্ঞান গ্রন্থ যন্ত্রের সাথে বারেবারে মুদ্রিত হয়েছিল। বস্তুত কোপার্নিকাসের বৈপ্লবিক বিজ্ঞান চিন্তা প্রকাশিত হওয়া এবং ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে পরীক্ষণভিত্তিক বিজ্ঞানের শুরু হওয়া পর্যন্ত ইউরোপে আরব-বিজ্ঞানের প্রভাব স্থায়ীভাবে ক্রিয়াশীল ছিল। তবে ইউরোপীয় চিন্তাজগতের অন্যতম উপাদান হিসেবে আরব বিজ্ঞানের প্রভাব আরো দীর্ঘকাল অর্থাৎ বলতে গেলে পরিপূর্ণ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি জন্ম হওয়ার এবং শিল্প বিপ্লব শুরু হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত কার্যকর ছিল।

কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর প্রাচ্যবিদগণ, ইউরোপ ও আমেরিকার চিন্তাবিদগণ এই উত্তরাধিকারের বহু দিক এবং মধ্যযুগীয় বিজ্ঞান ও ভূগোলের মূল উৎসকে অস্বীকার করেছেন।

অতি সম্প্রতি ভূগোল বিজ্ঞানের ইতিহাস বিষয়ে রাশিয়ান পণ্ডিত ক্রাসকোভস্কি রচিত অসাধারণ গ্রন্থ প্রকাশিত হওয়ার পর ভূগোল বিজ্ঞানে আরব ভূগোলবিদদের অবদান সম্পর্কিত কিছু বিষয় স্পষ্ট হয়েছে। ভূগোল বিজ্ঞানের প্রাথমিক অবস্থা থেকে পরবর্তীকালের বিকাশের ক্ষেত্রে মুসলমান ভূগোলবিদদের ভূমিকা সম্পর্কে জানার জন্য এখন ভূগোলের ইতিহাস সম্পর্কে আগ্রহী আধুনিক ভূগোল বিজ্ঞানীদেরকে এগিয়ে আসতে হবে।

www.waytojannah.com

তথ্যসূত্র

১. ডেমপিয়ার (Dampier) পৃ. ৬০
২. পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৫
৩. র‍্যামসে মুইর (Ramsay Muir), British History, পৃ. ৮৩
৪. উলকেন, (Ulken), Muslim Philosophy, খ-২, পৃ. ১৩৫৫
৫. উলকেন, History of Muslim Philosophy, খ-২, পৃ. ১৩৬৯
৬. History of Muslim Philosophy, খ-২, পৃ. ১৩৮১
৭. আহমদ, Muslim Contribution to Geography,পৃ. ১৩৯
৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪০
৯. মাকদিসি, আহসান আত-তাকাসিম, পৃ-১৪
১০. জে. গিবস (J. Gibbs), History of the Portuguese during the Region of Emmanuel, খ-১, পৃ. ৫৩
১১. বিবলিওথিক ন্যাশনেল (লাইব্রেরী), প্যারিস, ছয়টি পার্চমেন্ট (চামড়ার তৈরী লেখার উপযোগী পাতা) এ্যাটলাস আকারে সংরক্ষিত।
১২. Yule and Cordier, The Book of Ser Marco Polo, খণ্ড-১, পৃ. ১৩৪
১৩. কীন (Keane), The Evolution of Geography, পৃ. ৮-৯.
১৪. ডিকিনসন এ্যাণ্ড হাওয়ার্থ (Dickinson and Howarth), পৃ. ৭২
১৫. সারটন, খ-২, পৃ. ১৬০২-৪
১৬. কিম্বল (Kimble), Geography in the Middle Ages, পৃ. ২০৯
১৭. বার্নাল (Bernal), Science in History, খ-১, পৃ. ২৭৬
১৮. কীন (Keane), The Evolution of Geography, পৃ. ৪৭-৪৮
১৯. আহমদ, Muslim Contribution to Geography, পৃ. ১৫৭

www.waytojannah.com

গ্রন্থপঞ্জি

মৌলিক ও অনুবাদ গ্রন্থ

আবুল ফারাজ কুদামাহ, কিতাবুল খারাজ (বিবলিওথিক জিওগ্রাফোরাম এরা বিকোরাম মুদ্রিত, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, M.J. de Geeje, লেইডেন, ১৮৭০, পৃ. ৯৪।

আবুল ফজল আল্লামী, আইন-ই-আকবরী, ইংরেজী অনুবাদ, H.S. Jarrett, কলিকাতা, ১৮৯৪।

আবুল ফিদা, তাকভীম আল বুলদান-Geographic d' Abulfeda (ফরাসী ভাষায় এবং জে.টি. রেইনাউদ কর্তৃক প্রদত্ত টীকাসহ) প্যারিস, ১৯৪৮।

আল বালাজুরী, ফুতুহুল বুলদান, পি. কে. হিট্টি কর্তৃক অনূদিত, ২ খণ্ড, নিউইয়র্ক, ১৯১৬।

আল বলখী, সুয়ারাহ আল আকালিম (জলবায়ুর চেহারা) সম্পা. এবং অনু. Le Strange and Nicholson, ক্যামব্রিজ, ১৯২১।

আল বিরুনী, কিতাবুল হিন্দ (আল বিরুনীর ভারত) অনু. E. Sachau, কেগান পল, লন্ডন, ১৯১৪।

মুক্তা সম্পর্কিত অধ্যায়, "Books on Precious Stones" বই থেকে, অনু. F. Krenkow, Islamic Culture, পঞ্চদশ খণ্ড, হায়দরাবাদ, ১৯৪১।

আল ইস্তাখরী, কিতাবুল মামালিক ও মামালিক (Oriental Geography থেকে নেয়া), অনু. স্যার আউসাল, লন্ডন, ১৮০০।

বেকন, আর, অপাস মাজুস, অনু. আর.বি. ব্রুক, ২ খণ্ড, ফিলাডেলফিয়া, ১৯২৮।

বুজুর্গ ইবনে শাহরিয়ার, কিতাব আযাইব আল হিন্দ (Lure Des Mervenilles de L'Inde) Par Van Lith P.A. Traduction Francais, Par L. মার্সেল ডেভি, লেইডেন, ই. জে. ব্রিল, ১৮৮৩-৮৬।

কসমাস. আই. খ্রিশ্চিয়ান টপোগ্রাফি, অনু. Me Crindle (হাকলুত সোসাইট) ১৮৯৭।

www.waytojannah.com

হামদুল্লাহ মুসতাওফা, নুযহাতুল কুলুব, ইংরেজী অনু. G. Le Strange,গিব মেমোরিয়াল সিরিজ, লণ্ডন, ১৯১৯।

হুদুদ আল আলম (Anon), The Regions of the World, সম্পা. এবং অনু. V.Minorsky, লন্ডন, ১৯৩৭।

ইবনুল বলখী, ফারস্‌নামাহ্‌, অনু. G. Le Strange, লন্ডন, ১৯১২।

ইবনুল কিফতি, তারিখুল হুক্‌মাহ্‌, সম্পা. জুলিয়াস লিপার্ট লিপজিগ, ১৯০৩।

ইবনে বতুতা, Travels in Asia and Africa, অনু. এইচ. এ. আর. গিব, লন্ডন, ১৯২৯।

ইবনে জুবাইর, রিহলাত ইবনে জুবাইর (Travels) সম্পা. De Geeje গিব মেমোরিয়াল সিরিজ, লন্ডন, ১৯০৭।

ইবনে খালদুন, মুকাদ্দিমাহ (Prolegomena)

ইবনে খুরদাবিহ্‌, কিতাবুল মাসালিক ওয়া মামালিক (In Bibleoteca Geographorum Arabi-corum), মুদ্রিত ৬ষ্ঠ সংস্করণ, M.J.de Goeje , লেইডেন, ১৮৮৯।

মাকদিসি (আল-মুকাদ্দিসি) আহসানুল তাকাসিম ফি মা' আরফাতিল আকালিম (জলবায়ু সম্পর্কিত অধ্যয়নের জন্য সর্বোত্তম বিভাজন) ইংরেজী অনুবাদ, Ranking and A300, কলিকাতা, ১৮৯৭–১৯১০।

মাসউদী, মারুজ আল জাহাব (সোনার তৃণভূমি ও মূল্যবান পাথরের খনি), বাগদাদ, এবং ইংরেজী অনুবাদ (অসম্পূর্ণ) এ. স্প্রেঙ্গার, লন্ডন, ১৮৪১।

রাফী, আমিন আহমদ, হাফত ইকলিম, ইংরেজী অনু. আবদুল মোকতাদির, মাহফুজুল হক, কলিকাতা, ১৯১৮–১৯৩৯।

সোলাইমান তাজির এবং আবূ যাইদ সিরাফি, আখবারুল সিন ওয়াল হিন্দ, (Voyage du Marchand Arabe, ইত্যাদি) জি. ফাররান্দ-এর মন্তব্যসহ, প্যারিস, ১৯২২।

ইয়াকুত আল হামাভী, মু'জামুল বুলদান এ. Wusterfeld কর্তৃক সম্পাদিত, ছয় খণ্ড, লিপযিংগ, ১৯২৪।

মুজামুল উদাবা, সম্পা. মারগুলিথ, গিব মেমোরিয়াল সিরিজ ১৯১৩।

যাইনউদ্দীন শেখ (আল মা'আবারী), তুহফাতুল মুজাহিদীন ইংরেজী অনুবাদ, এম. হুসাইন নাইনার, মাদ্রাজ, ১৮৪২ এবং ইংরেজী অনুবাদ, এম. জে. রোল্যান্ডসন, লণ্ডন, ১৮৩৩।

সাধারণ

আহমাদ নাফিস, Muslim Contribution to Geography During the Middle Ages," ইসলামিক কালচার, হায়দরাবাদ, জুলাই, ১৯৪৩।

www.waytojannah.com

Contents

-Muslim Contributions to Astronomical and Mathematical Geography," ইসলামিক কালচার, হায়দরাবাদ, এপ্রিল, ১৯৪৪।

– The Arab's Knowledge of Ceylon" ইসলামিক কালচার, হায়দরাবাদ, জুলাই, ১৯৪৫।

আহমদ যাকী ওয়ালিদি, Islam and the Science of Geography, ইসলামিক কালচার, হায়দরাবাদ, অক্টোবর, ১৯৩৪

আহমদ যিয়াউদ্দীন, গণিতের ছাত্রদের উদ্দেশ্যে ভাষণ, ১০ম খণ্ড, নং ১, ১৯৪২।

আল মাসউদী, শতবর্ষ উদযাপন সংখ্যা, সম্পা. মকবুল আহমাদ, The Indian Society for the History of Science, মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়, আলীগড়, ভারত, ১৯৬০।

আর্নল্ড টি. কেটি এবং গুইলাউম, এ, The Legacy of Islam, অক্সফোর্ড, ১৯৩১।

বেকার জে, এল, এন, History of Geographical Discovery and Exploration, হাররাপ, ১৯৩৭।

বারনী, যিয়াউদ্দীন, আল বিরুনী (উর্দু ভাষায়), আলীগড় ১৯২৭।

বারথল্ড, ডব্লিউ, মুসলমান কালচার (শহীদ সোহরাওয়ার্দী কর্তৃক ইংরেজী অনুবাদ) কলিকাতা, ১৯৩৪।

বিযলে, স্যার রেমণ্ড, The Dawn of Modern Geography, তিন খণ্ড, ১৮৯৭-১৯০৬, লন্ডন।

বার্ড হুবার্ট, Arab Novigators, মুতামা আল আরাবী, ২১ আগস্ট, ১৯৩৪, বিবিসি, লন্ডন।

ব্রিফল্ট, The Making of Humanity, লন্ডন, ১৯২৮।

Brockelmann, C, Geschichte d, Arabischen Literature ২ খণ্ড, উইমার, ১৮৯৮-১৯০২, বিশেষ সংখ্যা সহ।

বারটন এইচ. ই. Discovery of the Ancient World, ক্যামব্রিজ, ১৯৩২।

Carra de Vaux, Less Penseurs de I' Islam, ৫ খণ্ড, প্যারিস, ১৯২১-২৬।

কানিংহাম, স্যার, এ. Ancient Geography of India সম্পা. মজুমদার, এস. কলিকাতা, ১৯২৪।

ডারবি, এইচ. সি. A note on an early Treatise on the Astrolabe, Geographical Journal, সংখ্যা-২ ফেব্রুয়ারী ১৯৩৫।

দত্ত বি, এ্যান্ড সিং এ, এন, History of Hindu Mathematics, লাহোর, ১৯৩৫।

ডিকিনসন আর ই এবং হাওয়ার্থ, ও জে, আর, The Making of Geography, অক্সফোর্ড, ১৯৩৩।

www.waytojannah.com

ডোনাল্ডসন, The Uses of the Astrolabe, ইসলামিক কালচার, হায়দরাবাদ, জানুয়ারী, ১৯৪৫।

Elliot, Sir, H. M. and Dawson, J. The History of India etc, খ ১, লন্ডন, ১৮৬৭।

ইনান, আবদুল্লাহ, ইবনে খালদুন, মোহাম্মদ আশরাফ, লাহোর, ১৯৪১, এ্যানসাইক্লোপেডিয়া অব ব্রিটানিকা, ত্রয়োদশ সংস্করণ।

এ্যানসাইক্লোপেডিয়া অব ইসলাম, ৪ খণ্ড, লন্ডন, ১৯২৭ এবং বিশেষ সংখ্যা ১৯৩৬।

Ferrand, G, Introduction a L' astronomic Natique Arabe, প্যারিস ১৯২৮।

গিবন, ই. Decline and Fall of the Roman Empire, ৩য় খণ্ড, লন্ডন, ১৯০০।

হাকিম, আতাউল, History of Arab Mathematics (মুদ্রণাধীন থিসিস) কলিকাতা, ১৯৪৪।

হেল, জে, The Arab Civilization, অনুবাদ খোদাবখশ, ২য় সংস্করণ, শাহ মোহাম্মদ আশরাফ, লাহোর ১৯৪৩।

পিট্টি, পি. কে. A History of the Arabs, লন্ডন, ১৯৩৭।

হোযায়েন, এ, Some Arab Contributions to Geography, জিওগ্রাফি ম্যাগাজিন, অক্টোবর, ১৯৩২।

এনায়েতুল্লাহ, শেখ, Geographical Factors in Arabian Life and History, শাহ মোহাম্মদ আশরাফ, লাহোর, ১৯৪২।

জারবিস, ডব্লিউ ডব্লিউ, The World in Maps, ফিলিপস, লন্ডন, ১৯৩৬।

জুরজি জায়দান, উলূম-ই-আরব, উর্দু অনুবাদ, আসলাম জাইরাজপুরী, আলীগড়, ১৯০৭।

কীন, জে. The Evolution of Geography, এডওয়ার্ড স্টানফোর্ড, লন্ডন, ১৮৯৯।

কিম্বল, জি এইচ টি, Geography in the Middle Ages, মিথুয়েন, লন্ডন, ১৯৩৮।

লি, স্ট্রেনজ, জি, Lands of the Eastern Caliphate, ক্যামব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯০৫।

– Baghdad During Abbasid Caliphate অক্সফোর্ড, ১৯২৪।

– Palestine Under Muslim Rule (A.P.Watt), লন্ডন, ১৮৯০।

www.waytojannah.com

লেভি আর, Sociology of Islam, খ-২, (এইচ স্পেনসারস ট্রাস্টি), লন্ডন, ১৯৩৮।

Meg, A, Die Renaisance Des Islam, হাইডেলবার্গ, ১৯২২ এবং খোদাবখশ কৃত অনুবাদ, শাহ মোহাম্মদ আশরাফ, লাহোর, ১৯৩৭।

মিয়ারহফ, ম্যাক্স, Transmission of Sciences of the Arabs, ইসলামিক কালচার, খণ্ড-১১, হায়দরাবাদ, ১৯৩৭।

-Article on Aconite form AL- Birunis Kitab AL-Saydana, ইসলামিক কালচার, ৪র্থ সংস্করণ, অক্টোবর ১৯৪৫।

মুহসিন মাহদী, ইবনে খালদূন, History of Muslim Philosophy, খ-২, সম্পা. এম. এম. শরীফ।

নাইনার, এম. এইচ. Arabs Knowledge of South India, মাদ্রাজ ইউনিভার্সিটি, ১৯৪২।

নাদভী, সুলায়মান, মাওলানা, আরব ও হিন্দ কি তালুকাত (উর্দু) হিন্দুস্তানী একাডেমী, এলাহাবাদ, ১৯৩০।

- ইলমুল জুগ্রাফিয়াহ ওয়াল আরাব, আল দিয়া, আযমগড়, সেপ্টেম্বর, ১৯৩২, জানুয়ারী, ১৯৩৩।

- যিয়াউদ্দীন হুমাউনী আস্তুরলাবী, মা'আরিফ, আযমগড়, আগস্ট, ১৯৩৩।

- আরদ আল কুরআন (উর্দু) ২ খণ্ড।

- Arab Navigation, ইসলামিক কালচার, খ-১৫, হায়দরাবাদ, অক্টোবর, ১৯৪১।

- A Geographical History of the Quran, কলিকাতা, ১৯৩৬।

নিউটন, এ. পি. সম্পাদিত, Travel and Travellers of the Middle Ages, লন্ডন, ১৯২৬।

O' Leary, De Lacy D, D, How Greek Science was Passed to the Arabs কেগান পল লি, লন্ডন, ১৯৫১।

Philby H. St, নকশা বারদারী শারক-ই-ওয়াস্তা (ফারসী), রোযগার-ই-নাউ, ৪র্থ খণ্ড, বিবিসি, লন্ডন, ১৯৪৫।

Raisz,E, General Cartography, ম্যাকগ্রহিল, নিউইয়র্ক, ১৯৩৮।

রেইনাউদ, জে. টি. Introduction to General De Aboulfida, প্যারিস, ১৮৪৮।

রোজেনথাল, ফ্রান্স, The Muqaddimah; An Introduction to History (Bollingen Series XLIII), ৩ খণ্ড, প্যানথিওন নিউইয়র্ক, ১৯৫৮।

সারটন, জি. Introduction to the History of Science, ৪ খণ্ড, কারনেগী

www.waytojannah.com

ইনস্‌টিটিউট অব ওয়াশিংটন বাল্টিমোর, ১৯৩১ এবং ১৯৫০-৫৩ সালে পুনর্মুদ্রিত।

Schoy, C., Geography of the Muslims of the Middle Ages, আমেরিকান জিওগ্রাফিক্যাল রিভিউ, খ-১৪, ১৯২৪।

Sedillot, L, L'Histoire des Arabes, ৪র্থ অধ্যায়, প্যারিস, ১৮৫০।

শিবলী নোমানী, আল মামুন (উর্দু) আযমগড়, ১৯২৬।

সিদ্দিকী রাযীউদ্দীন, "Mathematics and Astronomy" History of Muslim Philospphy, ২য় খণ্ড, এম. এম. শরীফ।

স্মীথ ডি-ই- History of Mathematics, ২য় খণ্ড (জিন এ্যান্ড কোং), নিউইয়র্ক, ১৯২৫।

টেইলর, ই. জি. আর. Some Notes on the Early Ideas of the Form and Size of the Earth, জিওগ্রাফিক্যাল জার্নাল, Vol. LXXXV, জানুয়ারী, ১৯৩৫।

থর্নডাইক, এল. A History of Magic & Experimental Science, ৪র্থ খণ্ড, নিউইয়র্ক, ১৯২৩-২৪।

ইউল, এইচ. এ্যান্ড কর্ডিয়ার, এইচ. The Book of Ser Marco Polo (৩য় সংস্করণ), ২য় খণ্ড, জন মুররে, লন্ডন, ১৯০৩।

ভিনসেন্ট ডব্লিউ, Commerce and Navigation of Ancients in the Indian Ocean, ২য় খণ্ড, লন্ডন, ১৮০৭।

ইউসুফ কামাল, প্রিন্স, Monumenta Cartographia, Africae et, Aegypti, রোম, ১৯৩৫।

উলকেন এইচ. জেড. "Influence of Muslim Thought on the West," History of Muslim Philosophy, ২য় খণ্ড, সম্পা. এম. এম. শরীফ।

যিয়াউদ্দীন, এস. এম, আলভী, Arab Geography in IX and X Centuries AD, আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস, ১৯৫৯।

ইফাবা - ২০০৪-২০০৫ - অঃ সঃ/৪০১১ (উ) - ৩২৫০

www.waytojannah.com

অনুবাদ ও সংকলন বিভাগের আরো কিছু প্রকাশনা

১. তাফসীরে মাযহারী [১৩শ (শেষ) খণ্ড]	ঃ	মূল : আল্লামা কাযী ছানাউল্লাহ পানিপথী অনু : সম্পাদনা পরিষদ, পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪৪৬, মূল্য : ১৯০/-
২. ই'লাউস সুনান (১ম খণ্ড)	ঃ	মূল : আল্লামা যাফর আহমদ উসমানী অনু : মাওলানা মুহাম্মদ ইসহাক ফরিদী, পৃষ্ঠা সংখ্যা ৬১৪, মূল্য : ২৫০/-
৩. ইসলামী সংস্কৃতির উজ্জ্বল নিদর্শন	ঃ	মূল : ড. মুস্তফা সুবায়ী অনু : মাওলানা গোলাম সোবহান সিদ্দিকী, পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৯২, মূল্য : ৮০/-
৪. আল-কুরআনের জ্ঞান-বিজ্ঞান	ঃ	মূল : জাস্টিস আল্লামা তকী উসমানী অনু : মাওলানা হায়াত মাহমূদ জাকির, পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩৯৬, মূল্য : ১১০/-
৫. ইসলাম প্রচারের ইতিহাস	ঃ	মূল : শাইখ মুহাম্মদ ইসমাঈল পানিপথী অনু : মহীউদ্দীন শামী, পৃষ্ঠা সংখ্যা ৫১৮, মূল্য : ১২০/-
৬. ইসলাম দি অলটারনেটিভ	ঃ	মূল : মুরাদ হফম্যান অনু : মঈন বিন নাসির, পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩৪১, মূল্য : ২২৫/-
৭. মুসলিম বিশ্বে ইসলামী আদর্শ ও পাশ্চাত্য সভ্যতার দ্বন্দ্ব	ঃ	মূল : সাইয়িদ আবুল হাসান আলী নদভী অনু : মাওলানা ওবাইদুল হক, পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৪৭, মূল্য : ৬০/-
৮. মাওলানা মুহাম্মদ আলীর নির্বাচিত রচনা ও বক্তৃতাসমূহ	ঃ	মূল : মাওলানা মুহাম্মদ আলী অনু : আজিজ-উর-রহমান, পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪৯২, মূল্য : ১৫২/-

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ